নষ্ট পূর্ণিমা

শীতাংশুবিকাশ সেনগুপ্ত

প্রগতি প্রকাশনী
২০৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দাম পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ সজ্জা
রাজেন দে

ভিতরের ছবি ঃ
শচিন বিশ্বাস

বাঁধাই ঃ
নিউ সিটি বুক বাইণ্ডিং
৫৯।১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

॥ প্রারম্ভ ॥

শিমলাগড়ের গড়বন্দী পার হয়ে, পাণ্ডুয়ার বালিস্তূপের পাশ কাটিয়ে কিছুদূর এগোলেই খন্যান। খন্যান ছাড়িয়ে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে ক্রোশ খানেক গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। পথ আগলে, আকাশ ছেয়ে দাঁড়িয়ে এক বিশালাকায় অশ্বত্থ গাছ। যেন মহাকালের এক চিরন্তন সাক্ষী।

সেই গাছের নীচ দিয়ে একটি সরু কাঁচা পথ পড়ে। তেপান্তরের বুক কেটে দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে সুদূর প্রসারী ধূ-ধূ পতিত প্রান্তর। কেবল মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে শিশু, দেবদারু, পিয়াশাল আর জটাযুক্ত বটগাছ। পথটির নাম হেঁদুপথ।

অনেক আগে স্থানটি গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল। ভয়ংকর ছিল তার রূপ। দেশ দেশান্তর থেকে সাধু সন্ন্যাসীর দল এই পথ ধরে দুর্ভেদ্য অরণ্যের মাঝে ত্র্যম্বক মন্দিরে গিয়ে শিবের কাছে "হত্যা" দিয়েছে। ঠাকুর জাগ্রত ছিল। ফেরার পথে হলুদপুরমল্লার শিবমন্দিরে গাজনের উৎসবে শিঙা ফুঁকে ফিরে গেছে যে যার আস্থানায়। আশপাশের জনপদ থেকে কত পুণ্যার্থী যাত্রী "হত্যা" দিতে এসে ডাকাত বা বন্যজন্তুর হাতে প্রাণ দিয়েছে।

আজ সেই গভীর অরণ্যের চিহ্নমাত্র নেই। ধূ ধূ প্রান্তর। শূন্যতার রুক্ষ কঠিন ছবি। ত্র্যম্বক মন্দির এখন স্তূপীকৃত ইঁটের পাঁজা বই আর কিছুই নয়। দেবতা নেই—কালের শাসনে হয়তো ধ্বংস হয়েছে। মন্দিরের নিকটে শাংদহ নামে বিরাট এক সায়র এখনও আছে। কালো ভারি জল। বাতাসে জলের কাঁপন ওঠে না। যেমন গভীর তেমনি ভয়ংকর। এই মন্দিরকে ঘিরে তদানীন্তন কত জমিদার ও ডাকাতের দল গোপনে কতই না কুকার্য সমাধা করেছে।

কত স্মৃতি জড়িয়ে অথর্বের মত পড়ে হেঁদুপথ। লোকে বলে হেঁপথ। দূর থেকে মনে হয় একটি সর্পিল নদী যেন অগস্ত্য মুনির গণ্ডূষে নিঃশেষ হয়ে পথে রূপান্তরিত হয়েছে। পথটি শেষ হয়েছে হেতুলী গাঁয়ের প্রান্তে।

হেতুলী গাঁ। আদিসপ্তগ্রামের এক বেমানান ক্ষুদ্র বসতি। সেখানে বাস করে উগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য আর কয়েকঘর মুসলমান।

হেতুলী গাঁয়ের পাশ দিয়ে একটি খাল এঁকে বেঁকে চলে গেছে। নাম বউকানা খাল। নামের সংগে জড়িয়ে আছে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

শীর্ণ নিঃস্ব মরা খাল। সারা বছর শুকিয়ে থাকে, কেবল বর্ষায় খালের একবারে তলায় পাঁকের আড়ালে ক্ষীণ জলধারা দেখা যায়। ঐ জলটুকুই খালের নামের মাহাত্ম্যটুকু জিইয়ে রেখেছে। একদিন এই খালে নদীর জল এসে মিশত। তাই তার যৌবন ছিল দুর্বার। এখন নদীর মুখ বুজে গেছে আর জলও সরে গেছে অনেক দূরে।

এইখানেই অতীতের নিঃশ্বাস শেষ হয়নি। বউকানা খালের অপর পারে হলুদপুরমল্লা। সেও বউকানা খালের মত নিঃস্ব ও পরিত্যক্ত। যেদিকে তাকানো যাক না কেন আকাশের দিকচক্রবালে প্রতিহত হয়ে দৃষ্টি ফিরে আসে। কিন্তু দৃষ্টিতে বিভ্রম ঘটে। দিগন্তে আকাশের তলায় ঐ বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ ছাই রঙের প্রলেপ বলে মনে হয়। অতীত যেন থমকে দাঁড়ায়। এক উদগ্র রহস্য কৌতূহলী মনকে হাতছানি দেয়।

একদিন। এই গভীর অরণ্য পেরিয়ে ত্র্যম্বক মন্দিরে পূজো দিতে বলশালী ঐশ্বর্যশালী নন্দীরা এক নগণ্য গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছিল। আগমনটা ছিল আকস্মিক কিন্তু চাওয়ার মাঝে কোন ফাঁকই সেদিন ছিল না। আশে পাশে ছোট বড় গ্রামগুলি সজাগ হয়ে উঠেছিল। বৃহৎ কটা চোখওয়ালা বিশালকায় নন্দীপুরুষদের চিনতে বেশী দেরী হয়নি। এদের চালচলনে ব্যবহারে লুকিয়ে ছিল এক ভয়ংকর প্রকৃতি।

দৈহিক শক্তি ও অর্থের জোরে গ্রামের পর গ্রাম কুক্ষিগত করেই ইতি করল না। প্রায় বিশটা গ্রাম একত্রিত করে গড়ে তুলেছিল জমিদারি। আটটা মহাল নিয়ে হয়েছিল হলুদপুর। হলুদপুর নামের শেষে মল্লা যোগ করে নিজেদের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। জমিদার থেকে হয়েছিল রাজা।

সারা সপ্তগ্রাম নন্দীদের দোর্দণ্ড প্রতাপে শংকিত হয়ে উঠেছিল। এদের খামখেয়ালী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল কিন্তু প্রতিরোধ ছিল না। বাংলার তখন বড় দুর্দিন। আইনের রজ্জু শক্তিমানের হাতে। তবু অন্যান্য জমিদাররা দল বেঁধে মুর্শিদাবাদ নবাবের দরবারে নালিশ পাঠিয়েছে। ফল হয়েছে বিপরীত। নবাব স্বয়ং এসেছেন। রঙ্-বেরঙের পাল্কী চেপে নন্দী-রাজপুরুষরা এসে নবাবকে কুর্নিশ করে নিয়ে গেছে খাস আনন্দ মহলে। উৎসবের চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই দেখে নবাব খুশী হয়েছেন। আতসবাজি জলসাঘরে ঝরে পড়েছে। প্রমোদ ভবনে লখনউ ও ইরাণী সুন্দরীদের অতুল সৌন্দর্য ও সুকণ্ঠ নবাবকে মুগ্ধ করেছে। সকলের অভিযোগ হাজারো ঝালর বাতির শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

তাই নন্দীবংশের ঐতিহ্যের পিছনে দেখা যায় শুধু মৃত্যু আর উচ্ছৃংখলতা। জলসাঘর নামে গড়ে উঠেছিল কেঁকামহল, বন্ধনীমহল ও কল্লীমহল। সেখানে একাদিক্রমে ঘটতো নানা অভিসার। সুন্দরী বাইজীদের কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সংগীতের মূর্ছনায়, রূপের ছটায় জলসাগরের রঙিন ঝাড় বাতির সারি আলো ছড়িয়ে হাওয়ায় দুলেছে। গর্বিত নন্দীপুরুষরা সুরার পাত্রে নিজেদের রূপ দেখে ও আনন্দের হুল্লোড়ে ইন্দ্রের সভাকে স্পর্ধা ভরে আহ্বান করেছে।

এমনি করে এক চরম উচ্ছৃংখলতা কামনার ওড়না উড়িয়ে মহলে মহলে রাত্রির সংগে লুকোচুরি খেলেছে।

অন্যদিকে অন্দরমহল। সেখানে মহলবাসিনী বৌরাণীদের জন্য ছিল নন্দীপুরুষদের উপহার সীমাহীন দুঃখ আর অবহেলার এক চূড়ান্ত অভিশাপ। রাজপুরুষদের খামখেয়ালীপনাকে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস বলে মেনে নিলেও একরাশ নালিশ জমা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। নারীমনের আজন্ম লালিত ভালবাসা গ্লানিময় ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত শুধু ব্যর্থতার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। প্রতিদিনের সঞ্চিত ব্যর্থতা, আত্মক্রন্দন তাদের বুককে পাথর করে সমস্ত ভাষা কেড়ে নিয়ে একেবারে বোবা করে দিয়েছিল।

একদিন। উৎসবমুখর আত্মগর্বী জীবনরজনীতে তুফান উঠল। ভাগ্যচক্রও সেদিন ঘুরেছিল। মহারাত্রির কালদেবতা নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল নন্দীবংশে। অন্দরমহলের বৌরাণীদের সঞ্চিত অশ্রু অর্ঘ্য হয়ে তার চরণে অর্পিত হলো। তাদের দীর্ঘশ্বাস বিষকুম্ভ হয়ে সর্বনাশকে আহ্বান জানালো কালের সংগী হতে।

এমনি করে নন্দী বংশের দৃপ্ত পদক্ষেপ ক্রমে বিলীন হয়ে গিয়েছিল তাদেরই সৃষ্টিছাড়া মিথ্যা বুনিয়াদী হাস্যকর আভিজাত্যে আর কামনার লেলীহান ক্ষুধায়।

ক্ষণস্থায়ী মানুষের মিথ্যা ঐশ্বর্যের সমাধির উপর আজ দাঁড়িয়ে মহলের ভাঙ্গা রঙচটা দেয়াল। সংগীতের পরিবর্তে ভেসে আসে অতৃপ্তের হাহাকার, হতভাগ্যের ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস। অতীতের সেই কোলাহল আর নেই, ব্যস্ততার হৈ চৈ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। চারিদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ বৈচিত্র্যহীন দুর্বোধ্য রহস্য হয়ে বহুকাল থেকে নিঃসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে।

হেতুলী গাঁয়ের লোক দূর থেকে স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সন্ধ্যা হলে দূর থেকেই মল্লার বুড়ো শিবকে জানায় প্রণাম।

শিবরাত্রিতে দু' দশজন "ভক্তা" হলুদপুরমল্লার শিবমন্দিরে গিয়ে "হত্যা" দিত। ক্রমে সে সংখ্যাও ক্ষীণ হয়ে এসেছে, ভক্তারা বলে নিঝুম রাতে মন্দিরের দালানে তারা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে নিঃশ্বাসের শব্দ। প্রথম প্রথম ভেবেছে শেয়ালের নিশাপদচারণ। উঠে বসে বিস্ময়ে দেখেছে মন্দিরের থামের আড়ালে এক নারীমূর্তি। সারাদেহে তার জড়ানো সাদা পাত্‌লা বেনারসী, সুন্দর মুখ ওড়না দিয়ে ঢাকা।

বিস্ময়ে দেখেছে।

রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে ও রূপের তুলনা হয় না, তারপর ঐ মোহিনী নারীমূর্তি নূপুর বাজিয়ে মন্দির ছেড়ে ধীরে ধীরে নিবিড় অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

বর্ষার সমাগমে চারিদিক অগম্য হয়ে ওঠে। রাত্রিতে এক বিভিষিকা দীর্ঘ ডানা মেলে নেমে আসে। গ্রামবাসী ঘরে বসে শোনে মেঘের ডমরুধ্বনি। মাঝ রাতে সকলে চমকে উঠে শুনতে পায় নারীকণ্ঠের সুললিত স্বর—ভেসে আসে বউকানা খাল থেকে। কেউ কেউ বলে গান নয় ও হচ্ছে এক অশুভ ক্রন্দন।

উত্থান-পতন আশা-হতাশার মাঝে হলুদপুরমল্লায় কতই না ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল। আজ তা মহা শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

অতীত ক্ষয়িষ্ণু। যা বিলীন হয়ে গেছে কালের অতলগর্ভে তবু কেন তার আকর্ষণে এই কাহিনী লেখা। সবই বুঝি, সবই অনুভব করি। তবু এই ধ্বংসস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে কেবলি মনে হচ্ছে অতীতের নিঃশ্বাস শেষ হলেও তার অতৃপ্ত আত্মা অস্ফুট কান্নায় যেন বলছে, এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের সুখ দুঃখের হাতছানিকে অস্বীকার করতে নেই।

আমিও তা জানি।

তাই নন্দীবংশের ছিন্ন পাণ্ডুলিপি প্রদীপের ক্ষীণ আলোর তলায় আজ তুলে ধরেছি। কত কালো লেখা কত ভুল, কত আনন্দ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদের অশ্রুস্রোতে লেপে মুছে গিয়েছে।

নন্দীবংশের অন্দরমহলের প্রেম আর হাহাকার হাত ধরাধরি করে বাইজীদের উচ্ছৃংখলতার সংগে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কাহিনী জুড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বিস্মৃত যুগের এক রোমাঞ্চিত কাহিনী-ই তার সাক্ষী।

নষ্ট পূর্ণিমা

॥ কাহিনী ॥

আজ মন্দিরে নতুন ভাবে আরতি শুরু হয়েছে। ভিড় করেছে উৎসুক ভক্তের দল। নন্দীরাজপুরুষরা জলসাঘরে যাওয়ার আগে মন্দিরের দোরে এসে দাঁড়িয়েছে। বড় বড দামামা আর মন্দিরের রূপোর ঘণ্টাগুলো এক সংগে ধ্বনি তুলে কানে তালা লাগাবার উপক্রম করছিল।

নাটমন্দির আজ সুন্দর সাজানো হয়েছে। লাল শতরঞ্চিতে সারা মেঝেটা ঢাকা। নদীয়ার কালকন্দী কবিয়াল গানের আসর বসাবে। শূন্যে সারি সারি বড় বড ঝাড়রের আলো। কিংখাবের ফুলঝুরি। ঝলমলিয়ে উঠেছে চারিদিক। ধূপ ধুনো চন্দনের গন্ধ মন্দিরের ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র।

কবিগান ছাড়াও এক নতুন কৌতূহলে বহু লোক এসে জড়ো হয়েছে। প্রহরীরা ভীড় ঠেলে মন্দিরের নিরাপত্তা রক্ষা করছিল ।

নটবর ঠাকুর আজ আর পূজো করছেন না। ভবিষ্যতেও করবেন না। বড়কর্তার হুকুমে নটবর ঠাকুরকে সরে যেতে হলো। বিশবছরের সেবার ভার এক নতুন ব্রহ্মচারীর হাতে তুলে দিয়ে সত্যি সত্যি চলে গেলেন। নন্দীপুরুষরা এতে খুশী হয়েছে। তার কারণ যে নেই তাও নয়। হলুদপুরমল্লার লোকেরাও পাগল নটবর ঠাকুরের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তাই সকলে মন্দিরের ভিতরে কৌতূহলভরা চোখ তুলে দেখছে নতুন ব্রহ্মচারীর আরতি। দীর্ঘকায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। শরীরের সুগঠিত পেশী আরতির তালে তালে ওঠানামা করছে। সত্যিই রূপবান।

নাটমন্দির থেকে বড়কর্তাকে জলসাঘরে পৌছে দিয়ে নায়েব পরী মজুমদার কাছারি বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। এই উৎসব হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে কিসের একটা দুশ্চিন্তা তার কপালে ফুটে উঠেছে। তার মন্থর গতিতে তা হোঁচট খাচ্ছিল বারবার।

সায়াহ্নকাল। কাছারি বাড়ীর ঝালরের আলো নীরবে আলো ছড়িয়ে চলেছে, মোম গ'লে গ'লে পড়ছে। ঘরে জাজিমের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত ইন্দ্রজিৎ।

কর্মচারীরা চলে গেছে। দূরে নায়েবের চৌকিতে লাল মোটা খাতাগুলো স্তূপাকার হয়ে পড়ে। যোগবিয়োগের হিসাব—অর্থ সংগ্রহের পরোয়ানা। চোখ বুজলো ইন্দ্রজিৎ।

আজ যেন ওঠার কোন তাগিদ ছিল না। ভাবছিলেন অনেক কিছু। বিশেষ করে পুরোহিত নটবর ঠাকুরের নাটকীয় ভাবে বিদায় তাকে বিচলিত করে তুলেছে। লোকে তাকে উন্মাদ বলে। অন্যায়কে তিনি অন্যায় বলে প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করতেন না। তার ভক্তি ছিল। তবু এই বৃদ্ধটিকে কেন সরে যেতে হলো তা তার অজানা নয়।

এই ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব আকস্মিক। কি ভাবে, কখন বড়কর্তার মন জয় করে নিঃশব্দে মন্দিরের ভার হাতে তুলে নিল তা ইন্দ্রজিৎ জানতেও পারলে না। অথচ নায়েব সব জানতো। ইচ্ছে করেই তাকে বলেনি বা বড়কর্তার ভয়ে চুপ করেছিল। হিসাবের খাতা সরিয়ে যখন জানতে চাইল তখন সব শেষ। আগে থেকে জানলে অন্তত বাধা দিত, বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করত বড়কর্তাকে।

বাইরের পদশব্দে ইন্দ্রজিতের চিন্তার তার কেটে যায়। নায়েব পত্রী মজুমদার ঘরে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ। সাদা কালো চুল ভরা মাথা, থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। চাহনিটা কেমন ধারা বাঁকানো। চুপ্‌সানো দুই গালের মাঝে টিকল নাকটি উদ্ধত বুদ্ধির তারিফ করে।

—ছোটবাবু আমাকে ডেকেছিলেন?

—এতক্ষণে আপনার আসার সময় হ'ল?

হাত জোড় করে নায়েব আস্তে বলল— কি করব ছোটবাবু। বড়কর্তাকে জলসায় তুলে তবে এলাম।

ইন্দ্রজিৎ ভ্রুকুটি করে বলল—নটবর ঠাকুরের কি হলো?

নটবর ঠাকুরের বিদায় সকলের দৃষ্টি এড়ালেও ছোটকর্তা যে ভালভাবে নেবেন না তা নায়েবের অজানা নয়।

—আপনি ত সবই জানেন ছোটবাবু।

না—। চীৎকার করে উঠেই ইন্দ্রজিৎ সামলে নেয়। যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর নামিয়ে আস্তে করে বলল—হ্যাঁ জানি, কিন্তু শেষটা জানি না।

—ঐ শুনুন ছোটবাবু।

নায়েব মাথা নীচু করে বলল।

দূর থেকে মন্দিরের আরতি ধ্বনি ভেসে এল।

—উনি কোত্থেকে এলেন? সোজা হয়ে বসে ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন করল।

—সাধকের আশ্রয়স্থল কেউ বলতে পারে না ছোটবাবু। তবে বয়েসে নবীন। রূপে অতুলনীয়।

—আপনি দেখেছেন?

হেসে ফেলে নায়েব। বলল—হ্যাঁ সব ব্যবস্থা করেই তবে আসছি।

—বেশ করেছেন কিন্তু নটবর ঠাকুরের কি করলেন সেটাই আমার জানার দরকার। ইন্দ্রজিৎ অসহিষ্ণু হয়ে বলে ফেলে।

—নটবর ঠাকুর কি যেতে চান ছোটবাবু। কত বুঝিয়ে কত কথা বলে তবে নিস্তার। আরও বললুম—বৃদ্ধ হয়েছেন। বিশ্রাম তো চাইই। মন্ত্রের শক্তি দুর্বল দেহ বইতে পারবে কেন?

—কী বললেন শুনে?

—উন্মাদের মত যা ইচ্ছে তাই বললেন। বলেন দুর্বল দেহ যৌবনের নিষ্ক্রমণ। মন্ত্রের শক্তি থাকে জিহ্বায়। কম্পিত হস্তে নৈবেদ্যের ডালি না পৌঁছালেও অন্তরের অর্ঘ্য দেবতা গ্রহণ করেন।

ইন্দ্রজিৎ বিস্ময়ে তাকায়—যৌবনের নিষ্ক্রমণ, অর্থ?

—জানি না ছোটবাবু। ঠিক সেই সময়ে মেজকর্তা এলেন।

ইন্দ্রজিৎ এবার আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারল না, মেজকর্তা কালজিৎ বড় একটা মন্দিরে আসেন না। জলসাঘর আর সংগীতের রাগবৈচিত্র্য নিয়ে তার সময় কেটে যায়। কৌতূহল ভরা চোখ তুলে বলল—হঠাৎ উনি মন্দিরে এলেন কেন?

নায়েব হাত কচলে চোখটা ঈষৎ বুজে বলল—আমিই ওনাকে একবার মন্দিরে আসতে বলেছিলাম।

—কেন?

—ভয় করছিল ছোটবাবু।

আপনার ভয় করে—। হো হো করে ইন্দ্রজিৎ হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে নায়েবের দিকে তাকাল। ব্যঙ্গের হাসি টেনে বলল—তারপর কি হলো?

উত্তেজিত নায়েবের মাথা ঘন ঘন কাঁপতে থাকে। ক্রোধ সামলে বলে উঠল—উন্মাদ! বিদেয় হয়েছে না বাঁচা গেছে। মেজকর্তাকে পর্যন্ত একগাদা শাপ শাপান্ত করলে। বিশ্বাস করুণ ছোটবাবু, নটবর ঠাকুর সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে।

—উন্মাদ তো আজকে নয় নায়েবমশায়। হ্যাঁ উন্মাদ। সত্যি সে উন্মাদ।

নায়েব আরও কিছু বলতে গিয়ে ইন্দ্রজিতের কঠিন মুখ ও উন্মাদ কথার বারবার পুনরাবৃত্তিতে চুপ করে যায়।

জানালা দিয়ে দূরে তাকাল ইন্দ্রজিত। আরতি শেষ হয়ে গেছে। এক নিস্তব্ধতা ঘর ছেয়ে যায়। কী যেন ভাবছে সে। অতীতের টুকরো টুকরো ঘটনা আজ যেন চোখের উপর একে একে ভেসে ওঠে।

চোত তালুকে কর আদায় করতে গিয়েছিল নায়েব। কর আদায় করা বড় কথা ছিল না। জলসাঘরের জন্য সুন্দরী কয়েকটা মেয়ে আমদানী করাই ছিল উদ্দেশ্য। নায়েব পরী মজুমদারের সংগে গিয়েছিল মেজকর্তার আদুরে অত্যাচারী ছেলে রঘুনাথ। হঠাৎ সেদিন বুনো হাওয়ায় ঝড় উঠল চোত তালুকে। শেষে বর্ষার ধারায় কমে গেল সেই ঝড়। সেই বর্ষণ নেমেছিল নিরীহ প্রজাদের চোখ থেকে। সেখানেই তারা আবিষ্কার করেছিল তৈলাকে। অনেকের সংগে সেও এক উপহার হয়ে হলুদপুরমল্লায় এসেছিল।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ইন্দ্রজিত বলল—কখনো সমুদ্র দেখেছেন?

নায়েব পরী মজুমদার ছোটবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে বলল—ছোটবেলায় একবার সাগরে গিয়েছিলাম।

ইন্দ্রজিৎ হাসল। তারপর আপন মনে বলে উঠল—উত্তাল তরঙ্গের সে কী সমারোহ। দুর্জয় শক্তির আস্ফালন। ভয়ংকর উল্লাসে তীরে আছড়ে পড়ছে। কী উন্মত্ত তার প্রকাশ! নায়েবের দিকে তাকিয়ে বলল--সেও তো উন্মাদ, কী বলেন নায়েবমশায়। উন্মাদ নয়? আমার মনে হয় যে বিশাল যে মহান সেইই উন্মাদ। নটবর ঠাকুর সাধারণ উন্মাদ নন। তিনি ভাবে উন্মাদ। যাক গে, তাঁর এখন চলবে কী করে?

—তার জন্য বড়কর্তা কিছু মাসহারা বরাদ্দ করেছেন।

—সে কথা তাঁকে বলেছিলেন?

—শুনলে তো বলব। বলে নোনা জল এল। খুইয়ে খুইয়ে সব ধ্বসিয়ে নিয়ে যাবে।

—ব্রহ্মচারীকে দেখেছেন উনি? ইন্দ্রজিৎ নায়েবের দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ। মারতে যায় আর কী! বলে, শক্তি নিয়ে কারবার। মহাকাল মহাদেব ভক্তির অর্ঘ্যে সন্তুষ্ট। ব্যাভিচারে মৃত্যু—কালসর্পে মৃত্যু।

ইন্দ্রজিৎ বলে উঠল—বড়ই অন্যায় হলো এই বৃদ্ধকে এভাবে সরিয়ে। একটা অবলম্বন নিয়ে তবু বেঁচেছিলেন। খুব অন্যায় হলো। কী বলেন?

—নায়েব বুঝতে না পেরে বললে—আজ্ঞে ?

ইন্দ্রজিৎ এবার উঠে দাঁড়ায়। পাশ থেকে চাদর তুলে নিয়ে বলে—নটবর ঠাকুর গেলেন কোথায় ?

—খুব সম্ভব নিজের আখড়ায়। আপনি কি সেখানে যাবেন ?

—তাইতো মনে করছি।

—আজ্ঞে, না গেলে ভাল করতেন ছোটবাবু।

—কেন ? কৌতূহলে চোখ তুলে ধরে।

নায়েব আস্তে বলল—ঠাকুরের ধারণা এর মূলে আপনি আছেন।

—হঠাৎ এ ধারণা হলো কেন ?

—জানি না ছোটবাবু।

—কী জানেন তাহলে ? এই ধারণার সৃষ্টিকর্তাটি কে ?

নায়েব পরী মজুমদার থতমত খেয়ে যায়। বলল—বড়কর্তা, মেজকর্তা ও আপনার আদেশ পালন করতে যদি ছলচাতুরী গ্রহণ করেই থাকি, সে কি অন্যায় ? আমি আপনাদের চাকর। যেমন বলবেন তেমনি হবে। আমি কেন বলতে যাব ছোটবাবু।

—আচ্ছা আপনি আসতে পারেন। ওঃ, যাওয়ার আগে একবার দুর্লভিকে ডেকে দিয়ে যাবেন।

ইন্দ্রজিৎ আসন থেকে নীচে নেমে এল। নায়েবকে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল—আপনার কী আরো কিছু দরকার আছে ?

—আজ্ঞে আমার দরকার নেই, তবে কথা হচ্ছে, বিয়েটা এগিয়ে এল। তাই খরচ পত্তরের একটা ব্যবস্থা না করলে নয়।

ইন্দ্রজিৎ গায়ে চাদর দিয়ে চলতে শুরু করল। রঘুনাথের বিয়ে আর বেশী দেরী নেই। বিয়ের চেয়েও তার আনুষঙ্গিক সমারোহের ব্যবস্থা আগের থেকে না করলে নায়েবের পক্ষে সামলে ওঠা সত্যিই মুস্কিল।

—হিসেব তৈরী করেছেন ?

নায়েব মাথা নেড়ে জানাল—সব করেছি কেবল আপনার দেখে দেওয়ার অপেক্ষা।

—আজকে থাক্, কাল দেখাবেন।

তবু নায়েবকে সংগে চলতে দেখে ইন্দ্রজিৎ মৃদু হেসে বলল—আরো কি কিছু আর্জি আছে ?

ইতস্ততঃ করে নায়েব ফস্ করে বলে ফেলল—মেজবাবু বলছিলেন—। বলতে গিয়ে থেমে যায়।

ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল—বলুন।

—বিয়েতে ফুকারটা ওনার চাই।

চমকে উঠল ইন্দ্রজিৎ। মনে জেগে উঠল এক অসন্তোষের ছায়া।

গোপন কক্ষ ফুকার। জমিদারি রাখতে ও নন্দীপুরুষদের আনন্দ যোগান দিতে গিয়ে কতই না নির্দয় ঘটনা নিঃশব্দে ঘটে গেছে সেখানে।

নায়েব বলে চলে—মেজকর্তা ওখানে মজলিস বসাতে চান।

ইন্দ্রজিৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল—তা এত জলসাঘর থাকতে ফুকার কেন?

—আমিও সেই কথা বলেছিলাম ছোটবাবু। নবদ্বীপের সেই বৈষ্ণবী আসবে। তাই জলসাঘরে কী করে বসে?

ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবে। তারপর বলল—আপনি তবু বুঝিয়ে বলবেন। জলসাঘর থাকতে ফুকারের দোর খোলার ইচ্ছে আমার নেই। নেহাৎ না হলে ওনার ইচ্ছানুযায়ী তাই হবে।

নায়েব নমস্কার করে হাঁক দিল—কে আছিস্? দুল্‌ভিকে ডাক।

ইন্দ্রজিৎ মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেল।

পরী মজুমদার হাসল। নটবর ঠাকুরের বিদায় নিয়ে যতখানি সে আশংকা করেছিল ঠিক ততটা হলো না। ছোটবাবু যে এত সহজে হজম করে নেবে তা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। তার বহুদিনের এক আক্রোশ আজ সফল হয়েছে। তৈলাকে নিয়ে এসে তুলেছিল ফুকারে। নটবর ঠাকুর তা শুনে সারা হলুদপুরমল্লায় কী হৈচৈটাই না সেদিন করেছিল। নন্দী রাজপুরুষদের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। অভিযোগে ছিল অর্থসাৎ ও নারীহরণ। ছোটবাবু তো চটে তার সর্বনাশই করতে উদ্যত হয়েছিল। একটা নাটকীয় ভাবে ঐ ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল তাই রক্ষে। তৈলার ঘটনায় ছোটবাবুও শেষপর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছিল। তাই বহুদিন পর ফুকারের কথা শুনে ছোটবাবু অতীতের দুঃসহ বেদনায় হকচকিয়ে গেছে। সেইজন্য ফুকারের দোর খোলাতে তার এত আপত্তি। মেজবাবু আজ অনেকখানি শান্তি পেয়েছেন। ঘটনাচক্রে নটবর ঠাকুর একদিন মেজবাবুকেও শাপ দিয়েছিল। যার অন্ন খেলি তাকেই কিনা শাপ শাপান্ত। পুত্রের বিবাহের উৎসবের আড়ালে মেজবাবু কালজিৎ নদীয়ার সুন্দরী সুকণ্ঠী বৈষ্ণবী সাজির সংগে নিভৃতে মিলিত হতে চান। সুন্দরী সাজির কণ্ঠে মধু আছে আরও তার

চোখে আছে প্রাণ মাতানো দৃষ্টি। ক্লান্ত পরী মজুমদার বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

ইন্দ্রজিৎ কাছারি বাড়ীর বাইরে চত্বরে এসে দাঁড়াল। দূরে নন্দী রাজপ্রাসাদ। ঝালরের বাতি সারি সারি দেখা যায়। অদূরে মন্দির নাটমন্দিরের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। আরতি শেষ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে মন্দিরে ভক্তের দল পাতলা হয়ে এলেও কবিগানের আসরে লোক জমতে শুরু হয়েছে। সিংহফটকে প্রহরীরা সদাজাগ্রত। নন্দীপ্রাসাদের শেষ প্রান্তে শিলাময় বুরুজ ধরে লাল পাথরের ছাদ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। সারি সারি ঝাউগাছের আড়ালে জলসাঘরগুলি লুকিয়ে। মাথার উপর শূন্য নীল আকাশ। শীতের আমেজে হাওয়া যেন ভারি হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া ঝাউবনের ধাক্কায় কেঁদে কেঁদে উঠে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ইন্দ্রজিৎ ঘুরে দাঁড়াল। তুল্‌ভি নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। কালো পাথরের খোদাই করা ছয় হাত লম্বা মানুষটা কি নিঃশব্দেই না হাঁটে।

নমস্কার করে তুল্‌ভি বলল—নটবর ঠাকুর আখড়ায় হুঁজুর। নায়েববাবু বাড়ী গেলেন।

এক নিঃশ্বাসে বলে তুল্‌ভি। আরও কিছু হয়তো বলতো কিন্তু ইন্দ্রজিতের গম্ভীর মুখের পানে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায়।

—ফুকারের চাবি তোর কাছে? জিজ্ঞাসা করে ইন্দ্রজিৎ।

তুল্‌ভি হাঁ করে তাকায়, বিশ্বাস করতে প্রথমে চায় না। তবু ভাঙা গলায় বলে—হাঁ হুজুর।

—আলো জ্বালিয়ে তুই এগিয়ে যা। আমি যাচ্ছি।

তুল্‌ভি নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে চলে যায়।

ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। ফুকার। ফুকারের দোর খুলতে হবে। জলসা বসবে সেখানে। এক ম্লান হাসি হাসল। কিন্তু সেখানে যে একটা আত্মা প্রতিহিংসায় ঘুরে বেড়ায়। সারা কাছারি বাড়ীর মধ্যে ঐ একটি অভিশপ্ত কুঠরী। উঃ কি সাংঘাতিক। ভাবলে গাটা শিউরে ওঠে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ফুকার, পুরনো লছমিমহল আর ডাইনির চেত্‌লীগলি পাথর দিয়ে গেঁথে চিরকালের জন্য সমাধিতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু পারে নি। পূর্বপুরুষদের আত্মক্রন্দন শুনতে সে ভালবাসে। তাদের কথা, তাদের

নিঃশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পায়। তাদের দুরন্ত আত্মা এখনও হলুদপুরমল্লার প্রতিটি জায়গায় যেন ঘুরে বেড়ায়।

ইন্দ্রজিৎ চলতে শুরু করে। বহুদিন বাদে সে ওখানে চলেছে। নিঃশ্বাস টানতে যেন বড় কষ্ট হচ্ছে।

ফুকার। ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। দুল্‌ভির হাতের মোমবাতি লম্বা আলোয় পথ নির্দেশ করে। বিরাট লোহার দরজা খোলা। জায়গায় জায়গায় মরচে পড়ে গেছে। বড় বড় লোহার গরাদ তারের জালে ঢাকা।

ইন্দ্রজিৎ দুল্‌ভির দিকে একবার তাকিয়ে আলোর সারি অনুসরণ করে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। দুল্‌ভিও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। বহুদিন প'রে মানুষের পদশব্দে ফুকার যেন প্রাণ পায়।

পরপর দুটি ঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। ঘরের অপর পাশে দুটি ছোট্ট কুঠরী। বারান্দার শেষ প্রান্তে আরও একটি লোহার শিকের দরজা। বড় তালা ঝুলছে। কোন দরকার ছিল না। দরজার ওপাশে ইঁট দিয়ে দেয়াল গাঁথা। পথ বন্ধ। অনেক আগে ওদিকে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। সেই সুড়ঙ্গ পথ নাকি লছমিমহল পর্যন্ত গিয়ে বাঁক ধরে খালে মিশেছে। অযত্নে অব্যবহারে সুড়ঙ্গের পথ আজ রুদ্ধ। সকলে বলে নন্দীরাজপুরুষদের অত্যাচার কমে যাওয়ার সংগে সংগে সুড়ঙ্গের পথও বন্ধ হয়ে এসেছে।

—হুজুর। আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল দুল্‌ভি। ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠে। ঘটনা ঘটল চকিতে। এক দমকা হাওয়ায় হাতের আলো নিভে গেল।

—কিরে ভয় পে'লি ?

—হাওয়ায় আলো নিভে গেল।

—ধরা আবার। ইন্দ্রজিতের স্পষ্ট কথার স্বরে একটুখানি গলা কেঁপে যায়। দুল্‌ভি আবার আলো ধরাল। সুড়ঙ্গের দরজার তালা ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে। বহুদিনের এক আত্মা ক্ষণিকের জন্য যেন রসিকতা করে গেল।

পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি বড় প্রায় হলঘরের মত। শূন্যে ধূলায় ভরা ঝালর ঝুলছে। চিত্রিত ছাদ মলিন হয়ে গেছে। দেওয়ালে ঝুলছে বড় বড় আয়না। ঘর জুড়ে মেহগনির চৌকি। তার বারোটা পায়াতে জড়ানো রূপোর পাত। তার ওপর ছড়িয়ে বহুমূল্য কাঁচের তৈজসপত্র। বাঁদিকের বড় দেয়ালে ঝোলান মরচে পড়া ঢাল আর তরোয়াল। এক কোণে স্তূপাকার হয়ে পড়ে ছেঁড়া শামিয়ানা, ভাঙ্গা পাথরের চৌকি, মখমলের শতরঞ্চি,

কষ্টি পাথরের দশমুখি পিলসুজ, আরও কত হরেক রকমের জিনিস। নন্দীপুরুষদের কি জমকালো ব্যবস্থাটাই না ছিল।

এই ফুকারে কত গোপন জলসাই না বসেছে। ধরে আনা সুন্দরী বৌ বা মেয়েদের এখানে প্রথম হাতেখড়ি পড়ত। তারপর চালান দেওয়া হতো জলসাঘরে।

ইন্দ্রজিৎ মন্থর গতিতে পাশের ঘরে এসে দাঁড়াল। বাতাসের যেন ঘুম ভাঙ্গে। ইন্দ্রজিতের বুক কেঁপে ওঠে এক অজানা আশংকায়। এই ঘরে কত নারীর ক্রন্দন এখনও জমাট বেঁধে আছে। তার নির্বুদ্ধিতার জন্য একটি নারী কি ভাবে মাথা খুঁড়ে শেষে আত্মহত্যা করেছিল। সে তো বেশীদিনের কথা নয়। তৈলার অভিসম্পাত এখনও তার পিছু পিছু ধাওয়া করে।

—হুঁজুর।

ডুলভির ডাকে ইন্দ্রজিৎ মুখ ফেরাল।

—নায়েববাবু এ ঘর পরিষ্কার করতে বলেছিলেন।

—জানি, মেজবাবু এ ঘরে জলসা বসাতে চান।

—হাঁ হুঁজুর।

—মেজবাবু এর আগে ফুকারে কোনদিন এসেছেন?

—না হুঁজুর। কোনদিন আসেননি।

ইন্দ্রজিৎ হাসল। ঘরে ঢুকে সোজা বাঁদিকের দেওয়ালে এসে দাঁড়াল। সারি সারি টাঙানো তৈলচিত্র। ধূলিধূসরিত তার পূর্বপুরুষদের ছবি। মাথায় পাগড়ি। লম্বা গোঁফের আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন হাসি। ছবিগুলি প্রাসাদে টাঙানো হয়নি অমঙ্গলের ভয়ে। এদের অত্যাচারী অতৃপ্ত আত্মা ছবির সংগে নাকি ঘুরে বেড়ায়।

ইন্দ্রজিৎ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে। কি যেন ভাবে। তার চাহনিতে লুকিয়ে সুদূর অতীতের এক কান্নায় ভরা স্মৃতি।

নায়েব পরী মজুমদার ও রঘুনাথ তাদেরই কংসমহাল থেকে নাটেকারের একমাত্র মেয়ে তৈলাকে চুরি করে এই ফুকারে এনে তুলল। ক্রমে কথা গিয়ে পৌঁছাল ইন্দ্রজিতের কানে। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ ফুকারে ঢুকে সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

জলসা বসেছে। সারেঙ্গী বাদক সুরে টান দিয়েছে। নায়েব তদারক করছে। মেজকর্তা ছাড়া নন্দীরাজপুরুষরা সবাই হাজির হয়েছে। জলসার মধ্যমনি সেদিন বড়কর্তা সূর্যজিৎ স্বয়ং। ইন্দ্রজিৎকে দেখে সূর্যজিৎ বাইরে এসে

দাঁড়িয়ে ইসারা করে ডাকল। বারান্দার কোণে নিয়ে গিয়ে তার হাতে একটি চাবি দিয়ে বললেন—ঐ ঘরে তৈলা নামে একটি মেয়েকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে। সাবধান ও যেন পালাতে না পারে।

ইন্দ্রজিতের তিরস্কৃত চাহনির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—ওকে ছেড়ে দেওয়া যেতো কিন্তু তৈলাকে নিয়ে আমাদের সম্মানের সংগে প্রজাদের একটা বিবাদ বেধে উঠেছে। তোমাদের ঐ নটবর ঠাকুর সকলকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি জানি ইন্দ্র, তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু আমার অনুরোধ তৈলা কোথায় আছে তা যেন কেউ জানতে না পারে। রঘুনাথকে চাবুক মেরেছি কিন্তু তাই বলে আমাদের সম্মান তো বিসর্জন দিতে পারি না।

ইন্দ্রজিৎকে চাবিহাতে ফুকার ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল সেদিন। কাছারি বাড়ীতে নটবর ঠাকুর তার সংগে দেখা করে তৈলাকে ছেড়ে দিতে বারবার অনুরোধ জানিয়েছিল।

ইন্দ্রজিৎ বলেছিল—ফুকারে তো কত মেয়েই—। থেমে গিয়ে বলেছিল কৈ তখন তো কোন প্রতিবাদ করেন নি ?

নটবর ঠাকুর বলে উঠেছিল—তা ঠিক, তৈলার বাবা নাটেকার আমার শরণাপন্ন হয়েছে। বছরখানেক হলো ওরা বারাণসী থেকে এসেছে। বেচারা বিশ্বনাথের সেবক ছিল। সেখানকার সৎ ব্রাহ্মণ। তৈলাকে না ছেড়ে দিলে তোমার পাপ হবে। এত বড় পাপ তুমি হ'তে দিও না ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ শুধু বলেছিল—আপনি যান। দেখি কি করতে পারি।

সেদিন নটবর ঠাকুর তার কথা বিশ্বাস করে চলে গিয়েছিল। ইন্দ্রজিৎ সারারাত কাছারি বাড়ীর চত্বরে ঘুরে কাটাল, এক উৎকট উত্তেজনায় তার দেহ বারবার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

অনেকটা রাত হয়ে গেছে। ভাবল মহলে ফিরে যায় কিন্তু পারল না। সেদিনও ঠিক এমনি ভাবে লুকিয়ে ঢুল্‌ভিকে সংগে নিয়ে ফুকারে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিঃশব্দে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখে একটি মেয়ে ছাড়া আর আর সকলেই জলসাঘরে চালান হয়ে গেছে।

ছোট্ট ঘর। লাল কার্পেটের উপর মেয়েটি উপুড় হয়ে শুয়ে। পাশে শয্যা শূন্য। দূরে নানা ধরনের বাজনা পড়ে। ঢুল্‌ভি সেদিন উত্তেজিত হয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলেছিল—হুঁজুর, এতদিন যা হয়ে এসেছে এর বেলায় কিন্তু তা হলো না। এই মেয়েটিকে কেউ বাগে আনতে পারেনি।

ইন্দ্রজিতের উদ্বেগ কৌতূহলী চোখের দিকে তাকিয়ে দুল্‌ভি বলল—এরই নাম তৈলা। নায়েববাবু সারাদিন ধরে ভয় দেখিয়েছেন। তারপর সোনা গয়না দেখিয়েও এই মেয়েটিকে পোষ মানাতে পারেননি।

ইন্দ্রজিৎ মেয়েটির দিকে তাকাল। দীর্ঘ ঘন চুল সারাপিঠ ছড়িয়ে। বর্ণে শ্যামলিমা। দেহের কি অপূর্ব গঠন। কাঁদতে কাঁদতে হয়তো এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। ইন্দ্রজিৎ সেদিন চিৎকার করে বলে উঠেছিল—দুল্‌ভি ওকে মরতে বল্। বিষ চায় তো বিষ দে।

ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বরে মেয়েটি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। দুজন মানুষকে সামনে দেখে ভয়ে চীৎকার করে দৌড়ে ঘরের একটি কোণে গিয়ে দাঁড়াল। ভীতার আত্মরক্ষার আকুলতা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ইন্দ্রজিৎ শুধু বলেছিল—আমাকে ভয় নেই। কিন্তু মুক্তি তো তুমি পাবে না।

মেয়েটি ডুকরে কেঁদে বলেছিল—আমাকে ছেড়ে দিন, দয়া করে ছেড়ে দিন।

সেদিন দুল্‌ভির চোখেও জল দেখেছিল, কিন্তু বড়কর্তার কথা তার কানে আবার ভেসে উঠল—'সাবধান ও যেন পালাতে না পারে'। একদিকে অন্যায় আর অন্যদিকে আভিজাত্যের প্রতি বিরাট এক আনুগত্য।

ইন্দ্রজিৎ কঠিন হয়ে বলেছিল —তা বাড়ীতে গেলে কেউ কি তোমাকে ঠাঁই দেবে ?

—দেবে, সকলে দেবে। তৈলা ইন্দ্রজিতের পা দুটো বুকে জড়িয়ে কেঁদে উঠেছিল—ছেড়ে দিন, রাজাবাবু আমাকে ছেড়ে দিন। বিশ্বনাথ আপনার মঙ্গল করবেন।

তবু সেদিন ইন্দ্রজিৎকে নীরব হয়ে থাকতে হয়েছিল। ছাদের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বিড় বিড় করে আপন মনে ইন্দ্রজিৎ বলেছিল—মরে যাও, মরে যাও। পারতো আগুন ধরিয়ে নিজে পুড়ে মর সংগে নন্দীপ্রাসাদ, সারা হলুদপুরমল্লাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাও।

নিষ্ঠুরের মত সেদিন ইন্দ্রজিৎকে তৈলার হাত ছাড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারই কথামত দুল্‌ভি বন্ধ করে দিয়েছিল দরজা। ভিতর থেকে দরজায় করাঘাত করে আর্তস্বরে বারবার একই কথা বলেছিল তৈলা—ছেড়ে দিন রাজাবাবু, আমাকে ছেড়ে দিন। মা রাণীর মত আমিও মেয়েছেলে। রাজাবাবু আমাকে ছেড়ে দিন।

ইন্দ্রজিৎ পালিয়ে এসেছিল বাইরে। কঠিন দুল্‌ভির চোখে সেদিন এক বিদ্রোহের আগুন দানা বেঁধে উঠেছিল। মাথা সোজা করে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেদিন ইন্দ্রজিতের চোখে জল দেখে থমকে গিয়েছিল।

ইন্দ্রজিৎ এক চরম বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে বলে উঠেছিল—ওরে আমি কী করব। পারি না, পারি না—ওকে ছেড়ে দিতে পারি না।

দুল্‌ভি এগিয়ে এসে উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলে—হুঁজুর বারান্দায় ঝালরের একটা দড়ি পড়ে, দেবো ঘরে ফেলে?

ইন্দ্রজিৎ দুল্‌ভির দিকে বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। কোন কথা স্ফুরিত হলো না। দুল্‌ভি দৌড়ে ফুকারে গিয়ে দড়ি তুলে তৈলার ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল—বোন, কাল সকালে যেন তোমাকে আর কেউ দেখতে না পায়।

তৈলা চীৎকার করে উঠেছিল। সেই ডাক বাইরে পর্যন্ত এসেছিল। দুল্‌ভি বাইরে এসে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠেছিল—হুঁজুর পালিয়ে আসুন, শুনছেন ও কী বলছে।

—কী বলছে দুল্‌ভি?

—আপনাকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। সাংঘাতিক মেয়ে হুঁজুর, শাপ ফলে যাবে। শীগ্‌গির চলে আসুন, এখানে আর দাঁড়াবেন না।

ইন্দ্রজিৎ ক্লান্ত কঠিন স্বরে বলেছিল—ভয় কি দুল্‌ভি। কত অভিসম্পাতই দেয়ালে দেয়ালে আবদ্ধ হয়ে আছে। বাতাসে শুনছিস না তাদের প্রতিহিংসার গোঙানি?

—না, না হুঁজুর। আপনি চলে আসুন।

দূর থেকে তৈলার শেষ চীৎকার ভেসে এসেছিল—বিশ্বনাথ তুমি যদি সত্যি হও তবে এর বিচার তুমি কোরো।

হেসে উঠেছিল ইন্দ্রজিৎ। উন্মাদের মত বলেছিল—নিশ্চয় বিচার করবে। ওরে তৈলা, মৃত্যুর আগে তোর সব অভিসম্পাত উজাড় করে দিয়ে যা।

পরদিন তৈলাকে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু জীবিত অবস্থায় নয়।

অতীতের স্মৃতির টুকরো হাজার স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে গেল। বহুদিন বাদে কে যেন কেঁদে উঠল।

—হুঁজুর।

দুল্‌ভির ডাকে ইন্দ্রজিতের সম্বিত ফিরে আসে। আস্তে বলল—দুল্‌ভি, তৈলার কথা মনে পড়ে?

সে আর পড়ে না হুজুর। অনেক রাত হলো। চলুন।

চল্—। ইন্দ্রজিৎ বাইরে বেরিয়ে এল। চলতে গিয়ে দু'জনে থমকে দাঁড়ায়। কে যেন কাঁদছে। হ্যাঁ স্পষ্ট কান্নার শব্দ।—এ ঘর থেকে ওঘরে কে যেন দৌড়ে চলে যায়।

দুল্‌ভি ভয়ে বলে উঠল—হুজুর।

ইন্দ্রজিৎ হাসল।—ওরে বোকা। ঐ পর্যন্তই ওদের দৌড়। প্রতিকার করার শক্তি ওদের নেই। কাঁদতে দে। যেদিন তোদের মেজকর্তা এখানে জলসা বসাবে সেদিন কি এরা কাঁদবে না? নিশ্চয় কাঁদবে। কিন্তু কি লাভ! ও কান্না নন্দীপুরুষদের সয়ে গেছে। চল্।

ঝন্‌ঝনিয়ে বড তালা লাগিয়ে ফিরে এল ইন্দ্রজিৎ। দুল্‌ভিও আলো নিভিয়ে দেয়।

কাছারিবাড়ী ছেড়ে সে মহলের দিকে চলল। দূরে সুরম্য প্রাসাদে আলোর সারি। প্রধান সিংহদ্বারে গুজরাটী পাথরের সুবিশাল ঝালরের আলো জ্বলছে। কী তীব্র তার আলোর ঝরণা। লাল পাথরের সিংহদ্বার। পাশাপাশি বিশজন লোক যেতে পারে। প্রহরীরা প্রহরারত।

ইন্দ্রজিৎ সিংহদ্বার পেরিয়ে মহলে এসে দাঁড়াল। তার পদক্ষেপে এক ভাবুকতার ছন্দপতন ঘটছিল। এতদিনের সুপ্ত বিবেক আবার ক্ষণিকের জন্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এসে দাড়াল সে দীর্ঘ সোপানশ্রেণীর সামনে। কালো সোপানশ্রেণী এঁকে বেঁকে ক্রমে সরু হয়ে উঠে গেছে। দাসদাসী তাকে দেখে শশব্যস্তে সরে যায়।

ইন্দ্রজিৎ ক্লান্ত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। উপরে পাথরের পদ্মফুলের মাঝে ছোট্ট ঝালরের বাতি জ্বলছে। বড় অস্পষ্ট। বাতাসের ঘায়ে ঝালর বাতি কাঁপছে। তারি আলোয় কালো সিঁড়িগুলোও যেন সরিসৃপের মত ওঠানামা করছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসে জলসাঘরের সারেঙ্গী ও পাখোয়াজের শব্দ।

নন্দী প্রাসাদের উপর রাত্রি তার ক্লান্ত ডানা মেলে নেমে এলে নন্দীপুরুষরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। দিনের আলো ওরা সহ্য করতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ প্রাণভরে নিশ্বাস নেয়। কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

ছাদে এসে দাঁড়াল সে। চারিদিকে গুমোট অন্ধকার। ওপরে তারকা-খচিত আকাশ। ঐ অব্যক্ত অন্ধকারের বুক চিরে যেন কোন কালের নির্দেশ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কাল কেউ মানে না। ভবিতব্যের বিধান স্বীকার

করে না নন্দীবংশের কেউ। ইন্দ্রজিৎ কিন্তু বিশ্বাস করে। ভয় করে। যে কাল শেষ হয়ে গেছে তার থেকেও তো সে মুক্তি পায়নি। অতীতের নিঃশ্বাস মাঝে মাঝে তার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা দেয়। যার জন্যে জীবনের সংগে তার নিজের এত লুকোচুরি। মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। কিন্তু জীবন্মৃতকে সে সমীহ করে। তাই রঙিন আলো তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। কোন অভিসারিকা তার তীব্র চাহনির উপর চোখ রেখে মুখের কাছে সুরাভরা পেয়ালা তুলে ধরতে সাহস পায় না।

ইন্দ্রজিৎ হেরে গেছে। অতীতের আকর্ষণকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। নন্দীবংশের অতীতের গান সে শুনতে পায়। সেই অতীতের কাছে কতবার সে মুক্তি চেয়েছে, কিন্তু পায়নি। প্রতিদিন সে সকলের অলক্ষ্যে এই ছাদে এসে বসে থাকে। কিন্তু কেন? সারারাত এখানে এসে বসে জেগে কাটায়। তার উত্তর সে আজও পায়নি।

ছাদের ঐ একটি কোণে বসে লছমিখালের দিকে তাকিয়ে সুদূরের গান শোনে। কী দেখে—কীভাবে—কী শোনে তা নিজেও সে জানে না। কেবল অনুভব করে এক অদৃশ্য শক্তি তাকে বারবার এখানে টেনে নিয়ে আসে। কে যেন তার কানে কানে বলে, তাদেরই পূর্বপুরুষ করণকুমার আবার ফিরে এসেছে। সে যেন সেই করণকুমার। তাই ঐ দূরে—অতীতের অদৃশ্য নারীমূর্তি তাকে ডাকে। ঐ আহ্বানকে কিছুতেই সে অস্বীকার করতে পারে না।

দূর থেকে লম্বা প্রাকারকে বড়ই রহস্যময় মনে হয়। প্রাকারের মাথায় জায়গায় জায়গায় গম্বুজ। মনে হয় সারি সারি ভীষণাকৃতি পাথুরে মূর্তি ভয়ংকর চোখ মেলে নিষ্ঠুরের মত তাকিয়ে আছে। প্রাকারের নীচে লছমিখাল এঁকে বেঁকে কিছুদূর গিয়ে একটি মাটির ঢিপির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।··· হঠাৎ চমকে ওঠে ইন্দ্রজিৎ। বাতাসে ভেসে এল একদল মেয়ের কণ্ঠে ভেঙ্গে পড়া হাসির টুকরো। সংগে সংগে দূর থেকে কে যেন কেঁদে উঠল। সম্বিৎ ফিরে আসে ইন্দ্রজিতের। তাকিয়ে দেখে, কখন ছাদে এসে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়েছে। চারিদিকে তাকাল। নাঃ, ওসব কিছু নয়। ঝাউ গাছের গোঙান আওয়াজ। আবার চমকে উঠল ইন্দ্রজিৎ। ঐ তো সেই ঢিপি। কে যেন ওখান থেকে হাত নেড়ে ইসারা করছে। বাতাসে ভেসে আসছে চাপা কথার আর্তনাদ। নাঃ,—ও কিছু নয়। দুর্বল মনের ছলনা।

ক্লান্ত ইন্দ্রজিৎ আপন মনে বলতে থাকে—যা অসত্য তা আমার কাছে সত্য হলো কেন? ইহলোকে সবাই তো ভেসে যাচ্ছে। কেন সে পারছে না। কেন বাইজীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ইহলোকের প্রেমের নাগর হতে পারছে না। ঐ মূক আকাশের মত অতীত কেবলই রহস্য হয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে। মুক্তি নেই—তার মুক্তি নেই।······কৃষ্ণাকুমারীর কথা মনে পড়ে যায়।

ইন্দ্রজিতের হতভাগিনী পত্নী। নন্দীমহলের খামখেয়ালীপনাকে পরিহাস বলে অন্যান্য বৌরাণীর মত মেনে নিলেও একরাশ নালিশ জমা হয়েছিল ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে। এমনিধারা নন্দীমহলের বৌরাণীদের মত কৃষ্ণাকুমারী নিত্য নতুন বাসর ঘর সাজিয়ে প্রতিক্ষায় থেকেছে। বহুদিন থেকে বংশ পরম্পরায় নন্দীপুরুষরা কদাচিৎ অন্দরমহলে আসে। বাইজীদের কাছে হার মেনেছে এইসব সুন্দরী বৌরাণীরা। কোন পুরুষ যদি তার প্রিয়তমার কাছে বারবার আসে তাতে নিন্দে হতো। বৌরাণীদের নিঃসঙ্গ জীবনে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে সকলে হিংসে করবে বৈকি। তাদের মাঝে কারো জীবনে পুরুষের সন্নিধ্যে বসন্তের ফুল ফুটলে হিংসে করে নিন্দে করত। কুৎসা রটাতো। এক অদ্ভুত রীতি।

ইন্দ্রজিৎও তাই যেতে পারত না। প্রায়ই রাত্রে এই ছাদের ধারে এসে ভূতের মত অতীতের বিষের টিপ কপালে পরে বসে থাকে। তার এটা নেশা। তার ধারণা সে যে করণকুমার। লছমিবাই তাকে তার অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে তাই বার বার ডাকে। থেকে থেকে হেসে ওঠে সে এক উদ্ভট ভাবের নেশায়। তবে এও সত্যি, প্রতিদিন এইভাবে ছাদে না এসে বসে থাকতে পারলে সে পাগল হয়ে যেত।

তন্দ্রা কেটে যায় এক ডাকে। চমকে উঠে রাত্রির নিঝুমতায়। নিদ্রালস চোখে তাকিয়ে দেখল তার প্রিয় ভৃত্য চরিত দাঁড়িয়ে। সে বলল—রাত শেষ হতে বাকি নেই। ঘরে চল ছোটরাজা।

ইন্দ্রজিৎ দূরে তাকায়। কুয়াসার ছায়া পড়েছে চারিদিকে। হাত পাও শিশিরে ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

চরিত আবার বলল—এই ঠাণ্ডায় বসে মরবি যে।

বৃদ্ধ চরিতের বয়স কত ইন্দ্রজিৎ জানে না। তবে সেই ছোট কাল থেকে তার হাত ধরে সে বড় হয়েছে। তার খামখেয়ালীপনার কাছে কেউ এগোতে সাহস পায় না। কিন্তু চরিত ছায়ার মত তার পাশে সব সময় রয়েছে।

—তুই ঘুমোস নি? ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন করে।

—ঘুম? হাসে চরিত। বলল—ঘুমবো, একবারেই ঘুমবো। দেখব তখন কে তোকে ডাকে। আচ্ছা ছোটরাজা, এই অন্ধকারে বসে কি ভাবিস্, কি দেখিস বল দিকিনি?

তার উত্তেজিত প্রশ্নে ইন্দ্রজিৎ হেসে ফেলে।

—হাসিস নে। অন্ধকারকে ভালবাসিস, তা বসে থাক। একদিন এই অন্ধকারই তোর কাল হবে এও বলছি। তাই ঠাকুরকে বলি, এর আগে আমার যেন মরণ হয়। কেঁদে ফেলে চরিত।

আবছা অন্ধকারে চরিতের চোখে জল দেখে উঠে দাঁড়ায় ইন্দ্রজিৎ—চল চরিত। কাঁদিস নে। ওরে বোকা, অন্ধকার না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যেতো রে। দিন তো আলোময়—মুক্ত বিচ্ছেদের গান। হারিয়ে যাওয়ার পালা। আর রাত্রি, সে তো গোপন—আবদ্ধ। হারিয়ে যাওয়ার কোন ভয় নেই। মনের মুক্তি তো তখনই আসে।

—থাক ছোটরাজা। মুখ্যু মানুষ অতসব কথা বুঝি না। আমি এইটুকু জানি রাত্রি এই মহলের অভিশাপ।

ইন্দ্রজিৎ আবার হাসে।

ইন্দ্রজিৎ তার ঘরে এসে দাঁড়াল। দূরে মেঝেয় একরাশ ফুল পড়ে। হাওয়ায় ফুলদানি থেকে পড়ে গেছে। প্রদীপের শিখা ক্লান্ত হয়ে রাত্রির সংগে শেষ হয়ে এসেছে। দেয়ালে দু'টি তৈলচিত্র। একটি করণকুমারের আর পাশে জগন্নাথ মন্দিরের ছবি। এখানে এইভাবে করণকুমারের তৈলচিত্র টাঙানোর জন্য কতই না আলোচনা হয়েছে সারা নন্দীমহলে।

ইন্দ্রজিৎ এসে শুয়ে পড়ে। চরিত মাথা গোড়ায় জানালা বন্ধ করে ইন্দ্রজিৎকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—আজ কয়দিন হলো বৌরাণীমার কাছে যাস্ নি কেন?

—হঠাৎ একথা।

চরিত বলল—মেয়েছেলের হাসি আর চোখের জল দেবতার তুষ্টি আর অসন্তোষের মত, এও তোকে বলে রাখলাম।

ইন্দ্রজিৎ মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

দুর্বল মনে কৃষ্ণাকুমারীর সুন্দর মুখখানা ভেসে ওঠে। গভীর রাত। হয়তো এতক্ষণে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। কতদিন কৃষ্ণার চোখে দেখেছে সঞ্চিত বেদনার কোলে ক্ষীণ একটা আশা ভেসে ভেসে উঠছে। বলতে চাইছে

কত কি, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ সইতে না পেরে চোখ বুজেছে। হয়তো তাকে ভুল বুঝে কত অভিযোগে ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু তার ভালবাসা তার সহানুভূতি কতখানি তার খোঁজ হয়তো কৃষ্ণা পায়নি। তার জন্য তাকে দোষী করবে না সে।

চরিত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রদীপের সামনে এগিয়ে গেল। ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। ইন্দ্রজিৎ অন্ধকারে তাকিয়ে মনে মনে বলল—বাইরের আলো নিভিয়ে দিলি চরিত কিন্তু অন্তরের বেদনাকে এমনি ভাবে মুছিয়ে দিতে পারবি কী!

দূরের ঘণ্টা ফটক থেকে শেষ রাতের সময় সংকেত ভেসে এল।

একদিন। সন্ধ্যা সমাগত। বিন্দা কৃষ্ণাকুমারীর ঘরে এসে দাঁড়াল। আলো জ্বালনো হয়নি। দিনের শেষ ম্লান আলো জানালার রঙীন কাচে প্রতিফলিত হয়ে নানা রঙে সারা ঘর রাঙিয়ে এক স্বপ্নের জাল বুনে দিয়ে গেছে।

বিন্দা অন্দরমহলের পুরানো দাসী। তার শান্ত মূর্তির আড়ালে লুকনো দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা। মহলের কত ঘটনা কাহিনী হয়ে বিন্দার কণ্ঠ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। মহলের জানা অজানা প্রতিটি পথ তার নখদর্পণে। কাহিনীগুলিও সেই সব পথ ধরে রঙে রসে বিন্দার কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছে। কথা বলার কায়দা আছে বিন্দার। মহলের বৌরাণীরা তার হাত ধরে টেনে এনে কাছে বসিয়ে শুনেছে সেই সব কাহিনী। শুনে কেঁদেছে, হেসেছে আবার খুসি হয়ে কখনো মোটা বকশিসও দিয়েছে।

জানালার ধারে বসে কৃষ্ণাকুমারী আকাশ পাতাল ভাবছিল। তার উদাস দৃষ্টি বাইরে শূন্যে হারিয়ে গেছে। বিন্দা পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কৃষ্ণাকুমারীর তবু হুঁশ হলো না। যেন তার দেহ থেকে প্রাণ সুদূরে পাড়ি জমিয়েছে।

বিন্দা ডাকল—বৌরাণী।

চমকে উঠে কৃষ্ণাকুমারী। পাশে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—ওঃ তুই।

—ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায় নি?

—এসেছিল। মানা করে দিয়েছি। আলো আমার ভাল লাগে না।

—আজ মন্দিরে গেলে না?

—না।

ছোট্ট উত্তর। বিন্দা আশ্চর্য হলো। বলল—তোমার কী হয়েছে বৌরাণী?

—আমার মরণ হয়েছে।

—ছিঃ। নন্দীবংশের লক্ষ্মী তোমরা। ও কথা মুখে আনতে নেই।

কৃষ্ণাকুমারী তার উদাসীন দৃষ্টি বিন্দার সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—আলো জ্বালাব? বিন্দা বলে।

কোন উত্তর এল না। আজ যেন কৃষ্ণাকুমারীর কী হয়েছে। অন্যদিন হলে হাসি ঠাট্টা আর কথায় কথায় বিন্দাকে পাগল করে তুলতো। কিন্তু আজ বড় নীরব।

বিন্দা ঘরের আলো জ্বালিয়ে, কৃষ্ণাকুমারীর কাছে এসে হেসে বলল—ছোটকর্তা আজ মহলে আসতে পারেন।

মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকায় কৃষ্ণাকুমারী।

—তুল্‌ভির কাছে শুনলাম, বড়কর্তার সংগে দেখা করতে আসবেন। তাই খুব সম্ভব একবার এখানে আসবেন। হ্যাঁ, একটা কথা। নটবর ঠাকুরের জায়গায় এক ব্রহ্মচারী এসেছেন। গতকাল পূজো দেখলাম। আহা, যেমনি তার রূপ আর তেমনি পূজো। আশ্চর্য ব্রহ্মশক্তি। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না।

কৃষ্ণাকুমারী এবার ছোট্ট একটি মুচ্‌কি হাসি হাসল।—এ কথাই বুঝি আমাকে জানাতে এসেছিস?

—না বৌরাণী।

—নটবর ঠাকুরের তা হলে কী হবে?

—বিদেয় হয়েছে। পূণ্যি জলে ওর হাতে শেওলা পড়ে গিয়েছিল। নিজে আফিং খায় আর দেব্‌তাকে আফিং খাইয়ে সব ভুলিয়ে রেখেছিল।

—এতদিন পরে এত বড় আবিষ্কারটা কে করলে?

—এতদিন পরে ব্রহ্মচারী এলো বলেই নকল হীরা ধরা পড়ল। সত্যি বৌরাণী, আশ্চর্য ওঁর শক্তি। তারপর গলা খাটো করে বিন্দা বলল—শুনেছি কবচ দেয়, মন্ত্র দেয় অসাধ্য সাধন করে। কপালে হাত ছুঁইয়ে গদগদ কণ্ঠে বলল—ব্রহ্মচারী সাক্ষাৎ দেবতা।

কৃষ্ণাকুমারী এবার সোজা হয়ে বসল, বলল—রাজাবাবুরা দু'বেলা যাচ্ছেন, না?

—তা আর বলতে, ছোটকর্তা ছাড়া সবাই যাচ্ছেন।

—বড় গিন্নি, মেজ গিন্নি এরা?

—তুমি ছাড়া মহল তো ফাঁকা।

হেসে উঠল কৃষ্ণাকুমারী। রূপ, যৌবন আর কামনার হাত ধরে বৌরাণীরা ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। এটাই এখানে একমাত্র অবলম্বন—শেষ সম্বল অন্দর মহলের মেয়েদের। এত ভক্তি হঠাৎ জোয়ারের মত উথলে উঠেছে কেন তা তার অজানা নয়।

বিন্দা বিজ্ঞের মত বলে চলে—বিশ্বাসে কী হয় না বৌরাণী। তাই বলছিলাম একটিবার বিশ্বাস করে ওঁর হাতে নৈবিদ্যি দাও, ছোটবাবুর মতি স্থির হবে।

কৃষ্ণাকুমারীর হাসি মালিয়ে যায়। ছোট্ট কথাটি তার চেতনায় ঘা দেয়। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল—জ্বালাসনি. যা এখন। যত বয়েস হচ্ছে তত বোকা হয়ে যাচ্ছিস।

—হেসে উড়িয়ে দিও না বৌরাণী। আমি খাঁটি কথাই বলেছি। তবে ভক্তি থাকা চাই, বিশ্বাস থাকা চাই,—

—না। আমার ভক্তিও নেই আর বিশ্বাসও নেই। ওসব কথা তোদের রাজাবাবুদের বলগে যা।

এবার থমকে গিয়ে বিন্দা বলল—বিশ্বাস করলে না তো বৌরাণী? জানি, তুমি আমার কোন কথাই বিশ্বাস কর না। জলসা ছেড়ে রাজাবাবুরা পর্যন্ত বিশ্বাস ক'রে—

—দেখ বিন্দা—চীৎকার করে উঠেই কৃষ্ণাকুমারী মাঝ পথে থেমে যায়।

বিন্দা ভয়ে সরে আসে। কৃষ্ণাকুমারীর এরকম রূপ সে কোন দিনও দেখেনি।

উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণাকুমারী ক্রুদ্ধস্বরে বলল—বিশ্বাস, ভক্তি এসব বলে আর আমাকে জ্বালাসনি। তোদের ভক্তি আর বিশ্বাসের উপর আমার ঘেন্যা ধরে গেছে।

একটা উত্তেজনায় কৃষ্ণাকুমারীর স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। বিন্দা হকচকিয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

এক উদ্বেলিত কান্নাকে চাপতে গিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর দেহ ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে। তবু নিঃশ্বাস টেনে বলে উঠল—বিশ্বাস? বিশ্বাস আমি কাউকে করিনে, তোকে না, রাজাবাবুদের না, তোদের ছোট বাবুকেও না—কোন দেব-দেবীর ওপরেও বিশ্বাস আমার নেই।

বিন্দার হতবিহ্বল চক্ষে অশ্রু নেমে আসে। ধীরে ধীরে বলে—আমায় মাফ কর বৌরাণী। আর অমন কথা কখ্খনো বলব না।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বিন্দা মন্থর গতিতে ঘর ছেড়ে যেতে উদ্যত হলে কৃষ্ণাকুমারীর ডাক তাকে বাধা দিল।

—তুইও কাঁদছিস্? আমাকে ক্ষমা কর বিন্দা।

—না বৌরাণী। আমি কি জানি না তোমার কত দুঃখ।

মুখ ফিরিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর দিকে তাকিয়ে আর চোখ নামাতে পারে না।

কৃষ্ণাকুমারীর দীর্ঘ নয়ন অশ্রুভারে ঢলঢল করছে। বিন্দার মনে পড়ে যায়—একদিন সে কৃষ্ণাকুমারীকে বলেছিল ও রূপের আগুনে কে না পুড়ে মরতে চায়! ছোটকর্তা কী তার একটুও আঁচ পায় না। কৃষ্ণাকুমারী সেদিন শুধু ম্লান হাসি হেসে শূন্যে আকাশের স্থির এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দাঁড়িয়েছিল—অনেকক্ষণ।

কৃষ্ণাকুমারী বিন্দার কাছে এগিয়ে গিয়ে জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল—আমার মাথার ঠিক নেই। কী বলতে কি বলেছি। এখানে থেকে তুইও তো চুল পাকালি। তা সুখী থাকতে কাউকে দেখেছিস? বাইজীর গান আর সুরা ছাড়া এখানকার পুরুষরা আর কি কিছু জানে, না জেনেছে? আগের জন্মে কত পুণ্যি করে এসেছি তার ফল এ জন্মে কেমন পাচ্ছি, দেখছিস্ তো।

বিন্দা কৃষ্ণাকুমারীর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার ঐ শুষ্ক ম্লান হাসিটি বিন্দার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি—দুঃসহ ব্যথাকে চাপতে পারেনি। তার হাসিতে মেশানো ছিল নিরুদ্ধ বেদনা। ঠিকই বলেছে বৌরাণী। নন্দীপুরুষদের মত স্ফূর্তির ঢেউ কেউই তুলতে পারে না। আর মানুষের রক্তে রক্তজবার মালা কণ্ঠে দোলাতেও একটু দ্বিধা বোধ করে না এরা।

বিন্দা বলল—আমি যাই বৌরাণী।

—যা।

বিন্দা বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণাকুমারী আবার জানালায় এসে দাঁড়াল। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে। ক্লান্তিতে চোখ দুটি বুজে আসে। সিংহ ফটক থেকে ভেসে এল অসময়ে সানাইএর বেহাগ রাগিণী।

হঠাৎ তন্দ্রা কেটে যায় ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বরে। বিস্ময়ে কৃষ্ণাকুমারী জানালা ছেড়ে ঘুরে দাড়াল। কোন কথা স্ফুরিত হয় না। এত তাড়াতাড়ি অন্দর

মহলে আসবে তা ভাবতে পারেনি। মন্দির থেকে অন্য বৌরাণীরা সবে ফিরে এসেছে। তাদের নূপুরের নিক্কণ এখনো মিলিয়ে যায়নি।

ইন্দ্রজিৎ ঘরে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল—আমাকে দেখে চমকে গেলে মনে হলো।

—সত্যি, আশ্চর্য হয়েছি।

ইন্দ্রজিৎ আরাম কেদারায় বসে পড়ে দেহ এলিয়ে দিল।—কি ভাবছ?

জানালা ছেড়ে ইন্দ্রজিতের কাছে এসে সামনে বসে পড়ে কৃষ্ণাকুমারী বলে —ভাবছিলাম আমার অদৃষ্টের কথা।

—কোন কূল কিনারা পেলে?

—যার কূল নেই তার কিনারা কি করে হবে?···কিছু খাবে?

—না।

—তামাক আনতে বলবো?

—থাক গো থাক। আজ আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

—তাই নাকি? হঠাৎ এ কথা, ময়ূরপঙ্খী উড়ল নাকি?

ইন্দ্রজিৎ বাঁ হাত দিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর মুখখানি তুলে ধরে—আমার ময়ূরপঙ্খী তো তোমার কাছে। আচ্ছা, আজকাল আমার কোন খোঁজ খবরও তুমি রাখতে চাওনা, কেন বলতো?

—যার পথঘাট এখনো জানতে পারলাম না তার খোঁজ রাখি কী করে?

—তার মানে?

কৃষ্ণাকুমারী হেসে ফেলে। ঠোঁটের পাশে ব্যঙ্গের হাসি। হঠাৎ যেন কঠিন হয়ে উঠে সে।

—বললে অনেক কিছুই বলতে হয়, বলবো?

—না কৃষ্ণা, শুনতে চাই না। জানি তোমার অভিযোগ কিসের। কিন্তু আমাকে কি চিরকাল ভুল বুঝে যাবে?

—কে বললে এ কথা। আর তা ছাড়া আমার ভুল ধারণায় তোমার কিই বা এসে যায়?

—অনেক কিছু এসে যায়, শোন। এই, মুখটা তোল। আজ যদি সারারাত তোমার কাছে থাকি!

কৃষ্ণাকুমারী চোখ তোলে। ইন্দ্রজিতের সরু গোঁফখানা কেমন যেন সর্পিল। চোখের কোণে চিক্‌চিক্ করছে কিসের একটা ইঙ্গিত।

হঠাৎ কেন যেন কৃষ্ণাকুমারীর গা'টা রি রি করে উঠল। এ যেন জলসাঘরে বাইজীর কাছে প্রেম নিবেদন।

কৃষ্ণাকুমারী হেসে বলল—তা আমাকে গান গাইতে বা নাচতে হলে বল, একবার চেষ্টা করতে পারি। আরও করতে পারি বাইজীরা যা করে, স-ব।

—কৃষ্ণা! ইন্দ্রজিৎ ধমকের সুরে বলে ওঠে—ছিঃ।

তারপর ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর মাথায় হাত রেখে যেন কী ভাবে, পরে ধীরে ধীরে বলে—স্বামীর কী স্ত্রীর কাছে আসতে নেই। কেন তুমি অমন কথা বলছ?

কৃষ্ণাকুমারীর একটি হাত কোলে টেনে নিয়ে বলে—তুমি যে আমার কোন খোঁজই রাখ না। রাখ না বলেই তো এত সংকোচ।

কথা শেষ হবার আগেই কৃষ্ণাকুমারী বলে ওঠে—এ তোমার মিথ্যা ধারণা। চাইলেই কি সব পাওয়া যায়? মহলের দেয়াল বড্ড চওড়া তাই আকাংক্ষা গুমরেই মরে। তারপর তোমাদের পুরুষজাত বড় চালাক। চাওয়া পাওয়ার মাঝে কতই না ছলনা। যেমন উগ্র তেমনি উদাসীন।

ইন্দ্রজিৎ আরাম কেদারায় গা এলিয়ে হাসি টেনে বলল—আমি জানতাম মেয়েদের কাছে পুরুষরা চিরকালই ছেলেমানুষ।

—অনেক সময় ছেলেমানুষীর ওড়না জড়িয়ে তেনারা হাজির হন কিনা? মেয়েরা বোকা—ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কৃষ্ণাকুমারী উঠে দাঁড়ায়। প্রদীপটা উস্কে দিতে দিতে বলে—স্ত্রী স্বামীর মনের খবর রাখে, কিন্তু আমি রাখি না।

—কেন রাখ না?

—বাতুলতা মাত্র।

—তাই নাকি? ইন্দ্রজিতের হাসি মিলিয়ে যায়?

তোমাদের হেঁয়ালী চরিত্রের সন্ধান একমাত্র ভগবান রাখেন আর রাখে—

—থেমে গেলে কেন?

কৃষ্ণাকুমারী ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল—আর রাখে বাইজীরা।

—কিন্তু কৃষ্ণা, মহলের অন্য সব বৌরা তাদের স্বামীর মনের খোঁজ রাখে। ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে উত্তাপ প্রকাশ পায়।

কৃষ্ণাকুমারীও স্বরের দৃঢ়তা বজায় রেখে বক্রোক্তি করে—পতিভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা!

ইন্দ্রজিৎ এবার সত্যি হেসে ফেলে—শুধু ঝগড়াই করবে? শোন, এবার উঠতে হবে। বড়কর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তা ওখানে না গিয়ে সোজা এখানে এলে যে?

—এমনিই। একটু দেরী করেই যাব।

—দেখগে, জলসাঘরে গেছেন হয়তো। তা, নতুন কেউ এসেছে নাকি?

—জানি না। তোমার মুখে একথা মানায় না কৃষ্ণা। তবে তিনি আজ জলসাঘরে যাবেন না এটুকুই জানি।

কৃষ্ণাকুমারী হাসল। খোঁপায় সোনার ফুলটা গেঁথে নিয়ে আবার কাছে এসে দাঁড়াল—রাগ করছ কেন? কথার কথা। হ্যাঁ, রাত্রিতে কোথায় খাবে?

—খাজনার হিসেব-পত্রের ব্যাপারে হয়তো আজ একটু দেরী হবে। বড় কর্তার ঘরে গেলে উনি কি না খাইয়ে ছাড়বেন?

—বেশ। ওখানে খেয়ে নিও। তবে একবার আসতে চেষ্টা করো। যাকগে ওসব কথা। নটবর ঠাকুরের অন্ন তা হলে উঠল?

ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। কত কঠিন হয়ে গেছে কৃষ্ণাকুমারীর হৃদয়। আগে খাবে না বললে কিরকম হৈ-চৈ করে বসতো।

ইন্দ্রজিৎ মুখ ঘুরিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—নটবর ঠাকুরের বদলে এক—

—শুনেছি এক ব্রহ্মচারী এসেছেন। কিন্তু ওনার চলবে কী করে?

—তা হ'লে খবর পেয়ে গেছ।

—হ্যাঁ ছোট খাট খবরগুলো তাড়াতাড়িই পাই।

—নটবর ঠাকুরকে তুমি ভালবাস না?

—শ্রদ্ধা করি। ঐ বৃদ্ধ মানুষটিকে সকলের করুণা করা উচিত নয় কি?

ইন্দ্রজিৎ উঠে বসে।—শুনেছি ব্রহ্মচারী নানা আলৌকিক শক্তির অধিকারী।

কৃষ্ণাকুমারী এবার বসে পড়ে জোরে হেসে উঠল।

—হাসলে যে।

—হাসব না? জাদুবিদ্যায় পারদর্শী না হলে কি এখানে নন্দীরবংশে ঠাঁই পাওয়া যায়?

—ও জাদুকর নয়। সত্যিকারের ব্রহ্মচারী।

—তুমি দেখেছ?

ইন্দ্রজিৎ মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—তা হলে আরও একটি খবর পাওনি।

ইন্দ্রজিৎ কৌতূহলী চোখ দুটি তুলে ধরে—কী খবর ?

—ব্রহ্মচারীর রূপ নাকি অপূর্ব। মহলে এই নিয়ে কম হৈ-হুল্লোড় হচ্ছে না।

—তা মহলে এ নিয়ে এত নাচানাচি করার কি আছে ?

—সুন্দরের উপাসক সকলেই। রাজাবাবুরা বাইজীদের রূপে উন্মাদ। বৌরাণীরা যদি তার রূপে একটু মুগ্ধই হয় আর বিরাট অবসর সময়ে একটু আলোচনাই করে তাতে দোষ কি ?

—তুমি আজ মন্দিরে গেলে না ?

কৃষ্ণাকুমারী ডাগর চোখ দুটি ইন্দ্রজিতের দিকে তুলে ধরে। নিছক রসিকতার সুরে বললো—বলছো ?

থতমত খেয়ে যায় ইন্দ্রজিৎ। নিতান্ত সহজ ভাবে বলে—তুমি তো সেখানে যাও, তাই বলছিলুম।

কৃষ্ণাকুমারীর চোখে ভেসে ওঠে কৌতুকের হাসি—ভয় হচ্ছে না কি ? শোন, আজ না হোক কাল মন্দিরে যাব। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলে দেবে ?

—কী কথা ?

—দেবতার কাছে কী চাইবো ?

—এতদিন যা চেয়ে এসেছো তাই চাইবে।

—উঁহুঃ, আর তা চাইবো না। এতদিন যা চাইলাম তা পেলাম কই ?

—কী চেয়েছিলে ?

কৃষ্ণাকুমারী হেসে ফেলে।—আমার মনের কথা জানতে চাইছো ? যা হোক মুখ ফুটে তাহলে কিছু বললে। তারপর ইন্দ্রজিতের কোলে মুখটা গুঁজে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে উঠল—তুমি ভারি চটে গেছ, চটলে আমার হাসি পায়।

ইন্দ্রজিৎ মুখ ঘুরিয়ে নিলে কৃষ্ণাকুমারী হাত দিয়ে মুখটা টেনে এনে চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল—ঠাকুরের কাছে কি চাইব জান ? বলবো ঠাকুর, 'ও যেন মদ খায়'।

ইন্দ্রজিৎ এবার বিস্ময়ে খানিক তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল। —মদ খেতে বলছো ! মদ খেয়ে অন্য সকলের মত বাইজীর হাত ধরে নাচলে তুমি বুঝি খুশি হও ?

—খুশির কথা নয়।—দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃষ্ণকুমারী বলল—ও সব ভুলে

গেছি। তবু জানব মদ খেয়ে বাইজীর ডাকে আমাকে ভুলে গেছ। যার নেশা নেই, সাধারণ মানুষের মত যার ভাবনা, সে কী করে তার স্ত্রীর অন্তরের আবেদনকে উপেক্ষা করে? হৃদয়ের এই ব্যাকুলি কি তার নাগাল পায়নি, কোন আঘাত হানেনি মনের দেউড়িতে?

—এ তোমার চিরকালের অভিযোগ, কৃষ্ণা।

—মনে করলে তাই, অভিযোগ চিরকালের সত্য, কিন্তু অস্বীকার কি করতে পার তাকে?

—নন্দীবংশে যে এক কালরাত্রি বয়ে চলেছে মহাকাল তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে নিতে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে।

—তোমার কী হয়েছে কৃষ্ণা? তার হাত দুটো ধরে একবারে বুকের কাছে টেনে এনে আবার বলল—তোমার কী হয়েছে, কী হয়েছে তোমার।

কৃষ্ণাকুমারী মুখ তুলল। দূরে জানালার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—সত্যি হাসালে। বিন্দা বলে আমার কী হয়েছে। তুমি বলছো আমার কী হয়েছে। সকলেই বলছে আমার কী হয়েছে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ইন্দ্রজিতের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বলল—কেউ না জানুক কিন্তু তুমি কী জান না আমার কী হয়েছে? জেগে যে ঘুমোয় তাকে জাগাবে কে?

ইন্দ্রজিতের বলার যেন কিছু নেই। বড় অসহায় তার দৃষ্টি। মিনতিমাখা সুরে বলে ওঠে—আমাকে ভুল বুঝো না কৃষ্ণা, ক্ষমা কোরো।

কৃষ্ণাকুমারী মুখ নামায়। পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটি তখনো থর থর করে কাঁপছে।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়ায়—এবার আমি যাই।

আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণাকুমারী। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একরাশ কালো চুল বাম অঙ্গ ঘেঁসে নেমে গেছে নীচে। ঘন কেশের পাশ দিয়ে সুডৌল গণ্ডদেশ থেকে কাঁচা সোনার রং ঝিলিক দিচ্ছে। সে রূপের মাঝে ক্ষণিকের তরে হারিয়ে যায় ইন্দ্রজিৎ। আবেগ যেন বাধা বাঁধন হারা—সহসা এগিয়ে গিয়ে সবেগে জড়িয়ে ধরল কৃষ্ণাকুমারীকে।

কৃষ্ণাকুমারী চাপা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—এই ছাড়। এখন ছেড়ে দাও, লক্ষীটি। আঃ, কেউ দেখে ফেলবে যে।

বাহু বন্ধন শিথিল করে দেয় ইন্দ্রজিৎ। কৃষ্ণাকুমারী সরে দাঁড়ায় পাশে। ইন্দ্রজিৎ জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে। সর্বাঙ্গে একটা কাঁপনের অনুভূতি—

একটা গরাদকে দু' হাতে চেপে ধরেবাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকে—অনেকক্ষণ কেটে গেছে। নেশাটা তখন কেটেছে।

কৃষ্ণাকুমারী এতক্ষণ মাথা গুঁজে বসেছিল। নিজেকে বেশ সহজ করে নিয়ে নীরবতা ভঙ্গ করে বললো—কৈ যাবে না? দেরী করে গেলে ফিরতে যে অনেক রাত্রি হয়ে যাবে।

ইন্দ্রজিতের মুখে কোন কথা নেই। ধীরে ধীরে গিয়ে আরাম কেদারাটার ওপর বসে পড়লো সে। কঠিন সুরে একটা প্রশ্ন করে—আচ্ছা কৃষ্ণা, তোমার স্বামীকে তুমি ভুলে থাকতে পার না?

—পারছি কৈ?

—কেন পার না?

—সেটাই তো ভাবতে পারি না।

—মহলের অন্য বৌরা তো পেরেছে। তাদের স্বামী দেবতাটির ভাল মন্দের মঙ্গল অমঙ্গলের চিন্তা থেকে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে। কৈ তাদের তো কোন অভিযোগ নেই।

কৃষ্ণাকুমারী চমকে উঠে। আশ্চর্য হয়ে তাকায়। তার গোপন ইঙ্গিত সে বুঝতে পারে। এক দুঃসহ ব্যথায় হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠলো। ইন্দ্রজিৎ তাকে ভুল বুঝেছে। প্রতিবাদের সুরে বলে—তাদের অভিযোগ যে নেই তা তুমি কি করে জানলে? যে নিজের ঘরের খোঁজ রাখে না অন্যের খবর নেওয়ায় তার দুঃসাহস এত কেন? অভিযোগ নেই? তা যদি নাই-ই থাকবে তবে আগে ক'জন বৌরাণী আত্মহত্যা করলে কেন?

ইন্দ্রজিতের আর সহ্য হয় না। মাথাটা দুহাতে জোরে চেপে ধরে উঠে পড়ে। সহজ ভাবেই বলে—এখন চলি আমি।

—তোমার প্রাপ্যটা বুঝে নেবে না?

—প্রাপ্য কিসের?

—কেন? এই দেহটার অধিকার—উপভোগের উপকরণ। নাও, যা বলবে এবার তাই করবো। আমিও কথা দিচ্ছি আর কোন অভিযোগ করব না। কি, খুশী তো?

—কৃষ্ণা। চীৎকার করে ওঠে ইন্দ্রজিৎ। কৃষ্ণাকুমারীকে এতখানি উত্তেজিত হতে এর আগে কখনও সে দেখেনি! নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলে—এত ছোট তুমি আমায় ভাব কৃষ্ণা? এ-কথা তুমি আমায় বলতে পারলে?

কৃষ্ণাকুমারী আর নিজেকে সামলাতে না পেরে ইন্দ্রজিতের বুকের উপর আকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ল। তার দেহটাকে বুকে ধরে অশ্রুসিক্ত মুখখানি নিজের মুখে চেপে বলে ওঠে ইন্দ্রজিৎ—তোমার দুঃখ বুঝি আমার দুঃখ নয়। আমার কে আছে ? তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে কৃষ্ণা !

কৃষ্ণাকুমারীর চোখের জলে তার চোখও ঝাপসা হয়ে এসেছিল। ইন্দ্রজিৎও কেঁদেছিল সেদিন।…

চৈত্র, কেয়া, তপন ও তনু নামে অন্দরমহল বিভক্ত। আরও একটি আছে বিশাল প্রাসাদ। তার নাম নেই। শ্বেত পাথরের তৈরী বলে সকলে বলে সাদা মহল। বর্তমান বড়কর্তা সূর্যজিৎ চৈত্রতে থাকেন, কেয়ায় থাকেন মেজকর্তা কালজিৎ। তপন শূন্য। তনুতে থাকেন ইন্দ্রজিৎ। তিন ভাইয়ের তিন মহল। কিন্তু তপন শূন্য হলেও তাদের পিসতোত ভাই কৈলাশ চৌধুরী সপরিবারে আস্তানা বেঁধেছে। ঘোড়ায় চেপে খাজনা আদায় করে। টাকা আদায়ের কৌশল সে জানে। প্রজার ওপর যেমন তার চাবুক নির্দয় ভাবে চলে ঠিক তেমনি চলে তার স্ত্রী কংকনার ওপরও। মেজাজটা ঠিক এঁটেল মাটি। জল পড়লে পিছল, রোদ উঠলে ঠনঠনে শক্ত।

এদিকে সাদা মহলে থাকে নন্দীবংশের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। বড় বড় বারান্দা দিয়ে সব মহলগুলি যুক্ত। মহলগুলির নীচে অর্ধচন্দ্রাকৃতি উদ্যান। বিস্তৃত গোলাপবাগ ও নট্টবাগ।

ইন্দ্রজিৎ চৈত্র মহলে এসে দাঁড়াল। কালো মেঝে তাতে রঙিন ফুলের কাজ। মাঝে সরু করে পাতা সাদা গালিচা। চললে শব্দ হয় না। হাঁটাতে আনন্দ আছে। সারি সারি চারটি ঘর। বারান্দাটা ধরে রেখেছে সাদা সাদা কয়েকটা থাম। বারান্দা থেকে নীচে তাকালে চোখে পড়ে নট্টবাগ। উদ্যানের শেষে উঁচু দেওয়াল। ঘরগুলির শেষপ্রান্তে যেখানে মহল শেষ হয়েছে ঠিক সেখানে একটি সোপানশ্রেণী নেমে গেছে। প্রতিটি মহলে এমনি ধারা সিঁড়ি রয়েছে। সব সিঁড়িরই পথ শেষে এক জায়গায় জলসাঘরে গিয়ে মিশেছে। শূন্যে সারি সারি বাতি। ঘরের দরজায় ঝুলছে নানা রংদার মসলিনের পর্দা। বারান্দায় শ্বেত পাথরের অসংখ্য চৌকি। তার ওপর রূপোর ফুলদানিতে রঙিন ফুলের তোড়া।

ইন্দ্রজিৎ খবর পাঠাল ভিতরে। যথাসময়ে দাসী এল।

ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। মেহগনির পালংকের উপর বড় একটি

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সূর্যজিৎ শুয়ে। বাঁ হাতে আলবোলার নল। দূরে চারমুখি প্রদীপের আলো ঘরটি উদ্ভাসিত করে তুলেছে। চোখ বুজে যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। বাতাসে মাথার পাতলা শুভ্র কেশ কাঁপছিল। জোড়া ভুরুর নীচে বিশাল নয়ন। রক্তাভ রঙে কেমন যেন রুগ্নতার কালির ছোপ লেগেছে। গাল দুটোও আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। গায়ে গরদের কামিজের সোনালী বোতামের দড়ি খোলা।

দাসী পালংকের কাছে একটি পাথরের টুল এগিয়ে দিল। ইন্দ্রজিৎ বসে পড়ে আস্তে ডাকল—দাদা।

চমকে উঠে সূর্যজিৎ। আলবোলায় এক টান দিয়ে মিষ্টি ধুঁয়ো উদ্গীরণ করে আস্তে বললেন—ক'দিন শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

—কাশীরাম কবিরাজকে একবার ডেকে দেখান না?

—আজকের দিনটা দেখা যাক। ছাই মুণ্ডু ঘাস শেকড় গিলতে ইচ্ছে করে না। যাক্, খাজনা আদায়ের খবর কি?

ভালই। তবে চৌহান আর ত্রিবেণীর কিছু অংশ খাজনা আদায় অপাততঃ বন্ধ রাখতে হবে।

সূর্যজিৎ চোখ মেলে ভ্রুকুটি করে বললেন—কেন?

—অজন্মা হয়েছে। তবু তহশিলদার পাঠিয়েছিলাম—যা পাওয়া যায়। জোর করতে মানা করেছি।

—এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে? সূর্যজিতের কণ্ঠে ক্রোধের আভাস মেলে।

ইন্দ্রজিৎ হেসে বলল—কেউ দেয়নি। জমিদারি রাখতে গেলে এরকম না করলে চলে না। বলবেন হয়তো কৈলাশদাকে পাঠাতে কিন্তু এতে অর্থ আসবে না। জমিদারিতে জমি আসবে কিন্তু প্রজা আসবে না। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিলে তাদের পেতলের বাসনপত্র আর কিছু গয়নাগাঁটি হয়তো আসতে পারে। তারপর চংরী গ্রামের মত হবে। জমিই থাকবে, চাষ করার লোক থাকবে না।

সূর্যজিৎ আবার চোখ বুজলেন।—তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করো। মন্দিরে একবার যেও। সত্যি একজন ভাল সাধক পাওয়া গেছে। মন্দিরে গিয়েছিলে?

—না। যাব একবার। সময় করে উঠতে পারছি না।

—যেও। আর দেখো তাঁর যেন কোন কষ্ট না হয়। নটবর ঠাকুরের জন্যে যে মাসিক কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম, তা কি নায়েব দিয়েছে?

—জানিনা। শুনলাম উনি নিতে চাননি।

—আশ্চর্য লোক। এমন পাগলা লোক আমি দেখিনি। বলে হাসলেন সূর্যজিৎ। ইন্দ্রজিৎ কিছু কঠিন কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

—এদিকে রঘুনাথের বিয়েটা এগিয়ে এল। যা করবার তুমি করো। পার তো একবার মেজবাবু আর তার গিন্নির সংগে দেখা করে, কি চাই তা ঠিক করে ফেলো।

ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

—শোন ইন্দ্র। আসল কথাই বলা হয়নি। রঘুনাথের বিয়ের পর ওর একটা মহল চাই। তপন মহলটা দিলে কেমন হয়?

ইন্দ্রজিৎ মুখ তুলে তাকাল—সেটা কি ভাল হবে?

—এছাড়া আর উপায় আছে কি? আচ্ছা, কৈলাশকে সাদা মহলে একটা ব্যবস্থা করে দিলে কেমন হয়?

—এ কথা কি আমাকেই বলতে হবে? ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞাসা করে।

—হ্যাঁ তোমাকেই বলতে হবে। আমার বলা সাজে না। একটু বুঝিয়ে বলো। যা গোঁয়ার গোবিন্দ। বৌটাকে মেরে তো শেষ করে দিলে। পরশু জলসাঘরে গিয়ে কিই না করলে।

ইন্দ্রজিৎ মাথা নোয়াল। সে শুনেছে। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে এক বাইজীকে লক্ষ্য করে সুরাপাত্র ছুঁড়ে মেরেছিল। ভাগ্যিস লাগেনি। ওর জঘন্য ব্যবহার সকলেরই অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—সত্যি এর একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছোট্‌ঠাকুর।—বলে ঘরে এসে দাঁড়ালেন বড়বৌ রোহিণী। একহারা চেহারা। রূপের জৌলুস অনেকখানি কমে গেছে। পরনে গরদের শাড়ী, সুন্দর নয়নের নীচে কালির রেখা। কুঞ্চিত কেশদাম আলুলায়িত। চুলে সাদা ছোপ পড়েছে। পদক্ষেপ বড় কুৎসিত। থেমে থেমে চলেন। ছেলেপুলে হয়নি। তিনি সারাদিনে চার গ্লাস ভাঙ্‌ না খেয়ে থাকতে পারেন না।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়ায়।

—থাক ছোট্‌ঠাকুর, বসো। কাছে এসে দাঁড়ালেন।. পালংকে হাত রেখে স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে বলল—এরকম করলে কংকনা তো বাঁচবে না।

—ও সময় পায় কখন? ইন্দ্রজিৎ বলে।

—যতটুকু পায় তারই সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করে না। হেসে ফেলে রোহিণী।

—আচ্ছা বৌঠান, এর প্রতিকার কী ?

হঠাৎ রোহিণী হেসে উঠলেন।

সূর্যজিৎ চোখ খুলে বিস্ময়ে বলল—হাসলে যে।

—এমনি। ছোট্‌ঠাকুরের কথা শুনে। বলে প্রতিকার কী, একথা শুনলে হাসব না? তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রতিকার বলতে এখানে কি কিছু আছে ছোট্‌ঠাকুর? চোখ বুজে থাকতে হয়। এখানকার নিয়মকে সহজভাবে না নিলে না কি এখানকার আভিজাত্য থাকে না। সেটা যতই অন্যায় হোক।

ইন্দ্রজিৎ দাদার দিকে তাকাল। সূর্যজিৎ চোখ বুজে না শোনার ভান করলেন।

—ছোট্‌ঠাকুর খেয়ে এসেছো ?

—না বৌঠান।

—তাহ'লে এখানে খেয়ে যেও। তুমি কি এখন খাবে? সূর্যজিৎকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার শরীরটা ভাল না। বসবো, তবে বেশী কিছু খাব না।

—দাদার শরীরটা ভাল নয়, বৌঠান।

—শরীর কি আমারই ভাল। দেহটাকে কি আমরা একটু জিরুতে দিই? কেবল হৈ-হুল্লোড় আর—।

—বড় বৌ ভিতরে যাও। খাওয়ার ব্যবস্থা করো। গম্ভীর স্বরে বলে, তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন—তপন মহলটা রঘুনাথকে দিয়ে দিতে বলো। আরও বলো জলসাঘরে ওকে যেতে হলে একটু ভদ্র হতে হবে।

—না ছোট্‌ঠাকুর ওসব তুমি বলতে যেও না। ঝগড়া না করে বুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা করো। বলে রোহিণী ভিতরে চলে গেলেন।

এক নিস্তব্ধতায় ঘর ভরে যায়। ইন্দ্রজিৎ বাইরে তাকাল। কথা ফুরিয়ে যায় দু'জনের।

সবই আছে তবু কোথায় যেন এক বিরাট শূন্যতা। একটুকরো অসন্তোষের মেঘ সব সময় উড়ে বেড়াচ্ছে সকলের মনের আকাশে। নন্দীমহলে মানুষ আছে কিন্তু প্রাণ নেই। পুরুষেরা বাইজী মহলে আলোর তলায় মল্লার সুরে পেয়ালা শূন্য করলেও অন্দর মহলে বৌরাণীদের হৃদয়ে জয়তশ্রী অবহেলায় শুকিয়ে যায়। তিলে তিলে অসন্তোষ সঞ্চিত হয়ে আজ পাষাণে পরিণত হয়েছে। নিঃশ্বাস আছে কিন্তু প্রাণোচ্ছ্বাস নেই। প্রয়োজন আছে কিন্তু চঞ্চলতা

নেই। সকলেই বোঝে সকলেই জানে তবু প্রবাহের বাইরে আসতে পারে না। স্রোতে ভেসে যাওয়া ভাল কিন্তু স্রোতহীন বহুদিনের সঞ্চিত জমাট বাঁধা অভিযোগের দুঃসহ বেদনায় জড়িয়ে পড়তে চায় না কেউ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সূর্যজিৎ জিজ্ঞসা করল—মুর্শিদাবাদে কি খাজনা ঠিকমত যাচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—নায়েবের দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। বড় ধূর্ত লোকটা !

—সবই জানি দাদা। তবু ওকে আমাদের চাই।

—জানি ইন্দ্র, পাকা ঘুঘু। কালকে ওকে আমি দেবীপুর পাঠাচ্ছি। রঘুনাথের বিয়ের ব্যাপারেই ওখানে পাঠাব।

—রঘুনাথকে ওনারা দেখে গেছেন?

—কেন, তুমি জান না? সূর্যজিৎ বিস্ময়ে তাকায়।

—না। কাছারি বাড়ীতে থাকি। অন্দরমহলে কি হচ্ছে তা আমার পক্ষে সব সময়ে জানা হয়ে ওঠে না।

সূর্যজিৎ বিস্ময়ে বলে চলে—এত পাল্‌কি, এত হৈ-হুল্লোড়, জলসাঘরে নতুন আসর—এত সব হলো অথচ তুমি কিছুই জান না!

—কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসেছিলেন। কেন এসেছিলেন তারপর কি হলো জানি না। খরচ-পত্তরের হিসাবও নায়েব এখনও দেখায়নি, তাই কিছুই জানতে পারিনি।

সূর্যজিৎ শুধু হাসলেন। ইন্দ্রজিতের বিষয় যা শুনে এসেছেন তবে তা সত্যি। এই আত্মভোলা সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন লোকটি এতবড় জমিদারির প্রতিটি হিসাব কিভাবে রাখে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।

—বৌমা কেমন আছেন? সূর্যজিতের সহজ জিজ্ঞাসা।

—ভাল।

—তুমি ওখানে গিয়েছিলে?

—আজ গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে যাই।

সূর্যজিৎ আরও প্রশ্ন করতে গিয়েও করতে পারলেন না। মাঝে মাঝে কেন যায়? সে তো প্রতিদিনই যেতে পারে। কাছারি বাড়ী ও ভূতের মত ছাদে বসে থাকা ছাড়া আর তার কোন নেশা নেই। জলসাঘরে সে যায় না। কেমন দেখতে তাও হয়তো বলতে পারবে না। তবু অন্দরমহলে যায় না, তার যে কারণ নেই তাও নয়। অন্দরমহলের বৌরাণীদের হিংসা

কলহ আর বিকৃত রুচির অনেক সংবাদই তার কানে এসে পৌঁছায়। বিশেষ করে সাদা মহলে যে কত ঘটানাই না ঘটছে তার সঠিক সংবাদ নিলে তার পক্ষে হয়তো ধৈর্য রক্ষা করা মুস্কিল হতো।

ঘরে এসে ঢুকলেন বড়বৌ। বললেন—চল খাবার দেওয়া হয়েছে।

দু'জনে ভিতরের ঘরে এসে দাঁড়াল। মাঝারি ধরনের ঘর। লাল মেঝের উপর আসন হয়েছে। সামনে বড় বড় থালা আর বাটিতে নানা ধরনের ব্যঞ্জন। ইন্দ্রজিৎ হেসে বলল—বৌঠান সবই করেছেন কেবল হজমীগুলির ব্যবস্থা করেননি।

রোহিণী শুধু হাসলেন।

নিঃশব্দে দু'জনে খেতে থাকে। বড়কর্তা সূর্যজিৎ বাটিগুলি পাশে টেনে রেখে সামান্য আহার্য গ্রহণ করেন।

—খেতে বসলে কেন? রোহিণী বলে।

—না বসলে তুমি তো আবার অভিমান করবে! হেসে উত্তর দেন সূর্যজিৎ।

—অভিমান! বিস্ময়ে বলেন রোহিণী। তারপর হেসে উঠে বললেন—তোমরা এক শ্রেণীর মন রক্ষা করতে গিয়ে এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছ যে অভিমান ছাড়া আর কিছুই জান না।

—অর্থাৎ? সূযজিৎ খাওয়া বন্ধ করে বড়বৌ-এর দিকে তাকালেন।

—অর্থাৎ অতি সহজ। তুমি খাবে না এতে অভিমান করব, কিন্তু কেন? দুশ্চিন্তাও তো হতে পারে? তোমার শরীর খারাপ এতে অভিমান করব? ছিঃ। রসিকতা করা ভাল তাই বলে কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে নয়। অভিমান করে তোমাদের—।

—বড় বৌ—সূর্যজিৎ চীৎকার করে ওঠেন। রোহিণীর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বলেন—তুমি স্থান কাল ভুলে যাচ্ছ। আজ কি ভাংটা বেশী পরিমাণে খেয়েছ নাকি?

—রাগ করার মত কিছু তো বলিনি। স্ত্রী হয়ে যা বলা উচিত তাই বলছি। ভাং আমি খাই তবে নেশাগ্রস্ত হয়ে স্থানকাল আমি ভুলি না।

ইন্দ্রজিৎ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—আঃ বৌঠান। দয়া করে চুপ করুন।

—থাক থাক। এই রইল তোমার খাবার। বলে সূর্যজিৎ তীব্রগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ মাথা নীচু করে বসে রইল। এক অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় মুহূর্তে ঘরটা থম থম করতে থাকে। ইন্দ্রজিৎও উঠে দাঁড়ায়।

—একি, তুমি খেলে না, ছোট্‌ঠাকুর।

নাঃ, থাক বৌঠান। যথেষ্ট হয়েছে। দাদার শরীরটা ভাল না, তা কথাগুলো না বললেই ত' পারতেন।

—ইঙ্গিতটা বুঝেছ তুমি? বাইজীরা অভিমান করতে পারে তাই বলে আমরাও তাই করব?

ইন্দ্রজিৎ মাথা নীচু করে ঘর ছেড়ে যেতে গিয়ে রোহিণীর ডাকে থমকে দাঁড়াল। বৌঠানের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ইন্দ্রজিৎ। আঁখির পাশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। একটা উত্তেজনায় টলছে। ভারাক্রান্ত গলায় বললেন—মানুষ মরে কোথায় যায় তা কেউ জানতে পারে না, কিন্তু ছোট্‌ঠাকুর মানুষ না মরেও মরে থাকে। সে কি উপলব্ধি করেছ কখনো তোমরা?

ইন্দ্রজিৎ তাকাল এক বিহ্বল দৃষ্টি মেলে। এর উত্তর তার জানা নেই। এই অভিযোগ সারা অন্দরমহলের।

আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল সে। জানালায় দাঁড়িয়ে সূর্যজিৎ। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছিলেন।

ইন্দ্রজিৎ বলল—আমি যাই দাদা।

শুধু মাথা নেড়ে সূর্যজিৎ সায় দিলেন।

তনুমহলে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। রাত্রি নিঃশব্দে অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিঁড়িগুলো যেন তাকে ছাদে আসার জন্য শত হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে। আশ্চর্য হলো ইন্দ্রজিৎ। ছাদে ওঠার সিঁড়ির শেষপ্রান্তে চরিত বসে ঢুলছে। মাঝে মাঝে এমনিভাবে পথ আগলে বসে থাকে সে। কতবার ছাদে যেতে বাধা দিয়েছে। সেই ছোটকাল থেকে তাকে আগলাতেই এসেছে চরিত।

ইন্দ্রজিৎ সরে আসে। ঐ আকর্ষণ কাটিয়ে মন্থর গতিতে অন্দরমহলে এগিয়ে গেল।

দীর্ঘ বারান্দা নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। অন্য মহলের বৌরাণীদের ঘর থেকে নানা ধরনের বাজনার শব্দ ভেসে এল। বিশেষ করে অলস হাতে ঝংকৃত সেতারের মধুরধ্বনি তাকে মুগ্ধ করে। ঘণ্টা ফটক থেকে ভেসে এল সময়ের সংকেত।

অনেক আগে বাইজীমহল থেকে সংগীতের সুর ও ঘুঙুরের ঝুমুরধ্বনি ভেসে আসতো। অন্দরমহলের বৌরাণীরা চমকে চমকে উঠছে। শূন্য শয্যার দিকে

তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছে। একদিন এক বৌরাণী এ-সব সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল। সেই থেকে একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছিল বাইজীমহল ও অন্দরমহলের মাঝে। বাতাসে মাঝে মাঝে সুরার গন্ধ ভেসে এলেও ঘুঙুরের ধ্বনি আর হাসির শব্দ প্রাচীরের গায়ে আটকে যায়।

অবশেষে ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর ঘরের দোরে এসে দাঁড়াল। পর্দা ঠেলে ঢুকে দেখে কৃষ্ণাকুমারী অপেক্ষা করে করে নিজের অজ্ঞাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অদূরে পঞ্চপ্রদীপের আলো স্তিমিত।

ইন্দ্রজিৎ দোর বন্ধ করে নিঃশব্দে শয্যার পাশে গিয়ে বসল।

কৃষ্ণাকুমারী ঘুমে অচেতন। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামের মাঝে ফুটে রয়েছে অনিত্যসুন্দর মুখখানি। হঠাৎ এক গভীর নিঃশ্বাসের শব্দে কৃষ্ণাকুমারীর ঘুমের ঘোর কেটে যায়। স্বপ্নমাখা আঁখি তুলে ধরে।

ইন্দ্রজিৎ ঝুঁকে পড়ে দেখে কৃষ্ণাকুমারীর সরু ভুরু উচ্ছল চাহনির অনন্ত স্রোতকে যেন বেঁধে রাখতে পারছে না। টিকোলো নাকের তলায় রাঙা অধরোষ্ঠের ফাঁকে মুক্তোর মত দন্তরাজি আনন্দে ঝক্ ঝক্ করছে।

কৃষ্ণাকুমারী দু'হাত প্রসারিত করে ইন্দ্রজিৎকে তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করল।

দূর থেকে ভেসে এল ময়ূরের কেকারব। আকাশের কোলে একফালি চাঁদের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একখণ্ড মেঘ। ঝাউগাছের বন্ধ বাতাস মুক্ত হয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল—বহুদিন পরে।

কৃষ্ণাকুমারী তার আঁচল দিয়ে ইন্দ্রজিতের গণ্ডদেশের স্বেদবিন্দু মুছিয়ে দেয়। ইন্দ্রজিৎ তার মদির নয়নের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কৃষ্ণাকুমারী তাকাতে পারে না। তার নয়নের কোনে রক্তিম আভাষ। ইন্দ্রজিৎ আস্তে বলল—তুমি ঘুমুবে?

কৃষ্ণাকুমারী তার সুন্দর আঙুল দিয়ে ইন্দ্রজিতের উদ্যত অধর চেপে ধরল—উঁহুঃ।

—বেশ ঘুমিও না।

—তাই বলে তুমি ঘুমুবে? কৃষ্ণাকুমারী হেসে ফেলে।

—সে তোমার ইচ্ছে।

—চোর কোথাকার।

—আমি চোর! এক কৌতুক হাসি ইন্দ্রজিতের চোখে উৎলে উঠে।

—নয় কেন? চুপি চুপি এলে। সব চুরি করে নিয়ে যাবে? কেমন

জব হ'লে। চুরি করতে আর হলো না। তার আগেই গৃহস্বামিনী সব দিয়ে দিলে।

—যদি আরও একটি জিনিস চাই, দেবে?

ফিস্‌ফিস করে বলে—কী জিনিস?

কানের কাছে মুখ নিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল—তোমার সারা মনটা।

—ওমা কথা শোন। কী বলতো তুমি, ওটা বুঝি এখনও পাওনি।

ইন্দ্রজিৎ উঠতে গেলে কৃষ্ণাকুমারী বলে উঠল—বাইরে যেও না।

—কেন?

বোকা, কেন জান না? ভোর হবার অনেক আগে তোমাকে ডেকে দেবো। তখন চলে যেও।

—ভোরে গেলে কী হবে?

—অন্দরমহলের সকলে দেখে হাসবে।

—এতে হাসার কী আছে?

আহা কেন জান না? অন্দরমহলে বৌদের কাছে পুরুষদের আসতে নেই।

—তবে কী পরপুরুষ আসবে?

কৃষ্ণাকুমারী হাসল। যাদের নিজের পাতে অন্ন নেই সে অন্যের পাতে দশরকম ব্যঞ্জন দেখলে হিংসে করবে বৈকি। তাই নিন্দে ক'রে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করেছে। এদের নিন্দেটা অনেকটা নিজেরে নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের মত।

ইন্দ্রজিৎ হালকা সুরে বলে—ও এই কথা। সকালেই তাহলে যাব।

—নাগো না। সকলে যে কত কথা বলবে।

ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর মুখখানা বুকের কাছে টেনে এনে বলল—বলুক গে।

—বলুক গে, না। আমিই সব বলে দেবো। বলবো কি জান?

—কী বলবে? ইন্দ্রজিৎ হাসে।

—যাও, জানি নে। কৃষ্ণাকুমারী ইন্দ্রজিতের বুকে মুখ লুকালো।

দু'জনেই এক প্রগাঢ় অনুভূতিতে হারিয়ে যায়। যেন কথা শেষ হয়ে গেছে।...চঞ্চল নদীর নৃত্য যায় থেমে, তীরে আছড়ে পড়ছে শত লক্ষ ছোট্ট ঢেউএর আকুলি।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ইন্দ্রজিৎ।—জানো কৃষ্ণা, রঘুনাথের বিয়ে।

কৃষ্ণাকুমারী মুখ তুলে উঠে বসল।

—রঘুনাথের বিয়ে! বিস্ময়ে কথা দুটো উচ্চারণ করে পর মুহূর্তে খিল খিল করে হেসে উঠল।

—হাসছো যে, রঘুনাথের কি বিয়ের বয়েস হয়নি?

কৃষ্ণাকুমারী হাসি থামিয়ে বলল—রঘুনাথকে আমি জানি, বিয়ের বয়েস অনেক আগেই হয়েছে। কোথায় হচ্ছে?

—দেবীপুর জমিদারের মেয়ের সংগে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। কে জানে কোন্ হতভাগিনী এখানে আসছে। বেশী দিনের কথা নয়। তৈলার কথা এখনো ভুলতে পারে না।—এ কি ঘুমোলে নাকি? কপালে হাত রাখলে ইন্দ্রজিৎ চোখ মেলল।

—সত্যি কৃষ্ণা কাছারি বাড়ীতে মোটা মোটা খাতা গুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি চিত্রগুপ্তের পাপের খাতায় আমার নামটা বড বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে।

—হ্যাগো, সেই খাতাতে আমার নাম লেখা আছে?

—তোমার নাম থাকবে কেন কৃষ্ণা?

কৃষ্ণাকুমারী ইন্দ্রজিতের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল—চিত্রগুপ্ত ভুলে গিয়ে থাকলে আমি তা মনে করিয়ে দেবো।

কৃষ্ণা—।

কিগো।

দু'হাত দিয়ে কৃষ্ণাকুমারীকে বুকে টেনে আকুল হয়ে বলে উঠল—সত্যি বলছো কৃষ্ণা, আমাকে ছেড়ে তুমি যাবে না?

কথা শোন, আমি যে তোমার স্ত্রী। শুধু কী তাই, তোমার কৃষ্ণা, সকলে বড়বৌকে বড়বৌ, মেজবৌকে মেজবৌ বলে ডাকে। কৈ তুমি তো আমাকে ছোটবৌ বলে ডাক না। আমি যে দু'ভাবেই তোমার কাছে ধরা দিয়েছি। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব?

—যদি তাড়িয়ে দিই।

তাড়িয়ে দিলে মরণ ছাড়া আমার আর কোথাও যাওয়ার পথ থাকবে না।

ইন্দ্রজিতের বুক থেকে এক জমাট বাঁধা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। দূর থেকে বাঁশীর বেসুরো ধ্বনি ভেসে এল। কোন প্রহরীর রাত্রির ক্লান্তিকে ভুলে থাকার জন্য এক নিস্ফল নীরব সাধনা।

ইন্দ্রজিৎ জড়িত স্বরে আবার বলল—আমাদের বিয়ের কথা মনে পড়ে?

—তা আর পড়ে না। এ যে মেয়েদের জীবনে এক মহামূল্য স্মৃতি। কৃষ্ণাকুমারী উঠে বসে চুলের মসলিন ফিতা খোপায় জড়াতে জড়াতে আপন

মনেই বলে চলল—এক মাস পরে সিংহ ফটকে বাজবে সানাইএর সপ্ত স্বর। মহলে মহলে ভরে যাবে আনন্দের উচ্ছ্বাস। ঐ আকাশে পুড়বে আতশবাজি। হায়রে রঘুনাথের হতভাগিনী পত্নী এখনো জানে না তার রাঙা কপালে কতখানি দুর্বিষহ দুঃখ লুকিয়ে রয়েছে।

জানালার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণাকুমারী জোরে বলে উঠল—দেখ দেখ, একটা তারা কেমন খসে গেল, ঠিক যেন আতশবাজি।

কোন উত্তর এল না। তাকিয়ে দেখে ইন্দ্রজিৎ কখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। জাগাতে গিয়ে দ্বিধায় হাত সরিয়ে নেয়। থাক, ঘুমোক।

ধীরে ধীরে পালঙ্ক থেকে নেমে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। দূরে আকাশের কোলে এক সার নক্ষত্রের পাশে কেমন যেন গাঢ় অন্ধকার। রাত্রি ফুরোতে আর বেশী দেরী নেই। চাঁদও ঢলে পড়েছে। বাঁশীর আওয়াজ আপনি থেমে গেছে। চোখে ভেসে ওঠে অতীতের এক মধুর স্মৃতিচিত্র---জীবনের সুন্দর মুহূর্তটুকু।

মাথায় লাল কাপড় বাঁধা ও কোমরে রূপালি জরির চাদর জড়িয়ে আটজন বেহারা পাল্‌কি নিয়ে এসে প্রবেশ করল সিংহদ্বারে। পাল্‌কি ঢাকা ছিল রঙিন রেশমের চাদরে। তার জমিতে রূপোলি জার ও সোনালি বুটি। তার ভিতর দিয়ে কৃষ্ণাকুমারী সবিস্ময়ে দেখছিল বিচিত্র সমারোহ। পথিপার্শ্বে জনতার সে কী মূহুর্মুহু উল্লাসধ্বনি। অভ্যর্থনা জানালো হাজার হাজার প্রজা। সিংহদ্বারের মাথায় নহবৎখানায় বেজে ওঠে শিঙার সংগে দামামা। লোক সরিয়ে পথ করে চলে পাইক বরকন্দাজের দল। নানা ধরনের আলোতে সাজানো হয়েছে সৌধকিরীটিনী নগরী। আলোতে ঝলমল করছে সৌধমালা, রঙমহল ও খাসমহল। প্রাকারের পাশে প্রাসাদের ফটকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে প্রহরী। কেউ লাঠিয়াল। ঝাঁকড়া চুলে বাঁধা লাল ফিতে। হাতের লম্বা লাঠি চক্ চক্ করছে। আবার কেউ সুন্দর পোশাক পরে নানা আকারের অস্ত্র হাতে প্রহরারত। তাদের হাতে খড়্গ ও ভল্ল আবছা অন্ধকারে ঝকমক করছে। নাটমন্দিরের সামনে শ্বেত মর্মরের প্রশস্ত দালান। শত শত শিলাময় স্তম্ভে নৃত্যরত নারীরমূর্তি আলোর ঝলকানিতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রাসাদে এসে থামল পাল্‌কি। অসংখ্য শঙ্খধ্বনি জানালো অভ্যর্থনা। নারকেলের জলে পা ধুয়ে মেঝেতে পা দিল। নন্দীমহলের বৌরাণী হলো। সেদিন মনে পড়ে একটি পায়রা হঠাৎ ঝট্‌পট্‌ করে কোথাও থেকে উড়ে এসে

তার কোলে বসেছিল। কালো পায়রা। হা হা করে সকলে ছুটে এসে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপর মহল পেরিয়ে দীর্ঘ অলিন্দ অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। শূন্যে সারি সারি ঝাড়বাতি, কত রং বেরঙের কাচে জ্বলছে শত শিখা। অবশেষে অন্দরমহলে তার ঘরে এসে দাঁড়াল। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল আতশবাজির খেলা।

যথাসময়ে বৌরাণীরা এল। সাদা মহল থেকে মেয়ের দল হৈ-হুল্লোড় করে এসে দাঁড়াল। বরণ করল কৃষ্ণাকুমারীকে। ঘোমটা সরিয়ে সকলে চমকে উঠল—; এত রূপ মানুষের হয়! মেজ বৌরাণী চিত্রা জিজ্ঞাসা করল- নাম কি গো?

—কৃষ্ণাকুমারী।

বড বৌরাণী হেসে উঠ্‌ল—ওমা সে কী গো, এখনো কুমারী!

কংকনা সেদিন ভীতা হরিণীর মত বড বৌরাণী রোহিণীর কানে কানে বলেছিল—কি অলুক্ষণে! চেহারাটা ঠিক যেন সেই রকম। হুবহু সেই মুখ।

বড় বৌরাণী বুঝতে না পেরে বলেছিল—কার মত?

—ঐ যো দিদি, পুরনো বড় বন্ধ ঘরে তুমি আমি একটি ছবি দেখেছিলাম:

ভূত দেখার মত চমকে উঠে বড় বৌরাণী বলে উঠেছিল—না—না সে রকম হ'তে যাবে কেন?

—কিন্তু দিদি, দেখনা, ঠিক যেন লছমিবাইএর মত দেখতে।

সেদিন ধমকের সুরে সে বলে উঠেছিল—আঃ কংকনা, তোর যত সব অনাছিষ্টি কথা।

কৃষ্ণাকুমারী সেদিন যা শুনেছিল তার মর্ম উদ্ধার করতে সে পারেনি।

তারপর শুরু হলো নানা স্ফূর্তি বিচিত্র উৎসবের মাধ্যমে। কত রকম রঙ্গ-তামাসা হলো। খাওয়া হলো সিদ্ধির মিষ্টি শরবত। রাত্রি গড়িয়ে গেল নানা নৃত্যের ছন্দে ও জাদুবিদ্যার আলৌকিক ক্রিড়া নৈপুণ্যে।

ক্লান্ত হয়ে একে একে সব বিদায় নিল। সকলের শেষে বিন্দা এসে উপস্থিত হলো। শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে প্রণাম করে বলল—তাহ'লে .এলে বৌরাণী।

সেদিন বিন্দার মলিন মুখ দেখে শংকিত হয়েছিল সে। সে শংকা নিতান্ত অমূলক নয়। ক্রমে দৃষ্টি খুলে গেল। আতশবাজি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মধুর কল্পনাও নিমেষে মিলিয়ে গিয়েছিল। নন্দী প্রাসাদের পুরনারীদের জীবনযাত্রার সংগে বন্দী জীবনের খুব বেশী পার্থক্য নেই। মহলের ভিতরে স্বাধীনতা আছে কিন্তু মুক্তির আনন্দ নেই। ঐশ্বর্য আছে কিন্তু ভোগের স্পৃহা

থাকে না। নন্দী মহলে আসার একটি পথ আছে, ফেরার পথ নেই। এখানে বৌরাণীরা এসেছে কিন্তু দ্বিরাগমন হয়নি।

এই নিয়ম বহুদিন আগে কোন্ বুদ্ধিমান করে রেখেছিল তা কেউ বলতে পারে না। তবে তার পরে নন্দীপুরুষরা এর সুফল মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। বৌরাণীদের পিতৃগৃহে যাওয়ার রীতি থাকলে তাদের বেশীর ভাগ পুনরায় শ্বশুরালয়ে আসত না, নয়তো আত্মহত্যা করে পিতৃদেবের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করত।

ইন্দ্রজিতের মিষ্টি সম্ভাষণে কৃষ্ণাকুমারী চমকে উঠে তাকিয়েছিল। খুলে পড়েছিল মুখের কাপড়। এক অশুভ অলুক্ষণে চিন্তায় সেদিন ইন্দ্রজিতের বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠেছিল সে। সেদিন কি ইন্দ্রজিৎ তার মর্মবেদনার কথা জানতে পেরেছিল!...ঘণ্টা ফটকের সময় সংকেত ধ্বনিতে কৃষ্ণাকুমারীর অতীত স্মৃতিচিত্রখানি আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

পরদিন বেলায় বেলায় কৃষ্ণাকুমারী প্রসাধনে বসল। আজ সে মন্দিরে যাবে। কবরী বাঁধল সযত্নে আর তাতে গেঁথে দিল সোনার ফুল। আয়ত চোখের কোলে টেনে দিল কাজলের রেখা। দেহে জড়ালো শুভ্র রেশমী কাপড় যার ভিতর থেকে ফুটে উঠল রক্তবর্ণের কাঁচুলি। পায়ে পরল রাজপুতী নূপুর। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে মুখে ঢেকে দিল ওড়না যাতে ফোটান লক্ষ রূপালী তারা।

মন্থর পদক্ষেপে নূপুরের মধুর ধ্বনি তুলে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার কৌতুহল ভরে পিছনের দিকে তাকাল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মুচ্‌কি হেসে বলল—ওঃ জিজ্ঞেস কচ্ছো, আমি যাচ্ছি কোথায়? সে মন্দ কপালের কথা আজ নাই বা তুমি শুনলে। আমার হাসি দেখে হাসছ? না—না, এ আমার সত্যিকারের হাসি নয়।

মহল ছেড়ে কানাড়ি পথে পা বাড়াল কৃষ্ণাকুমারী। মন্দিরে যাওয়ার গোপন পথ। আগে সুড়ঙ্গ হিসাবে পথটি নানা গোপন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পথটি সেই থেকে আজও পুরনারীরা ব্যবহার করে আসছে। পুরুষদের এই গোপন পথে আসা নিসিদ্ধ। কিছুদূর গিয়ে কৃষ্ণাকুমারী দাঁড়িয়ে পড়ে। পিছন হতে ভেসে আসে একরাশ নূপুরের ঝংকার। মহলের বৌরাণীরা ও সাদা মহলের বৌরা এসে দাঁড়ায়। সংগে আসে নৈবিদ্যির থালা হাতে দাসীর দল। দৃষ্টি বিনিময় হয়। তারপর

আবার এগিয়ে চলে। কানাড়ি পথের নিশ্চল দেওয়ালে ধ্বনিত হয় নূপুর নিক্কণ।

আজ এ নতুন নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এইভাবে বৌরাণীদের দেবতাদর্শন চিরাচরিত। কানাড়ি পথের বাঁকে এসে সকলের দৃষ্টি প্রতিহত হলো। বাঁকের বাঁ দিকে দেওয়ালের কিছু অংশ লাল পাথরে গাঁথা। মাঝে মাঝে বধূরা এইখানে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। সারা কালো পাথরের দেওয়ালের মাঝে ঐ লাল পাথর ক'টা ব্যঙ্গ করে দাঁড়িয়ে। আগে ওখানে ছিল একটি গোপন দরজা।

অতীতের দুয়ার আজ বন্ধ। বহুদিন আগে কেঁকামহল থেকে লছমিবাই ঐ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর নূপুর বাজিয়ে রূপের ঢেউ তুলে মহলের বৌরাণীদের সংগে মন্দিরে যেতো দেবতা দর্শনে।

দূর থেকে ভেসে এল আরতির ধ্বনি। বৌরাণীদের চমক ভাঙ্গে। চঞ্চল হয়ে উঠে তাদের পদযুগল। এগিয়ে চলে।

এই চিরন্তন দেবতা দর্শনে বৌরাণীদের ম্লান চোখ ভক্তিতে উজ্জ্বল হয় না। দীর্ঘ অলস সময়ে এটুকু যেন তৎপরতা। প্রাণের স্পন্দন। অর্ঘ্য ভক্তিতে অর্পিত হলেও তাদের বাসনার কারাগারে বন্দিনী হৃদয় এক আকুল বেদনায় বার বার কেঁদে ওঠে।

অবশেষে সকলে মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। চন্দন কাঠের তৈরী বড় দরজা ধূপের ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটানা বেজে চলেছে রূপোর ঘণ্টাগুলি। দামামাগুলি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মল্লার ভক্তের দল নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছে।

মন্দিরের ভিতর অস্পষ্ট। এক দীর্ঘকায় পুরুষ অপূর্ব ভঙ্গিমায় আরতি করছে। বৌরাণীরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের মাঝে ঠাট্টা আর ছোট ছোট কথার টুকরো ভেসে বেড়াতে লাগল। কৃষ্ণাকুমারী ওড়নার ভিতর থেকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে শূন্যে রূপোর ঘণ্টাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। কী সুন্দর ছন্দে ছন্দে গায়ে গায়ে পড়ে নৃত্য চপল হয়ে বেজে চলেছে। ঠিক এমনি ভাবে তার বুকের ভীতরও নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ঠোকাঠুকি খেয়ে হৃদয় স্পন্দিত হয়ে চলেছে।

বৌরাণীদের আর তর সয়না। তাদের উৎসুক দৃষ্টি মন্দিরের ভিতরে চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। বিন্দা যে প্রচারে একজন সুকৌশলী তা বধূদের চঞ্চলতা লক্ষ্য করে নিঃন্দেহ হওয়া যায়।

কৌতূহলের সমাপ্তি ঘটে। আরতি শেষ হয়েছে। বাজনা থেমে গেছে। কৃষ্ণাকুমারী চোখ বোজে। আরতির বাদ্যধ্বনি তখনো যেন তার কানে সুর টেনে চলেছে। বৌরাণীরা তখন ওড়না খুলে ফেলেছে।

বাইরে এসে দাঁড়ায় মন্দিরের পূজারী। ব্রহ্মচারী দীর্ঘকায়। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। পরনে গৈরিক বসন। লম্বা কোঁকড়ান চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। চুল থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। আয়ত চোখ দুটিতে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। কপাল রক্ত চন্দনে লিপ্ত।

বড় বৌরাণী প্রথমে গিয়ে হাত পাতে। হেসে ফেলে। ব্রহ্মচারীকে সম্বোধন করে বললে—আজ প্রথম এলাম। সার্থক হলো।

—কী সার্থক হলো?

এই পোড়া চোখদুটো। বেশ হয়েছে। বাবা মহাশ্বরের যোগ্য পূজারী।

ব্রহ্মচারী শুধু হাসল।

একে একে সকলে এগিয়ে এসে চরণামৃত নেয়। সুন্দরীদের রূপের হাটে ব্রহ্মচারীও দিশেহারা হয়ে পড়ে।

পাশ থেকে সাদামহলের কোন একটি বৌ হেসে উঠে ব্রহ্মচারীকে বলল—মন্ত্র নেবো ঠাকুর—দেবেন?

—নিশ্চয় দেবো কিন্তু দীক্ষা নেবার উপযুক্ত না হলে দিই কি করে?

—আপনি যে দীক্ষার কথা ভাবছেন, সেই দীক্ষা নয়। হৃদয়ের দীক্ষা। যে দীক্ষায় দেহটা জুড়িয়ে শুধু আপনাকে—

—আঃ কি হচ্চে। ধমক দেয় বড় বৌরাণী।

হাসির ঝড় ওঠে চারিদিকে।

সবশেষে এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণাকুমারী। হাত পাতে চরণামৃতের জন্য। এক দমকা হাওয়ায় খসে পড়ে তার মুখের ওড়না। চন্দন ব্রহ্মাচারী চমকে উঠে পিছিয়ে আসে। অন্য বৌরাণীরা এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

কৃষ্ণাকুমারীর অপরূপ রূপরাশি সর্বোপরি তার মুগ্ধ চাহনি দেখে দেবতাও সেখানে ক্ষণিকের জন্য চমকে উঠত। ব্রহ্মচারীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি যেন বলে উঠে—তোমার দৃষ্টিতে আজ আমার দৃষ্টি হারা হলো।

কৃষ্ণাকুমারীর দৃষ্টিও ব্রহ্মচারীর উগ্ররূপে শূন্যে থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়ার মত চমকে উঠল। কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চল হয়ে যায় সবকিছু। এমন কি তার শ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত। কিন্তু পর মুহূর্তে এক চেতনা তাকে সাজাগ করে তোলে—ছিঃ। ওড়না টেনে দেয় মুখের উপর।

তারপর সকলে ফিরে গেল কানাড়ি পথে। ব্রহ্মচারী তাকিয়ে রইল। ভেসে এল মন্থর নূপুরের ছন্দহীন ঝংকার।

মন্দির নিস্তব্ধ হয়ে যায়। চন্দন ব্রহ্মচারী নিজ গৃহে ফিরে চলে। মন্দিরের পাশেই তার আবাস।

ঘরে এসে ঢুকল। সুবিস্তৃত ঘর। একটি কোণে বহুমূল্য পালঙ্ক। সুন্দর একটি নিভাঁজ কোমল বিছানা। তাতে ঢাকা গেরুয়ার চাদর। দেয়ালে ঝুলছে ত্রিশূল, একটি কমণ্ডলু আর লোমবিহীন হরিণের চামড়া। দূরে একটি প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে ছড়ানো একরাশ শুকনো ফুল। ব্রহ্মচারী পালঙ্কের একটি পাশে এসে বসল। তার মুখে খেলছে চিন্তার ঢেউ। দূর—বহুদূর থেকে ঘুমিয়ে পড়া একটা ঘূর্নি ঝড় আবার যেন মাথা ঝেড়ে উঠেছে। অতীত স্মৃতির দেউড়ে দামামার আওয়াজ গুর গুর করে যেন বেজে উঠল।

কৃষ্ণাকুমারী—ছোট বৌরাণী। বিন্দার বর্ণনার সংগে হুবহু মিলে গেছে। এত রূপ মানুষের হয়! তার চাহনিতে সে খুঁজে পেয়েছে সুপ্ত ঝড়ের তাণ্ডবতা। অতীতে সে অনেকের সংগী হয়েছে কিন্তু শেষে অতৃপ্ত ভোগের অবসন্নতা নিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে। আজ শুধু তার মনে হচ্ছে— এই সেই। এই সেই নারী। এতদিনে কেবল কামনার লেলীহান অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে কিন্তু শান্তি পায়নি। কৃষ্ণাকুমারীকে তার চাই। ভোগই ঐশ্বর্যের দ্বার। সেই দ্বার দিয়েই পৌছানো যাবে নিরাসক্তে। সেই তো হবে মুক্তির প্রধান সোপান। ধর্মের করণীয় পঞ্চবান হচ্ছে—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

জানালায় এসে দাঁড়াল। বাতাসে ভেসে এল "সাবধান ব্রহ্মচারী! সাবাধান।"

হঠাৎ পদশব্দে ব্রহ্মচারী ফিরে তাকায়। ঘরে এসে ঢুকল বিন্দা। দুর্বল মন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ব্রহ্মচারী হাসল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠল এক খুশির জোয়ার। ডাকল—এসো বিন্দে।

বিন্দা ব্রহ্মচারীর পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করল।—কাল আসতে পারিনি ঠাকুর।

—তাতে কী হয়েছে বিন্দে। শিবশম্ভু যদি ডাকেন তা নিশ্চয় আসবে।

বিন্দা মেঝের উপর বসে পড়ে বলল—ঠাকুর এত অল্প বয়েসে সাধু হলেন কেন?

. ব্রহ্মচারী হাসল—তোমার কী মনে হয় ?

—আমার কিছু মনে হয় না। ঠাকুর দেবতার মনের ইচ্ছে। কাকে কখন দরকার পড়ে তা দেবতারাই বলতে পারে।

ব্রহ্মচারী পালঙ্কে এসে বসল। চোখ বুজে কি যেন ভাবে। বিন্দার হৃদয়ে এক গদগদ ভাব উছলে উঠে। এতদিন পর সত্যিসত্যি এক সন্ন্যাসীর দেখা পেল সে।

চোখ খুলে ব্রহ্মচারী বলল—সেই বাল্যকাল থেকে এই পথে এসে নেমেছি। দেশদেশান্তর ঘুরেছি। তপস্যা করেছি। শেষে ঠাকুরকে পেলাম। মহাশক্তিও পেলাম। কিন্তু বিন্দে এখানে এক পাপ আছে, যার জন্য কারো মনে শান্তি নেই। বিশেষ করে বৌরাণীদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে আমি পারি না।

বিন্দা আশ্চর্য হয়ে যায়।—একথা জানালেন কি করে ঠাকুর ?

—আমার মন বলেছে।

—ঠিক বলেছেন ঠাকুর। যার জন্যে এখানে আসা। সেই ছোটরাণীর কথা বলেছিলাম। আজ সে এসেছিল এখানে। দেখেছেন তাকে ?

—কে বলতো ? না চেনার ভান করে ব্রহ্মচারী।

সবচেয়ে সুন্দর বৌরাণী। অমন পাগল করা রূপ আর কার আছে! তারপর বিন্দা গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল—কোন কবজ টবজ আছে ? দিন না যাতে ছোটবাবু ধরা পড়ে।

—তোমাদের ছোটবাবুটি কে ?

—আহা, বড় ভাল লোক। মন্দিরে এখনো আসেননি। তবে আসবেন।

—চন্দন ব্রহ্মচারী উঠে দাঁড়াল। ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল—এখন যাও বিন্দে।

—বিন্দা শশব্যস্তে উঠে পড়ে তারপর ঢিপ করে প্রণাম করে কম্পিত স্বরে বলল—আমার কথায় রাগ করলেন ঠাকুর। কবজ না হোক এমন কিছু দিন যাতে ছোটরাণীর দুঃখ ঘোচে।

ব্রহ্মচারী সোজা হয়ে তাকাল।—কাল এসো সব কথা হবে।

বিন্দা চলে যায়।

ব্রহ্মচারী দ্রুত গতিতে উঠে গিয়ে দোর বন্ধ করে দেয়ালের এক খোপরের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর খোপরে হাত দিয়ে একটি কাঠের বাক্স এনে তা খুলে ফেলে। কিছু শুকনো পাতা বের করে তার থেকে। সেই শুকনো

পাতা হাতের তালুতে রেখে আঙ্গুল দিয়ে ঘসে ঘসে বড়ির মত করে মুখে ফেলে দেয়।

আবার পালঙ্কে এসে বসল, নেশায় চোখ জড়িয়ে আসে। ঘরের জিনিস অস্পষ্ট হয়ে উঠে। কাছের জিনিস দুলতে থাকে। জড়িত স্বরে বলে চলে—কাল থেকে যতক্ষণ আরতি শেষ না হচ্ছে, শিবের মাথায় শেষ বিল্বপত্র না পড়ছে ততক্ষণ বৌরাণীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ঠাকুর পূজো অতো সহজ নয়। চরণামৃত নিতে হবে মুখের ঘোমটা খুলে। দেবতার কাছে আবার লজ্জা কিসের?

মন্দিরের ঘণ্টাগুলি একসংগে বেজে উঠল। কে যেন সকলের অলক্ষ্যে দেবতাদর্শনে এসেছে। উঠে দাঁড়ায় ব্রহ্মচারী। প্রদীপের কম্পিত আলোর শিখা দেওয়ালে কেমন নাচছে। একটা কঙ্কাল হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অতীত ইতিহাসের কথা মূক ভাষায় কী যেন বলছে। ব্রহ্মচারী বিস্ময়ে তাকিয়ে বলে উঠে—কি, আমাকে ভয় দেখাছিস্? বেশ করব। পৃথিবীতে ভক্তির অর্ঘ্যের সংগে ভোগেরও পূজো হয়। বিশ্বাস কর, এই আমার শেষ খেলা। আর কিছু চাইবো না। আর একা নয়। দু'জনের যাত্রা শুরু হবে সেই সুদূরে নিরুদ্দেশ পথে। শক্তি চাই। আমাকে শক্তি দাও।

দূর থেকে সুমধুর সংগীত ভেসে এল। কোন এক পথিক গেয়ে চলেছে।

ব্রহ্মচারী হাসল—কাপুরুষ। এ-পারের সুখ-দুঃখকে ঘৃণা করে ও-পারের জয়গান গাইছে।

কাছারীবাড়ী ছেড়ে ইন্দ্রজিৎ মন্দিরে এসে দাঁড়াল। মন্দিরের দরজা তখনো বন্ধ হয়নি। ইন্দ্রজিৎ ঘণ্টার শিকল ধরে টেনে দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানায়। তারপর মন্দির থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। কে যেন অনুসরণ করছে। পিছনে তাকাতে দেখে দুলভি।

ইন্দ্রজিৎ হেসে এগিয়ে চলে। মহল প্রাসাদ পিছনে ফেলে উদ্যান পেরিয়ে আম্রবনে এসে দাঁড়াল। সরু জংলা পথ ধরে এগিয়ে যায়। বড় অন্ধকার। গাছের ডালে যেন বন্ধ বাতাসের ফিস্‌ফিসানি। শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি। চাদরটা ভালভাবে জড়িয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চলে।

অবশেষে ছোট এক কুটিরের দুয়ারে এসে দাড়াল। তকতকে উঠান। খড়ের ছাউনি ভেঙ্গে পড়ছে। হাড়গোড়ের মত বেরিয়ে পড়েছে বাঁশ বাখারি। দোর ভেজান। ভিতরে আলো জ্বলছে। একটু ঠেলা দিতে

দরজা খুলে যায়। একটি মলিন শয্যায় শুয়ে নটবর ঠাকুর। কপালে হাত রেখেছে। একরাশ অবিন্যস্ত দাড়ি আর দীর্ঘ শুভ্র কেশে মুখটি আচ্ছাদিত। কঙ্কালসার চেহারা।

ইন্দ্রজিৎ ডাকল—ঠাকুর!

চমকে উঠে নটবর ঠাকুর। বড চোখের নীচে মাংস ঝুলে পড়েছে। কী উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি।

গম্ভীর স্বরে আহ্বান এল—ভিতরে এসো।

ইন্দ্রজিৎ জুতো খুলে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। এক বটকা গন্ধে তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

—ঐ কোণে আসন আছে। পেতে বসো।

ইন্দ্রজিৎ আসন পেতে বসল।

নটবর ঠাকুর আবার চোখ বুজল।

—কেমন আছেন? জিজ্ঞাসা করে ইন্দ্রজিৎ।

—ভাল না। তা কি মনে করে? ক্রোধের স্বর কণ্ঠে ভেসে উঠল।

—এমনি এলাম আপনাকে দেখতে।

—তা দেখলে তো, এবার আসতে পার। রক্তবর্ণ চোক্ষে নটবর ঠাকুর উত্তর দেয়।

ইন্দ্রজিৎ মৃদু হাসি হাসল। বলল—আপনি অযথা আমার ওপর রাগ করছেন।

—আমি উন্মাদ হতে পারি ইন্দ্র, কিন্তু বোকা নই।

—আমি জানি ঠাকুর। তাই তো এলাম। এ আমি চাইনি। এ সব হবে তাও জানতুম না।

নটবর ঠাকুর এবার ধীরে উঠে বসল। দুহাতে ভর করে শরীরটাকে বসিয়ে রাখে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এ কী ব্যবসা? দেবতার ব্যবসা খুলে বসেছ?

—আমি জানি ঠাকুর।

—তুমি কাঁচকলা জান। ঐ ব্রহ্মচারী এক নম্বরের জুয়াচ্চোর। সম্মোহনী শক্তিতে ওস্তাদ। তোমাদের মাথাগুলি এবার চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে।

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে থাকে।

নটবর ঠাকুর এবার একখানা শীর্ণ আঙুল তুলে রক্তিমচক্ষু বিস্ফারিত করে বলে আমার দেবতাকে তুই কেড়ে নিয়েছিস্। তোর সর্বনাশ হবে, তোর সর্বনাশ হবে

—ঠাকুর—ঘরের বাইরে থেকে কে যেন চীৎকার করে উঠে প্রতিবাদ জানাল।

ইন্দ্রজিৎ বলল—সকলেই আমাকে অভিসম্পাত দেয়। সত্যি যদি পাপ করে থাকি তার শাস্তি আমাকে যে পেতেই হবে ঠাকুর।

—দেবতা নিয়ে ব্যবসা? কুকুরের মত আমাকে তাড়িয়ে দিলি!

—বিশ্বাস করুন ঠাকুর, এতে আমার কোন হাত ছিল না।

নটবর ঠাকুর বাইরে তাকিয়ে বলল—বাইরে ওটা কে?

—দুল্‌ভি।

—তা ওতো চেঁচাচ্ছে কেন? ওর বাপ্‌কে আমি গালি গালাজ করেছি? জানোয়ার।

ইন্দ্রজিৎ মাথা নীচু করে আস্তে বলল—দুল্‌ভি, তুই যা।

—তোদের অত্যাচার অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। মদ আর মেয়ে মানুষই তোদের কাল করল। ঠাকুরকে ডেকেছি। বার বার বলেছি ওদের ক্ষমা কর।

ইন্দ্রজিৎ এবার মাটিতে মাথা নুইয়ে বলল—আমি জানি ঠাকুর, আমি জানি। আপনার ছোট্ট তরী দিয়ে কেন পারবেন এতগুলো উদ্ধার করতে!

নটবর ঠাকুর দু'হাত দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে হাঁপাতে থাকে। সজল আঁখি দুটি তুলে ধরে। আস্তে ডাকল—ইন্দ্রজিৎ!

—ঠাকুর।

—ভালই হলো। সরে এসে মঙ্গলই হয়েছে। শরীরটা আর চলছিল না। কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেল। এই জগতে কেউ কারো নয় রে কেউ কারো নয়। শুধু আকর্ষণ আর বিকর্ষণ। শুধু ভাঙ্গা আর গড়া। জীবন ও মৃত্যু। সংহার ও সৃষ্টি। তুমি যাও ইন্দ্রজিৎ, তুমি যাও।

নটবর ঠাকুর শুয়ে পড়ে।

—ঠাকুর, আপনি কিছু অর্থ না নিলে আমি যে শান্তি পাচ্ছি না।

—বড় কর্তার টাকা?

—আজ্ঞে জমিদারির?

—দয়া করছিস্।

—না না, আপনার দয়ায় এতদিন দেবতাকে অর্ঘ্য দিয়েছি সে পূণ্য হাতে এ শুধু শ্রদ্ধার স্বরূপ।

—এ তোর ভক্তির কথা, না চাটুকারিতা?

ইন্দ্রজিৎ ম্লান হাসি হাসল।—চাটুকারিতা কাকে বলে জানি না।

—টাকা নিয়ে কি করব ?

—দেহটাকে তো রক্ষা করতে হবে।

—বেশ, তুই কেনাকাটা করে আমাকে পাঠিয়ে দিস্। কার হাতে পাঠাবি ?

—আপনি বলুন।

—ঐ তোর তুল্‌ভিকে দিয়ে পাঠাস। যমদূতের মত চেহারা হলে হবে কি, মনটা ভাল।

আজ্ঞে ওযে—

—ছোট জাত ? নটবর হাসল,—ওর গায়ে কি ছোট জাত লেখা আছে ? ছোট জাত তোমাদের ঐ নায়েব। বামুন হলে কি হবে, মনটা বড় নোংরা।

ইন্দ্রজিৎ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। নটবর ঠাকুরের আরও একটা রূপ নতুন ভাবে ধরা পড়ে। সত্যিই পাগল। একদিন বৌরাণীদের সাজের ঢং দেখে ক্ষেপে গিয়ে চরণামৃতের জল গায়ে ঢেলে দিয়ে বলেছিল—অতো ঢং কেন, কার জন্যে সেজেছিস্ ? ভোলানাথ মহেশ্বর ফিরেও দেখবে না। মন দিয়ে ডাক।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়ায়—আমি চলি। আবার আসব, কাশীরাম কবিরাজ আসবেন। যখন যা দরকার তুল্‌ভিকে দিয়ে বলে পাঠাবেন।

নটবর ঠাকুর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিড়বিড় করে বলে চলে—এমনিভাবে আসে আর এমনিভাবে সকালে চলে যায়।

ইন্দ্রজিৎ বাইরে এসে দাঁড়াল, তারপর দোর টেনে দেয়।

মহল ছাড়িয়ে ইন্দ্রজিৎ সোজা নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল। শরীরটা বড় অবসন্ন। নটবর ঠাকুরের অভিসম্পাত বড় বিব্রত করে তুলেছে তাকে। দেয়ালে করণকুমারের তৈলচিত্রের উপর চোখ পড়ে। কাছে এসে দাঁড়াল। কী সুন্দর ছবি ! মাথায় পাগড়িটি কী সুন্দর কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। চোখে ফুটে উঠেছে এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস। ইন্দ্রজিৎ তৈলচিত্র ছেড়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে করণকুমারের প্রতিচ্ছায়া। তার মনে হয় চেহারায় হুবহু সাদৃশ্য আছে কেবল চাহনিতে দুজনের দৃষ্টি ভিন্ন। সে যে ভীরু। আত্মগ্লানির ব্যথাতুর আঁখি। পালঙ্কে এসে বসল। কত রাত্রি তা ঠাহর করতে পারল না। কি মনে করে উঠে পড়ে। ঘর ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে বেরিয়ে এল। নির্দিষ্ট

জায়গা ছেড়ে ছাদের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়াল। ঝাউবনে হাওয়ার ঝড় উঠেছে। জলসাঘর এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। বাতাসে ভাঙা ভাঙা ঘুঙুরের শব্দের টুকরো ভেসে এল। সুউচ্চ প্রাকার ঘিরে রয়েছে হলুদপুরমল্লাকে। দৃষ্টিতে ভেসে উঠে মন্দির, নাটমন্দির, কাছারিবাড়ী, জলসাঘর, লছমিখাল, ধনী প্রজাদের মনোরম অট্টালিকা। হঠাৎ দৃষ্টি চমকে যায়। ঐ তো লছমিমহল। অতৃপ্ত আত্মার আশ্রয়স্থল। ভাঙতে কেউ সাহস পায় না। কেবল একটি প্রাচীর তুলে সকলের অন্তরালে রেখে দেওয়া হয়েছে। হতভাগিনী লছমিবাই। কী মর্মান্তিক রহস্যঘন ঘটনার মধ্যে তার জীবনাবসান হয়েছিল সাত আট পুরুষ আগে।

রাত্রির নিঝুমতার মধ্য দিয়ে অতীতের বহু বিচিত্র ঘটনাবলী হাত ধরাধরি করে ইন্দ্রজিতের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কত বিরহ, কত হাসি কত কান্না, কত জীবন কত মৃত্যু হাজার হাত মেলে তাকে আকর্ষণ করছে।

আনমনে ধীরে চলে সে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে দাঁড়িয়ে চরিত। সারা অঙ্গে বার্ধক্যের ছাপ। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা চুল পাটের মত জড়িয়ে রেখেছে মাথাটা। বলিষ্ঠ পেশী স্থানচ্যুত হয়ে আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

ইন্দ্রজিৎ পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ঘণ্টা ফটক থেকে সময়ের সংকেত ভেসে আসে।

ঘরের কাছে এসে ইন্দ্রজিতের মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায়। দেয়ালটা ধরে নিজেকে সামলে নেয়। ক্ষিপ্রগতিতে দুটি হাত এসে ইন্দ্রজিৎকে ধরে ফেলে। টলতে টলতে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। হঠাৎ এরকম হলো কেন! আস্তে বলল—আমাকে একটু জল দে চরিত।

এই ঠাণ্ডায়ও তার কপালে স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে। মুখের কাছে গ্লাস তুলে ধরলে ইন্দ্রজিৎ চোখ মেলে বিস্ময়ে বলে উঠল—তুমি!

—একটু জল খেয়ে নাও।—করুণামিশ্রিত গম্ভীর সুরে কৃষ্ণাকুমারী বলে।

—তুমি কখন এলে কৃষ্ণা?

—এসেই তো চরিতকে পাঠিয়েছিলাম।

—এ তুমি কী করলে, কেন এলে? দেখলে নিন্দে করবে যে।

—কে?

—সকলে।

—তুমি করবে না তো?

কৃষ্ণাকুমারী ইন্দ্রজিতের কপাল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে জরি আঁটা ময়ূরের পালকের পাখা তুলে হাওয়া দিতে দিতে বলল—অত শত ভেবে শরীরটা নষ্ট করছ কেন বলতো?

—কি করব কৃষ্ণা, সরিয়ে দিতে চাইলেও ভাবনাগুলো সব জড়ো হয়ে ভীড় করে এসে দাঁড়ায়।

ইতিপূর্বে কৃষ্ণাকুমারী আর কখনো এভাবে ইন্দ্রজিতের ঘরে আসেনি। আজ সে ঘুমোতে পারেনি। একটা অমঙ্গলের আশংকা তাকে পেয়ে বসেছিল। ইন্দ্রজিৎকে একবার না দেখে কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না সে। মমতা ঝরে পড়ে তার কণ্ঠে—কবিরাজকে ডেকে পাঠাব?

—না—না, তেমন কিছু হয়নি আমার। কৃষ্ণাকুমারী উঠে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—চরিত, তুমি যাও। আমি আছি।

চরিতের চোখে মুখে এক পরিতৃপ্তির হাসি। কৃষ্ণাকুমারী লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এমনিভাবে তাদের দু'জনকে দেখলে আর কেউ খুশী না হলেও চরিত যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে তা সে জানত।

—আমি নীচে আছি রাণীমা, দরকার হলে ডেকো। বলে বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে দেয় চরিত।

কৃষ্ণাকুমারী ফিরে এল। ইন্দ্রজিৎ তার দিকে বিস্ময়ে তাকাল। দীর্ঘ নয়নের কালো দুটি তারা কিসের উচ্ছ্বাসে চঞ্চল।

কৃষ্ণাকুমারী বলল—একটা কথা বলব, রাগ করবে না?

—না, বল।

—ছাদে যাও কেন? বলবে এক আকর্ষণে। এত দুর্বল তুমি?

—হ্যাঁ, সত্যি আমি দুর্বল। তুমি তো জান এ আমার একটা নেশা মাত্র। না গেলে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। লোকে বলে ভূতে পেয়েছে। তুমি বলবে—।

—আমি কিছু বলব না। চুপ কর। তুমি ঘুমোতে চেষ্টা কর।

ইন্দ্রজিৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পাশ ফিরে শুয়ে কৃষ্ণাকুমারীর একটি হাত টেনে নিয়ে আস্তে বলল—আচ্ছা, আমার প্রতি তোমার এত ভালবাসা কেন?

—ওমা কথা শোন! কে বললে তোমায় ভালবাসি? একটুও না। কৃষ্ণাকুমারী উদ্বেলিত অশ্রুকে লুকোবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

তার হাতটা চেপে ধরে ইন্দ্রজিৎ। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না, কেবল একটা উত্তেজনায় ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে।

কৃষ্ণাকুমারী আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল—ঘুমোও।

কৃষ্ণা—।

—না, কোন কথা নয়। শরীর সুস্থ হলে সব শুনবো।

—ভয় নেই কৃষ্ণা। আমি মরব না। তোমাকে দেখে আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে।

কপালে হাত রেখে কৃষ্ণাকুমারী বলল—আমার দিকে তাকিয়ে তোমাকে যে বাঁচতেই হবে। কাল আর কাছারিবাড়ী যেও না।

—রাতটুকু ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে।

—বেশ, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।

হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় ঝালর বাতির কাটগ্লাসগুলো ঠুনঠুন করে বেজে উঠল। দেয়ালে চোখ পড়াতে আশ্চর্য হয়ে যায় কৃষ্ণাকুমারী। করণকুমারের তৈলচিত্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে হেসে ফেলে—ওটা ওখানে টাঙিয়ে রেখেছ কেন?

—ও আমাকে ভালবাসে।

কৃষ্ণাকুমারী আবার হাসল। বলল—তোমার ধারণা হয়েছে তুমি আবার ফিরে এসেছ, না?

—তাই আমার বিশ্বাস। সহজ ভাবে উত্তর দেয় ইন্দ্রজিৎ।

—লোকে তাই এত কথা বলে।

কৃষ্ণাকুমারীর দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসু নেত্রে বলে—কী বলে?

—জান না? কিছু শোননি?

—শুনিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে তবু আরও একবার তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছে করছে।

—তাই নাকি? লোকে বলে করণকুমার আবার ফিরে এসেছে। আমাকেও বলতে ছাড়ে না।

—তুমি কি তা বিশ্বাস কর?

—সকলে বলে তাই শুনি। বিশ্বাস যে একবারে করি না তাও নয়। আচ্ছা তুমি লছমিমহলে গিয়েছ?

—গিয়েছি।

কৃষ্ণাকুমারীর সুন্দর চোখদু'টি কিসের এক কৌতূহলে ঝকমকিয়ে ওঠে। —কী দেখেছ সেখানে?

—কিছু না। পড়োবাড়ী। বাদুড়ের আস্তানা।

—লোকে যে আরও কত কী বলে।

—কী বলে, ভূতপ্রেতের কথা? ওসব আজগুবি গল্প মাত্র।

—তবে লোকে যে বলে লছমিবাই-এর আত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায়। রাত্রি হলে শত শত আত্মা মহলে দাপাদাপি করে।

হাসল ইন্দ্রজিৎ। বলল—হতে পারে। আমি শুনিনি। তা হঠাৎ লছমিমহলের প্রতি এত আগ্রহ?

—ঐ ছবিটা দেখে মনে পড়ে গেল, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। নাও এবার ঘুমোও।

ইন্দ্রজিৎ এবার পাশ ফিরে শুল। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল—তুমি কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে?

—যতক্ষণ না তুমি ঘুমোও।

তাই করো। ঘুমলে যেও। রাত্রিতে থেকো না। দেখলে হিংসুক দল আবার কত কি বলবে।

কৃষ্ণাকুমারী দূরে জানালার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে শুধু মাথা নেড়ে জানাল, আচ্ছা।

আরও কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। রূঢ় কথা বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু থেমে গেল বিবেকের শাসনে। ইন্দ্রজিৎ অসুস্থ।

এক নিস্তব্ধতা ঘরে নেমে আসে। কত কি চিন্তা মুহূর্তে কৃষ্ণাকুমারীকে ঘিরে ধরে। তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা চোখের উপর একে একে ভেসে ওঠে। বাল্যকাল থেকে শুরু করে আজ এই জীবনের মুহূর্তটুকু। আজ যদি এখানে তার বিয়ে না হয়ে এক সাধারণ ঘরে হতো, বেশ হতো। নাই বা থাকত ঐশ্বর্য, শান্তি তো থাকত। কিন্তু তার রূপ? অহংকার করছে না। এই পোড়া রূপে গাঁয়ের লোক হিংসা করে রূপের সন্ধান জানিয়ে যেত এই নন্দীবাড়ীতে। অমনি বাইচ ছুটত—পালকী ছুটত। তাদের হুকুমে হয়তো গান শিখতে হতো, নাচতে হতো, পরতে হতো হাজার রকমের গয়না। শুধু রূপ নয়, যৌবনও ডালি দিতে হতো এই লোভী পুরুষদের কাছে।

চোখ বুজল কৃষ্ণাকুমারী। দূর থেকে ভেসে এল পাখীর ডাক। হয়তো এক নিশাচর পাখী খাবারের খোঁজে ডাল হতে অন্য কোথাও উড়ে গেল।

তাকিয়ে দেখে ইন্দ্রজিৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, একটি হাত এখনো তার হাতে ধরা। অদ্ভুত এই লোকটি। তাকে ভালবাসে। তাকে

ঘিরে তার শত অভিমান—শত নালিশ। অন্য পুরুষের মত উচ্ছৃংখল নয় কিন্তু এক অবাস্তব বিকৃত সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ভরা। কৃষ্ণাকুমারীর চোখ জ্বালা করতে থাকে। ধীরে ধীরে পালঙ্ক থেকে নেমে এল।

ইন্দ্রজিতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তার চোখে ঘুম নেই। ঠিক এমনিভাবে নন্দী মহলের অন্য বৌরাণী ও বৌরা নিত্য নতুন বাসর ঘর সাজিয়ে প্রতীক্ষায় বসে থাকে। চোখ জড়িয়ে আসে নিদ্রার অলসতায় তবু কান পেতে থাকতে হয় স্বামী দেবতার পদধ্বনির জন্য। মাঝে মাঝে বৌরা চমকে উঠে ছুটে গেছে দোর পর্যন্ত। ঐ বুঝি তাদের প্রিয়তমরা এল। কিন্তু শত আশা পাঁজরের তলায় গুমরানো কান্নার সংগে ডুবে মরেছে। কি নির্লজ্জ, নারীর ব্যর্থ অভিসার।

কখনো কখনো নন্দীরাজপুরুষরা জলসাঘর ছেড়ে অন্দরমহলে এসে দাঁড়িয়েছে। বৌরা অভ্যর্থনা করতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শেষে হাত ধরে শুইয়ে দিয়েছে পালঙ্কের উপর। নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বাইজীর নাম ধরে ডেকেছে তারা। কিন্তু কৃষ্ণাকুমারী অমনিভাবে বাসরঘর সাজিয়ে বসে থাকে না। তবে সেও তাদেরি মত নিদ্রাহীন চোখ মেলে একাকিনী ঘরে বসে সময়ের সংকেত গুণে যায়। এমনি করে অন্দরমহলের রাত্রি নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। আর ফুরিয়ে যায় নারীর সুন্দর মনের বড় আদরের ভালবাসা। বঞ্চিতদের দীর্ঘশ্বাস নির্বাপিত প্রদীপের শিখার মতই এক অক্ষয় ধোঁয়ার কুণ্ডলি শুধু সৃষ্টি করে।

কৃষ্ণাকুমারী মন্থর গতিতে বাইরে বেরিয়ে এল। মুখে ওড়না ঢেকে নিঃশব্দে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

কিছুদিন পরের কথা, বিন্দা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। কৃষ্ণাকুমারী বসে রঙিন কাপড়ে একটি ফুল তোলার চেষ্টা করছে। বিন্দার দিকে তাকিয়ে হাসল—রাগ এখনও পড়লো না?

এক নবরূপ বিন্দার চোখের উপর হেঁয়ালীর আঁচ টেনে দেয়। দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি এলিয়ে পড়েছে। নয়নের পাশে এক দুষ্টুমির হাসি। পাতলা ঠোঁটের মাঝে এক অপূর্ব আবেগ অপরূপ রূপময়ী করে তুলেছে কৃষ্ণাকুমারীকে।

—কিরে, আমার কথার উত্তর দিবি না?

—এমন কি হয়েছে যে রাগ করতে যাব বৌরাণী। মাথা নীচু করে বলে বিন্দা।

—চোখের মাথা তো খাইনি যে তুই রাগ করিস্ নি বললেই তা বিশ্বাস করব ?

—উৎসব এগিয়ে এল। তারপরই মেজকর্তার ছেলের বিয়ে।

—রাস কবে ?

—দিন সাত আট পরে।

কৃষ্ণাকুমারী উঠে দাঁড়িয়ে বলল—রাসে তাহ'লে বেশ ধূমধাম হচ্ছে ?

—তা আর বলতে। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বিন্দা।—তিন দিনে ছুটো যাত্রা। অহোরাত্রি খেউড় কেত্তন। তারপর তো সন্ধ্যে হলেই হাজার হাজার বাজীর ভেল্কী। আরও শুনলাম নদীয়া থেকে বৈষ্ণবী ডালিম আর কবিয়াল হরিধাম আসছে রাস জমাতে।

কৃষ্ণাকুমারী জানালায় এসে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। দিনের সময় ঠাহর করতে চেষ্টা করে। বেলা পড়তে অনেক বাকি।

নন্দী রাসমণ্ডপের খুব নাম ডাক আছে। গাজনের তো কথাই নেই। হাজার রাসদুয়ারীর পাশে সোনারূপোর রাসমণ্ডপ। পর পর তিনটি—গোবিন্দ, মদনমোহন ও গোপীনাথ। বৈষ্ণব ও শৈব্যের অপূর্ব মিলন। উৎসব হয় বিরাট ধুমধামের সংগে কিন্তু নন্দীরাজপুরুষদের এতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। বরং উৎসবের নামে জলসাঘর সাজান হয়েছে হাজার হাজার রঙিন ঝালরে।

কৃষ্ণাকুমারী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—সবাই তো ব্যস্ত, এই ফাঁকে চল্ বিন্দা ঘুরে আসি।

বিন্দা প্রশ্নভরা চাউনি তুলে ধরে—কোথায় ? মন্দিরে যাবে ?

—যাব, তোদের রাইকে একবার দেখতে যাব। সেই যে তুই বলেছিলি, নিয়ে যাবি।

—লছমিমহল দেখতে ?

—হ্যাঁ।

বিন্দা বড় বড় চোখ করে এক রকম চীৎকার করে ওঠে—সর্বনাশ !

—সর্বনাশের আবার কি দেখলি ?

—সর্বনাশ নয় ? মানুষ তো দূরের কথা, ভূতপ্রেতও ওখানে যেতে সাহস পায় না। একমানুষ সমান জঙ্গল। পাগল নাকি ?

—সত্যি পাগল। লক্ষ্মীটি, দেরী করিস্ না। চুপি চুপি দেখেই চলে আসব। কেউ জানতে পারবে না। সন্ধ্যে হতে অনেক বাকি। তুই-ই তো বলেছিলি।

—বললেই যেতে হবে? এরকম কথা আর কারো কাছে শুনিনি। ভয়-ডর নেই। মহলে ঘিঞ্জি পথ। পথ হারালে আর—। তাছাড়া কেউ যদি দেখেই ফেলে?

—কেউ দেখবে না। পথ হারাব কেন, তুই তো আগে ওখানে গিয়েছিস্।

—তা গিয়েছিলাম। সে কি আজ? শরীরও তখন কত শক্ত ছিল।

—একা?

—একা কেন, আমি আর—। কথা শেষ না করেই ভাঙ্গা গালে বিন্দা হেসে ওঠে।

—ও তোর প্রেমিক। তাহলে আমি কি দোষ করলাম। পথ হারালেই হলো?

বিন্দা রাগত স্বরে বলল—তাই এত সোহাগ করে ডেকে আনা হয়েছে। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে যাবে? মহলের পথ দিয়ে গেলে সকলে দেখে ফেলবে। বাইজী মহল দিয়ে যাওয়া নিষেধ। একমাত্র অন্দরমহলের খিড়কির দোর দিয়ে একরাশ জঙ্গল পেরিয়ে—

—তাই, ওদিক দিয়েই চল্।

—বললে তো। জান, ঐ জঙ্গলে সাপ কিলবিল করছে?

—তা কামড়াক না, তোর সাদা চুলে মরণের কালো ছোপই যদি পড়ে তাতে দোষ কী? আর আমাকে কামড়ালে কিছু হবে না। আমি যে বিষকন্যা। আর নেহাতই যদি মরি, ফেলে পালিয়ে আসিস্। আমার আত্মা লছমিমহলটা দেখে তোদের অভিসম্পাত দিতে দিতে চলে যাবে।

—আমার বড্ড ভয় করছে।

—সেদিন তো এত ভয় করেনি। ভেবেছিলি মরিস্ তো ওর কোলেই মরবি। আজ না হয় আমার কোলেই মরবি।

—কী যে বল বৌরাণী। এ তুমি ভাল করছ না। সত্যি বলছি বৌরাণী।

কৃষ্ণাকুমারী হঠাৎ বিন্দার কাঁধে হাত রেখে বাঁ হাতে কপালের উড়ে আসা চুল সরিয়ে হেসে বলল—মন্দটাই বা কি বললাম, আমার মহল আমি দেখতে যাব।

বৌরাণী—। ভূত দেখার মত বিন্দা চীৎকার করে উঠল—ছিঃ, বৌরাণী! তুমি লক্ষ্মীমা। কেন লছমিবাই হতে যাবে! এসব কথা বলতে ভাল লাগে? এমনি মহলে, সারা হলুদপুরমল্লায় তোমাকে আর ছোটবাবুকে নিয়ে এই অনাছিষ্টি কথা বলতে কেউ ছাড়ে না। সত্যি বলছি, অমন কথা বললে আর আমি আসব না। এই দিব্যি করছি।

—বেশ আর ও কথা বলব না। তবে চল্।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত তাকিয়ে থেকে বিন্দা বলল—পথটা দেখে আসি গে। আমি আর পারি না। এখুনি আসছি।......

মহল ছেড়ে অতি সন্তর্পণে সকলের অলক্ষ্যে দু'জনে খিড়কি দোরে এসে দাঁড়াল। বড় তালা ঝুলছে। অনেক আগে ওখানে প্রহরী পাহারায় থাকত, এখন আর নেই। এই ভুতুড়ে জায়গায় কে আসবে! কী অদ্ভুত খেয়াল বৌরাণীর। আজ জানি না কী অঘটনটাই না ঘটে! তারপর যদি কারো কানে যায় যে ছোট বৌরাণী পড়ো লছমিমহল দেখতে গিয়েছিল তাহলে তো রক্ষেই নেই। মরুক গে। মরণ যাদের কপালে লেখা তাদের রক্ষে করবে কে!

তালা খুলে খিড়কি দোর দিয়ে লছমিমহলের দরদালানে দু'জনে এসে দাঁড়াল। গাছ-আগাছায় আর লম্বাঘাসে স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ। দু'টি তালগাছ। এঁকে বেঁকে উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। তার মাথায় পাতার আড়ালে শকুনে বাসা বেঁধেছে। আরো সুন্দর এক ধরনের লতা গাছ তালগাছের গা বেয়ে উঠে গেছে। চারপাশে নানা গাছের জড়াজড়ি। জায়গাটাকে অন্ধকার করে তুলেছে।

বিন্দা ডালপালা সরিয়ে আগে পথ করে চলে। কাঁটার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কৃষ্ণাকুমারীকে সাবধানে চলতে হয়। দূর থেকে ঘুঘুর বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। ছোট এক ঝাঁক পাখী হঠাৎ আগন্তুকের আবির্ভাবে কিচির মিচির শব্দ করে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। বিন্দা ঢিল তুলে মারে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় দু'জনেই। ঐ দূরে জঙ্গলের কাঁটাবনের ফাঁক দিয়ে একটি শেয়াল উঁকি মেরে সুৎ করে সরে গেল। কচুবনে এক সড় সড় শব্দে লম্বা পাতাগুলি কাঁপতে থাকে। বিন্দা সরে যায়। কৃষ্ণাকুমারীকে সাবধান করে দেয়—দেখো বৌরাণী, সাপ তাড়া করতে পারে।

অবশেষে দু'জনে মহলের সামনে এসে হাজির হোল। মাঝারি উঁচু ভাঙ্গা প্রাচীর মহলটাকে ঘিরে রেখেছে। একটা বড় দরজা দিয়ে মহলে এসে দাঁড়াল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লাল পাথরে তৈরী দোতালা প্রাসাদ। মোগল ঢং-এ তৈরী। দূরে হলুদপুরমল্লার বৃহৎ প্রাকার বক্রগতিতে লছমিমহলের পাশ দিয়ে চলে গেছে। সুবিস্তৃত পাথরের চত্বর। বড় বড় পাথরের খণ্ড ইতস্ততঃ ছড়িয়ে। অসময়ে কালপেঁচার কর্কশ চীৎকারে স্থানটি চমকে ওঠে।

অদূরে প্রাসাদ একাকিনী। এক অসহনীয় বেদনায় মূর্ছিতা। দোতালার দীর্ঘ ঘর জাফরী কাটা। মর্মরের জাসি আঁটা। লছমিবাইএর জলসাঘর।

মন্থর গতিতে খাসমহলের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পাথরের দশটি কারুকার্যময় থাম পরপর সাজানো। থামের মাথায় পাথরের তৈরী মুকুট।

দেখার উন্মাদনায় অতীতের অভিশপ্ত মহলের আর্তনাদে দু'জনের কথা যেন শেষ হয়ে যায়। বারান্দা অতিক্রম করে প্রথম কক্ষে এসে দাঁড়াল তারা। বাতাসে ভেসে এল চামচিকির গন্ধ। দম বন্ধ হয়ে আসে। এই কক্ষে বসে লছমিবাই তার প্রিয়তম বড়কর্তার সংগে কতই না হাসিমস্করা করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জালি আঁটা জানালাগুলি ঘরের বিশেষত্ব। ক্ষুদ্র-ছিদ্র মিনারিকা দিয়ে যে আলোর টুকরো ছিটকে আসছে তা যথেষ্ট নয়। লছমিবাইএর প্রণয়াভিসারের গোপন কক্ষ।

কৃষ্ণাকুমারী দ্বিতীয় কক্ষে এসে দাঁড়াল। লছমিবাইএর খাসকামরা। যেমন বৃহৎ তেমনি অভিনব কারুকার্যে মণ্ডিত। ঘরটির ছাদ ঢালু হয়ে চার পাশে নেমে এসেছে। ছাদের দু'দিকে ভাঙ্গা খড়খড়ি—আলো যেন ওখানে হাসছে। জানালাগুলি অদ্ভুত। উর্ধ্বমুখী, সরাসরি দেখার কোন উপায় নেই। আকাশ দেখা যায়। জানালার পাথরের কাঠামো ভেঙ্গে চুরে গেছে। যেন কোন নির্দয় মানুষের প্রহারে চূর্ণ বিচূর্ণ।

বিন্দা বলল—এই ঘরেই লছমিবাই শুতো।

—আচ্ছা, ঘরগুলো তো ভালই, ব্যবহার করলে না কেন? সারা নন্দীমহলের মাঝে এই ক্ষুদ্র ক্ষতটুকু অযত্নে ফেলে রাখার অর্থ কি?

—এরকম প্রশ্ন সকলেই করে বৌরাণী। কিন্তু এ মহল অভিশপ্ত। এর বাতাস বিষাক্ত। এক অতৃপ্ত আত্মা সারা মহলময় ঘুরে বেড়ায়।

—যত সব আজগুবি, নে চল্।

তৃতীয় কক্ষটি আরও বৃহৎ। বিস্মিত হলো কৃষ্ণাকুমারী। চারদিকে অগন্তি জানালা, যেমন বড় তেমনি নানা ঢঙের।

—এই ঘরেই লছমিবাই সাজ সজ্জা করত। বিন্দা বলল পাশ থেকে।

দেওয়ালে টাঙানো লোহার একটা কাঠামো। তেমনি ঝুলছে কিন্তু আরশি নেই। ঘরের পাশে বাঁদিকে কালো পাথরের দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকে দেখে গোল একটা ঘর। মেঝেয় বড় চৌবাচ্চা। সারা মেঝেটা বহুমূল্য শ্বেত পাথরের তৈরী। উঁচু ঘুলঘুলি দিয়ে আলো পাথরে ঘা খেয়ে নীচে নেমে এসেছে। চৌবাচ্চার চারপাশে দাসীর দল কত সাজসজ্জা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো ; আর লছমিবাইএর অপূর্ব তনুখানি জলের তরঙ্গে ছন্দায়িত হতো। চৌবাচ্চার পাশে বড় একটি পাথরের পদ্ম পাপড়ি মেলে আছে। পাপড়িগুলি অসংখ্য ছিদ্রসংকুল। ঐ ছিদ্র দিয়ে কখনও গরম কখনও ঠাণ্ডা জল আর নানা ধরনের সুগন্ধী বস্তু এসে জলে মিশত। লছমিবাইএর 'হামাম-ই গুলাব।'

—হ্যাঁরে বিন্দা, লছমিবাই জাতে কী ছিল, জানিস ?

—শুনেছি রাজপুতানী, হিন্দু হলেও মুসলমানের খানদানে মানুষ হয়েছিল।

কৃষ্ণাকুমারী নীরবে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দার শেষে একটি কোণে উঁচু পাথরের হেলান দেওয়া আসন। ভারি নিস্তব্ধ স্থানটি। আসনটির সংগে লম্বা এক জানালা। এখানে বসে দূরে লছমিবাইএর সুরভি-কুঞ্জ দেখা যায়। সেখানে সে আর বড়কর্তা হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতো। তারপর সবশেষে লছমিবাই এখানে বসে গান গাইতো আর দূরে প্রাকারের উপরে করণকুমার দাঁড়িয়ে শুনেছে লছমিবাইএর কণ্ঠনিঃসৃত বেলাবলী।

কৃষ্ণাকুমারী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। এক অদ্ভুত শিহরণ তার সর্বাঙ্গে খেলে যায়। আরও এগিয়ে যায়। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটু আড়ালে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কাঠের দরজা—বন্ধ। দূর থেকে আবার কালপেঁচা ডেকে উঠল। এক দমকা হাওয়ায় ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে ওঠে। মুক্তির আশায় ঐ কাঠের দরজা যেন তাকে আকর্ষণ করছে। কৃষ্ণাকুমারী এগিয়ে গেল, খুলবে দরজা। হঠাৎ বিন্দার বিকট চীৎকার ভেসে এল—খুলো না বৌরাণী, খুলো না।

—কেন ?

—ওটা সুড়ঙ্গ।

কিন্তু কৃষ্ণাকুমারী কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে খুলে ফেলে। বন্ধ দরজা বহু দিন বাদে আর্তনাদ করে ঝন্ ঝন্ আওয়াজ তুলে খুলে যায়।

সত্যিই অন্ধকার সুড়ঙ্গ। দীর্ঘ সোপানশ্রেণী নীচে ধাপে ধাপে নেমে গেছে। সুড়ঙ্গ বেয়ে এক অট্টহাসি ঠেলে উপরে উঠে আসতে চায়। হঠাৎ কৃষ্ণাকুমারী আর্তনাদ করে সরে আসে। বিন্দা দৌড়ে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে সভয়ে চীৎকার করে উঠলো। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট এক নারীমূর্তি। সে উঠে আসছে। বিন্দা উন্মাদের মত সজোরে দোর বন্ধ করে তাকিয়ে দেখে কৃষ্ণাকুমারী ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

সন্ধ্যে হতে আর বাকি নেই। মহলের ঘুম ভেঙেছে। ঘুঙুর বাজিয়ে এঘর থেকে ওঘরে কে যেন ছুটে যায়। তাল গাছের মাথা থেকে শকুনের কান্নার শব্দ ভেসে এল। মহলে এঘরে ওঘরে জেগে ওঠে শত পদধ্বনি।

বিন্দা দৌড়ে এসে কৃষ্ণাকুমারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে। আর এক মুহূর্তও নয়। প্রতিধ্বনিতে দূর থেকে আবার এক অট্টহাসি ভেসে এল। সুড়ঙ্গের দোরে করাঘাত হচ্ছে ঘন ঘন।

এক দম্‌কা বাতাস মহলে শুরু করে দেয় তাণ্ডবতা। ঘরে কে যেন ডুক্‌রে কাঁদছে। কালপেঁচাও উল্লাসে কর্কশ চীৎকার করে উঠল। বাদুড়ের ঝাঁক কারো তাড়া খেয়ে সন্ধ্যার বুকে কালো ডানা মেলে নেমে এল। হঠাৎ মনে হলো এক কান্না তাদের পিছু পিছু ছুটে আসছে?

থমকে দাঁড়ায় কৃষ্ণাকুমারী। চীৎকার করে উঠে—আমাকে ছেড়ে দে। দোর খুলে দি' গে! শুনছিস্ না লছমিবাই কাঁদছে।

বিন্দা সজোরে কৃষ্ণাকুমারীকে টেনে নিয়ে চলে। সুড়ঙ্গে একটি একটানা চীৎকার সভয়ে ছুটে আসছে। লছমিবাই মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পালিয়ে আসছে তার পুরণো মহলে। ঘনঘন করাঘাত হচ্ছে দরজায়। মহল ছাড়িয়ে ভাঙ্গা দরজা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকতে গিয়ে এক আর্তনাদে স্তম্ভিত হয়ে যায় তারা। বহু দূরে এক চাপা গহ্বর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে আর্তনাদ ভেসে এল —"মুঝ কো না মার ডালো।"

জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐকতান শুরু হয়ে গেছে। জোনাকির আলো ঝোপঝাড়গুলোকে রহস্যঘন করে তুলেছে। বিন্দা আত্মবিহ্বল কৃষ্ণাকুমারীকে একরকম টেনে নিয়ে খিড়কির দোরে এসে দাঁড়াল।

কৃষ্ণাকুমারী চোখ বুজে এক গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল। বিন্দা আজ যদি ওকে না ধরে ফেলতো কী অঘটনটাই না ঘটতো!

একরকম লুকিয়ে কৃষ্ণাকুমারী মহলে ফিরে এল। তার ভীত-চঞ্চল চেহারাটা দেখলে সেদিন সকলে শুধু আশ্চর্য নয় চীৎকারই করে উঠত।

জানালায় এসে দাঁড়াল সে। সব শান্ত। ঐ নীল আকাশে লক্ষ তারা খচিত মহান শূন্যতা। কত সুন্দর, কত মধুর। ক্লান্ত চোখ বুজে আসে আবার। ক্ষণিকের জন্য চমকে ওঠে। যেন সেই চীৎকার এখনও তার কানে ভেসে আসছে। লছমিবাইএর কান্না। অভিশপ্ত লছমিমহলের অতৃপ্ত লছমিবাই যেন এখনো মরেনি। কিসের এক প্রতিহিংসায় সে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।……

লছমিবাই।

লছমিবাই ছিল মহলের শ্রেষ্ঠা বাইজী। প্রত্যেকের মুখে গুঞ্জিত হতো তার সৌন্দর্য ও সংগীতের প্রশংসা। নন্দীমহলের প্রতিটি তন্ত্রিতে লছমিবাইএর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে।

বড়কর্তা প্রদ্যুৎনারায়ণ বৃদ্ধের কোঠায় পা দিলেও তিনি ছিলেন আসর জমাতে অদ্বিতীয়। জলসাঘরের ঝালরের আলো মৃদু বাজনার তালে ঝলমলিয়ে উঠত।

লছমিবাই ছিল তার বহুমূল্য কণ্ঠহার। রাত্রিতে প্রদ্যুৎনারায়ণ আর লছমিবাই বজরায় চেপে নৌবিহার করতে বেরোতেন। মধুর সংগীত খালের জলে আছাড় খেয়ে মল্লা গ্রামবাসীদের কতবার মুগ্ধ করেছে।

নন্দীমহলের প্রতিটি পুরুষ লছমিবাইএর প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠেছিল।

আগ্রা ঘুরে প্রদ্যুৎনারায়নই আবিষ্কার করেছিলেন লছমিবাইকে। যতটুকু খুঁত ছিল তাও মুক্ত হয়েছিল তার সুনিপুণ তত্ত্বাবধানে। সেজন্য তাঁকে কম খেসারৎ দিতে হয়নি। যা কেউ চাইতে বা বলতে সাহস পায়নি লছমিবাই কিন্তু সে স্বাধীনতাটুকু পেয়েছিল। নৃত্যে ও সংগীতে হয়ে উঠেছিল পাকা নটী। তার নাম হলুদপুরমল্লা থেকে বাংলার ছোট বড় রাজরাজড়াদের কাছ পর্যন্ত পৌছেছে। সকলে এসেছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বহু অর্থের বদলে কিনে নিতে চেয়েছে বহুমূল্য নারীরত্নটিকে। লছমিবাই ছিল সোমলতা, মাদকতায় সিক্তিতা।

ক্রমে সে ঘরে বাইরে একছত্রী সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠল। সেইজন্য মহলের পুরনারীদের মাঝে এক অসন্তোষের ঢেউও ফুলে ফুলে উঠেছিল।

একদিন সকলকে বিস্মিত করে লছমিবাই বৌরাণীদের সংগে মন্দিরে যেতে শুরু করল। হিন্দু না মুসলমান তা কেউ জানে না। নটী—অভিনয়ে ওস্তাদ। ধর্মতো মাটির ঢেলা, তাই বলে বৌরাণীরা আর বাইজীরা বসবে এক আসনে! এ অসম্ভব—এ অন্যায়। কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে? প্রতিবাদের অর্থ

প্রদ্যুৎনারায়ণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। তাই বৌরাণীদের হিংসা আর অসন্তোষ চিরদিন তাদেরই কাছে রয়ে গেল অক্ষমতার আড়ালে।

জলসাঘরের অন্যান্য বাইজীরা সুর্মা টেনে ঝুড়ির মধ্যে আটক থাকা সাপের মত শুধু ফোঁস ফোঁস করেই মরল।

সেদিন সন্ধ্যা হয়নি। করণকুমার সোজা কল্লীমহলে এসে দাঁড়াল। ঝালরের আলো জ্বলে উঠছে একে একে। বড় ঘর ছাড়িয়ে একবারে বাইজীর খাসকামরায় এসে দাঁড়াল। লেহারাবাই সবে লম্বা বিনুনিতে আতর মাখিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। করণকুমারকে দেখে আশ্চর্য হলো। লাল পোশাক। গলায় মুক্তোর মালা। পায়ে সাদা নাগরা। মুখে এক অপূর্ব হাসি। লেহারাবাই এক বিস্ময়ের শব্দ করে তসলিম জানিয়ে বলল—কি ভাগ্যি! রোসনাই বানাতে বলব নাকি?

করণকুমার এগিয়ে এসে আরাম কেদারায় বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পর বলল—কোথায়? মনে, না ঐ চোখে?

লেহারাবাই হেসে উঠল—আমি ভাবতেই পারিনি এ সময়ে আসবে।

—আমিও কি ভাবতে পেরেছিলাম?

—শরবত আনি গে। বলে লেহারাবাই উঠে দাঁড়ায়।

—লছমিবাইকে দেখতে যাব বলেই এত তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলাম। কিন্তু হলো না।

তম্বি দেহ হরিণীর মত চলতে গিয়ে মাঝ পথে থমকে দাঁড়াল। সুন্দর চোখে যেন এক মুঠো ধুলো পড়ে। ঠোঁট কামড়ে বলল—হঠাৎ!

—বহু দিনের শখ। সুযোগ এল তাই। ভয় নেই, লুকিয়ে দেখেই চলে আসব।

লেহারাবাই ফিরে এল। করণকুমারের একবারে সামনে এসে দাঁড়াল। রক্তবর্ণের খাগড়া জ্বলে ওঠে।

করণকুমার হেসে ফেলে বলল—লছমিবাই! লছমিবাই! সকলের মুখেই শুনি কিন্তু কৌতূহল এখনো মিটল না।

লেহারাবাইএর চোখের কালো তারা নেচে ওঠে এক কৌতুকে—তা কৌতূহলটা আমাকে পেয়েও মিটল না?

—জানি বাইজী, তবু মানুষের নতুনের প্রতি এমনি চিরন্তন কৌতূহল।

—কিসের কৌতূহল বাবুজি? করণকুমারের পাশে গিয়ে সুন্দর হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—না, যেতে দেব না।

করণকুমার লেহারাবাইএর চোখের দিকে তাকাল। সুন্দর চোখদু'টি কেমন যেন ফোলা ফোলা। লালচে গালের পাশে চিবুকটা বড্ড ধারালো। হাসির সংগে ঠোঁট দু'টি কেমন ধারা কঠিন হয়ে ওঠে।

লেহারাবাই হঠাৎ থুত্‌নি দিয়ে করণকুমারের মাথাটা চেপে ধরে বলে উঠল —কথা দাও, যাবে না।

—আঃ, ওঠো। কৈ তোমার শরবত তো এল না?

লেহারাবাই এবার তীব্রগতিতে দরজার দিকে ছুটে যায়। ইরানী রক্ত গায়ে, তাই সাফ জবাবে লজ্জা নেই, চাওয়াতেও কোন দ্বিধা নেই। বছর চার পাঁচ হল এসেছে। করণকুমার লেহারাবাইকে ভালবাসে। কিন্তু মাঝে মাঝে উগ্র মূর্তিতে তার ভয় হয় আর সন্দিগ্ধ মনে খেলে তার এক ছলনার রূপ যার সন্ধান সে ছাড়া কেউ পায়নি।

ততক্ষণে লেহারাবাই শরবত হাতে করণকুমারের কাছে এসে উপস্থিত। বলল—আজ আর গান নয়, নাচ নয় শুধু—।

করণকুমার শরবতটা নিঃশেষে পান করে বলে—শুধু কী?

শুধু পেয়ার, শুধু—। বলে খিল খিল করে হেসে ওঠে। ঠিক সেই সময়ে তার পরিচারিকা দুলেরা এসে দাঁড়াল। মুহূর্তে হাসি মিলিয়ে যায়। সুন্দর চোখে আগুন খেলে। —কাজে তোর মন নেই? বলে সশব্দে গালে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিয়ে সক্রোধে চীৎকার করে উঠলো—দূর হ'।

দুলেরা ধীরে চলে যায়।

করণকুমার আশ্চর্য হলো না। এ রূপ সে অনেকবার দেখেছে। লেহারাবাই দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। এক আক্রোষে তার বুক ওঠা নামা করতে থাকে।

করণকুমার চোখ বোজে। ঘরে আব্‌ছা অন্ধকার। ঝালরের বাতি জ্বালানো হয়নি। হঠাৎ এক স্পর্শে চোখ খোলে। লেহারাবাই তাকে জড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে। চোখের আগুন নিভে গেছে। সুর্মা মাখা আঁখিপল্লবে জড়িয়ে এক স্নিগ্ধতা, এক কৌতুক হাসি।

—বাবুজি! আজ তোমাকে কি সুন্দর লাগছে। বলে নিজের গলা থেকে এক লহরী মুক্তোর মালা খুলে করণকুমারের গলায় পরিয়ে দিল।

—একি!

-সাদা মুক্তোর পাশে তোমার কালো পাথরের মালা বেশ মানাবে।

—তোমাকে কি দিই বলতো?

—কিচ্ছু না, শুধু একটু পেয়ার।

করণকুমার বুকের কাছে টেনে আনলে লেহারাবাই নিজের দেহটাকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। একটু পেয়ারের জন্য এত কাঙাল এই লেহারাবাই!

আতরের গন্ধে করণকুমারের কামনার সূত্রগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

—লেহারা!

—না বাবুজি। আজ শুধু এমনিভাবে।

এক দমকা বাতাসে ঝালরের কাট্‌গ্লাসগুলি নানা ধ্বনিতে বেজে ওঠে।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য লেহারাবাই উঠে দাঁড়ায়। জোরে ডাকে—দুলেরা!

দুলেরা এসে দাঁড়াল। চোখদুটো তার লাল। কাঁদছিল বোধ হয়। চোখের ইশারা বুঝতে পেরে অতি সযত্নে সুরা আর পাত্র সাজিয়ে দেয়। ঘরের কোণে ছোট্ট ঝালরের বাতিতে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে দরজার পর্দা টেনে চলে গেল।

গোল বোতলে লাল সুরা। যেমন গাঢ় তেমনি ভয়ংকর এর প্রকাশ। লেহারাবাই পাত্রে সুরা ঢালে। বুকের ওড়না খসে পড়ে। করণকুমারের হাতে তুলে দেয় সুরার পাত্র।

—এতটুকু লেহারা? একটা হালকা হাসি করণকুমারের গোঁফের আগায় সর্পিল ভঙ্গিমায় খেলে যায়।

লেহারাবাই নিজের পাত্র শূন্য করে আপনার চেহারাটাকে দেখিয়ে হেসে বলে ওঠে—এই সুরা পাত্রে ভরে দিই কী করে?

পাত্র শূন্য হয়ে যায়। লেহারাবাই পাত্রের পর পাত্র সুরা ঢেলে দেয়।

করণকুমার শেষে সুরার পাত্র ছেড়ে দেয়। লেহারাবাইও পায়ের নাগরা জুতো খুলে ফেলে ওড়না শূন্যে উড়িয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে টলে টলে নেচে ওঠে। ঘুঙুরের আওয়াজ নেই। কোন সংগীত নেই। বাজনা নেই। লেহারাবাই-এর এক নীরব নৃত্যভঙ্গিমা। করণকুমার আশ্চর্য হয়ে দেখে। রক্ত গোলাপের এক টুকরো পাপড়ি বাতাসে সারা ঘরময় লুটোপুটি খাচ্ছে। করণকুমার অসংলগ্ন করতালে নৃত্যের তাল দিতে থাকে।

অবশেষে লেহারাবাই করণকুমারের কোলে লুটিয়ে পড়ে বলে উঠল—কথা দাও, লছমিমহলে যাবে না—কথা দাও। জড়িত স্বরে বারবার বলে।

করণকুমারের নেশা হঠাৎ যেন কেটে যায়। দূর থেকে ভেসে এল বাঁশীর শব্দ। বাগানে কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে। লেহারাবাই কার্পেটের উপর শুয়ে

শরীরের কাপড় অবিন্যস্ত। সুর্মা মুছে গালে লিপ্ত হয়েছে। কাঁচুলি বুকের পাশ থেকে সরে গেছে। ঘাগরা উঠেছে হাঁটু পর্যন্ত। হাঁ করে মরার মত পড়ে। একটা বিশ্রী ঘৃণায় করণকুমারের সারা দেহ ঘিন ঘিন করে উঠল।

করণকুমার উঠে দাঁড়ায়। লেহারাবাইএর পা'টা অতি সন্তর্পণে সরিয়ে চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। লেহারাবাই উঠে বসে। বাঁ হাত দিয়ে করণকুমারের পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে আবার কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়ল।

করণকুমার দ্রুত গতিতে বাইজীমহল ছেড়ে একরকম টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ক্রমে লেহারাবাইএর নেশা কেটে যায়। উঠে দাঁড়াল। নিজের পোশাক ঠিক করে ওড়না তুলে হঠাৎ বাঁশীর শব্দে থমকে যায়। দৌড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। লম্বা বারান্দা। দেখল, করণকুমার অন্দরমহলে না গিয়ে প্রাকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। আপন মনে বলে উঠল—ওঃ, ঐ প্রাকারের উপর থেকে লছমিবাইকে দেখবে। জঘন্য। আমি তাহ'লে কেউ নই? নিস্ফল আক্রোশে গর্জে উঠল। মাথাটা একবার ঝিম ঝিম করে ওঠে।

বাঁশীর মিষ্টি সুর তাকে আকর্ষণ করছে। ছুটে গেল জানালার ধারে। আকাশ নির্বাক। লেহারাবাই কেন যেন ক্ষণিকের সুপ্ত চেতনায় তাকিয়ে দেখল রাত্রির নিস্তব্ধতা।

নীচে বাগান। চোখ পড়ে। ঠিক সেই পারিজাত গাছের তলায় নয়ন বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। বাগানের বাতির আলো পারিজাত গাছের তলায় এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

নয়ন। কালো, দোহারা কিন্তু আত্মবিহ্বল। কী সুন্দর ভঙ্গিমায় বাঁশী বাজাচ্ছে। প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে এইভাবে লেহারাবাইকে দেখে।

নয়ন একজন প্রহরী মাত্র। জন্মবৃত্তান্ত রহস্যজনক। কেউ কেউ বলে বাইজীর গর্ভে জন্ম। কিন্তু চেহারায় কোন জৌলুস নেই, তাই সন্দেহ হয় তাতেও। তার কালো বড় চোখ দু'টি কি অদ্ভুত। পুরুষমানুষের অতো সুন্দর চোখ হয় না।

বাঁশী হঠাৎ থেমে গেল। নয়ন চোখ তুলে দেখে এক অভিমানে মাথা নোয়াল। কতক্ষণ সে আকুল সুরে তাকে ডাকছে। লেহারাবাই চোখের কটাক্ষ মেরে ঠোঁটের ফাঁকে জোর করে হাসি টেনে আনে। অতদূর থেকে ঐ হাসি নয়ন দেখতে পেল না।

চোখ বুজল লেহারা। একি প্রেম! নয়ন তাকে ভালবাসে। কিন্তু সে কি তাকে ভালবাসে? বাইজীর আবার ভালবাসা। তুফানের আবার সহানুভূতি। সাপের আবার আদর। তবু নয়নকে তার চাই। এত অহংকার করণকুমারের! লছমিবাইএর জন্য সে পাগল। কিন্তু তার নামও লেহারাবাই। আর সে ভুল করবে না। তার শরীরে ইরানীর রক্ত। প্রতিশোধ নিতে সেও জানে।

চোখ খুলে আবার। নয়ন উঠে দাঁড়িয়েছে। চলে যেতে উদ্যত। লেহারাবাই ইশারা করল। সে যাবে তার কাছে। হাসল লেহারাবাই। মন্দ কি? তার সুন্দর লাল কপালে ঐটুকু কালো টিপ্ যদি পরে তাতেই বা ক্ষতি কি?

লেহারাবাই তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে ফেলে। মুখে ফেলে একরাশ এলাচ। তারপর নিঃশব্দে নেমে যায় বাগানে।

ভিজে মাটি। শিশিরে ভিজে গেছে। হাস্নুহানার গন্ধে সুরার নেশা আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। থমকে দাঁড়ায়। নয়ন বাঁশী ছুঁড়ে দেয়। লেহারাবাইএর কাছে এসে পড়ে।

—নয়ন!

—কেন দেরী করলে?

—বা-রে। ছোটকর্তাকে বিদেয় করে আসতে হবে না? এখানে নয়, ঐ বেদীটার পাশে চল।

দু'জনে এগিয়ে যায়।

কালো পাথরের ফোয়ারা। পাথরের অনিন্দ্যসুন্দর একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে। তার মাথার ওপর একটি কলসী থেকে উৎসারিত হচ্ছে সূক্ষ্ম জলধারা।

অবশেষে দু'জনে ঝাঁকড়া পাতাবাহারের গাছের আড়ালে এসে বসে।

নয়ন সভয়ে বলল—তুমি যে এলে, কেউ যদি জানতে পারে? লেহারাবাই হাই তুলে নেশা জড়ানো চোখে বলল—নয়ন! তুমি আমাকে ভালবাস না?

নয়ন বাঁশীটা তুলে লেহারাবাইএর হাতে দিয়ে বলল—এই বাঁশীকে আমি সবচেয়ে ভালবাসি। তুমি ভেঙ্গে ফেল। সইতে পারব।

লেহারাবাই নয়নের হাত দু'টি কোলের উপর টেনে নিয়ে হেসে বলল—আমাদের যে ভালবাসতে নেই নয়ন।

জলেই মিষ্টি দিলে হয় শরবত। লেহারা যে প্রেমিকা হবে না তাই বা কে বলতে পারে!

—আচ্ছা, আমাকে নিয়ে কি করবে নয়ন?

—জানি না। বাঁশীতে যে সুর টানি তা মনে হিন্দোল টেনে বাতাসে মিলিয়ে যায়। তবু সে বাঁশী।

—বাঁশীতে যদি বেসুরো আওয়াজ বেরোয়?

নয়ন হাসল—ভেঁপুর কোন সুর নেই, তবু তার ধ্বনি কার না মন ভোলায়?

—সে যে বাচ্চা ছেলেদের।

নয়ন বলল—এতো জানলে কি করে?

মরুভূমির মত বহু রুক্ষতাই আমার ছিল। আজ অনেক কমে গেছে এই মিষ্টি হাওয়ায়। বাংলাদেশে যে কতদিন কেটে গেল। লোকের মুখে শুনে জেনেছি তোমাদের ভেঁপুর কথা।

—হৃদয় স্পষ্ট না হ'লে যে প্রেম হয় না। তোমার আমার ভালবাসার মাঝে কেউ নেই লেহারা।

—কে বললে নয়ন? সবাই তো আছে। কত বাধা, কত কত কড়া শাসন।

নয়ন এবার হাসল। উল্টো প্রশ্ন করে—তুমি আমাকে ভালবাস না?

লেহারাবাই মুখ ঘুরিয়ে কী যেন ভাবছিল। চমকে উঠল। কঠিন ঠোঁটের মধ্য থেকে কী একটা নির্লজ্য কথা বেরিয়ে আসছিল কিন্তু সামলে নিয়ে বলল—তোমার কি মনে হয় নয়ন?

উত্তরে নয়ন শুধু বলল—বেশীক্ষণ থেকো না। কেউ দেখে ফেললে মুস্কিল। তোমাকে তখন কত জ্বালাতন করবে। অত্যাচার করবে।

লেহারা এবার হেসে উঠে নয়নের বুকে দেহ এলিয়ে দিয়ে বলল—আমাকে কেউ যদি মেরে ফেলতে চায়?

নয়ন সোজা হয়ে বলল—আমি বেঁচে থাকতে নয়।

—যদি কেউ আমার অসম্মান করে?

—তার সম্মান আমি বিন্দুমাত্র অক্ষুন্ন রাখব না।

যদি প্রতিহিংসায় প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে যাই, সাহায্য করবে?

নয়ন বলল—আমি প্রহরী—পুরুষ। তুমি যা করতে পারবে আমি তা করতে পারব না?

লেহারা চোখ বোজে। প্রতিহিংসা নেওয়ার একধাপ সে যেন এগিয়ে গেল

নয়ন আবার বলল—শুধু বাঁশীই শুনেছ, কিন্তু আমার মনের কথা কি কখনো ভেবেছ?

লেহারাবাই নয়নের একটা হাত মুখে তুলে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

হলুদরঙের ঘাগরার উপর কালো একটা কামিজ পরেছে। কামিজের গলায় দু'পাশে সোনালী কাজ। দীর্ঘ কি অপূর্ব সুঠাম দেহ। নয়ন মুখ ফেরাতে পারে না। মনে ঝড় বয়ে যায়। এই লেহারাবাই তার—সম্পূর্ণ তার।

নয়ন ওঠার আগেই দৌড়ে লেহারাবাই দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। মহলের দোরে এসে থমকে দাঁড়াল। দুলেরা দাঁড়িয়ে।

—তুই এখানে!

—ভয়ে, কেউ দেখে ফেললে কি হবে জান?

—কী হবে?

—ভিতরে এসো। শেষে কিনা একটা প্রহরীর সংগে—

—কে বললে তোকে?

—আমি যে তোমার ছায়া লেহারাবাই। যতই মার যতই অন্যায় কর, তবু তোমার কাছেই থাকবার হুকুম হয়েছে। তাই দেখতে হবে না সব?

লেহারাবাই খিল খিল করে হেসে উঠল।

দুলেরার গালে একটা টোকা মেরে বলল—অভিনয়, শুধু অভিনয়। জঞ্জাল কখন কোন্ সময়ে কাজে লাগে তা কি কেউ বলতে পারে? যা তুই।

বেণীটা শূন্যে এক ঝটকা মেরে ঠিকরে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল লেহারা। দুলেরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। নয়নকে সে চেনে। প্রহরী হলেও সে অনেক—অনেকের চেয়ে উঁচু মানুষ। অন্দরমহলের শিমূলা দাসীর কাছে মানুষ হয়েছে। তাকে মা বলেই সে জানে।

লেহারাবাইকেও তার চিনতে বাকি নেই। এই সর্বনাশীর মাথায় আবার কী বুদ্ধি চেপেছে তা কে জানে! দুলেরাও ফিরে গেল মহলে।

এদিকে করণকুমার লেহারাবাইএর কুৎসীত কামুকতার হাত থেকে ছুটে চলে এসেছে প্রাকারে। বসে পড়ল প্রাকারের উঁচু কার্নিশের উপর। নীচেই লছমিমহল। দূরে মল্লাখাল। শূন্যে নীল আকাশ। কতদিন এখানে বসে লছমিবাইএর গান শুনেছে। এ তার একটা অভ্যাসে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার দর্শন মেলেনি। দেখারও কোন উপায় নেই। লছমিমহলের বাইরের আসরে প্রদ্যুৎনারায়ণ তোষামোদেদের নিয়ে গিয়ে বসে হৈ হুল্লোড় করে, কিন্তু খাস লছমিমহলে একমাত্র প্রদ্যুৎনারায়ণ ব্যতীত আর কারোর পদক্ষেপ ঘটে না।

কয়দিন যাবৎ প্রদ্যুৎনারায়ণের শরীরটা ভাল চলছিল না। তবু সেদিন ফিনফিনে ধুতির উপর লাখনউ-এর মেরজাই চড়িয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন। শুভ্র কেশে মাখলেন সুগন্ধী তেল। সযত্নে মাথাটা আঁচড়ে নিয়ে কাঁধে ফেললেন মুর্শিদাবাদের মুগোর চাদর। পায়ে দিলেন হরিণের চামড়ার জুতো। তারপর ডাকলেন—জগুয়া!

জগুয়া আলবোলার নল প্রদ্যুৎনারায়ণের হাতে তুলে দিয়ে মেরজাইএর ফিতে বেঁধে দিল।

আলবোলায় শব্দ তুলে মিষ্টি ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—লছমিমহলে খবর পাঠিয়েছিস্?

জগুয়া মাথা নেড়ে জানাল—অনেকক্ষণ সংবাদ পৌছে গেছে। তা আজ এই শরীর নিয়ে না গেলে ভাল করতেন বাবু।

প্রদ্যুৎনারায়ণ হাসলেন। নলটা জগুয়ার হাতে তুলে দিয়ে মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেলেন।

অন্দরমহল পিছনে ফেলে জলসাঘর ছাড়িয়ে লছমিমহলের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। বিরাট সেলাম দিয়ে কানোল খাঁ পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘ বারান্দা। শূন্যে নানা রঙের ঝালরের বাতির সারি। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে লছমিবাইএর সংগিনী রুক্মিণীবাই। বড্ড অল্প বয়স। প্রদ্যুৎনারায়ণ হেসে বললেন—কি রুক্মিণী, হলুদপুরমল্লার আতর কেমন লাগছে?

—খুব ভাল। ওড়না দিয়ে মুখ চেপে হাসি চাপতে চেষ্টা করে।

—হাসছ বলে মনে হচ্ছে?

—এখানকার আতর বড্ড পুরানো, তাই নতুন আতরে মিশ খাচ্ছে না।

—মিশবে, মিশবে রুক্মিণীবাই, সবে তো এলে, দেশের জন্য মন কেমন করে না?

—রুক্মিণীবাই লম্বা বিনুনি দুলিয়ে বলল—হ্যাঁ, কিন্তু ভেজা মাটির আমেজে সব ভুলতে বসেছি।

—রং লেগেছে তাহলে?

—না, সুর্মা এখনো লাগাইনি।

প্রদ্যুৎনারায়ণ তার মাথাটা ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—শুধু সুর্মায় এখানকার পুরুষরা ভোলে না, রঙে ফলে দেহটাকে সাজিয়ে নাও।

রুক্মিণীবাই উত্তর না দিয়ে ওড়না উড়িয়ে পাশের ঘরে ছুটে চলে গেল।

বারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে একসার সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়ে মাটি ছুঁয়েছে। আচমকা কোলে এসে পড়লো একটা সাদা পায়রা।

দূর থেকে খিল খিল করে কে যেন হেসে উঠল।

অতো মিষ্টি হাসি লছমিবাই ছাড়া আর কে হাসবে! দূরে সুরভিকুঞ্জে লছমিবাই দাঁড়িয়ে। বাগানে থামের মাথায় আলো। তার ছটায় লছমিবাই এক নতুনরূপে ধরা দিল।

রঙীন সোনালী রূপালী চুনরী শাড়িতে ছলমল করছে। শাড়ির নিচের সুঠাম চরণের কী লীলায়িত ভঙ্গিমা। লাল মরক্কো চামড়ার নাগরাজুতো সুন্দর দেহটাকে মাটি থেকে তুলে রেখেছে। ঘন কৃষ্ণ চুলের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সারা পিঠ ছেয়ে। কেবল সোনার আঁকশি দিয়ে ঐ একরাশ চুলকে আটকে রেখেছে। কানে দু'টি হীরের পাথর আলোর দ্যুতিতে ঝকমক করছে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ এগিয়ে গেল। আভ্যর্থনা জানালো লছমিবাই।

সুরভিকুঞ্জ। গোল লাল পাথরের বেদী, তাকে ঘিরে চারটে মিনাকরা লম্বা শ্বেত পাথরের থাম। নানা ধরনের লতা থামগুলির দেহ বেয়ে উপরে উঠে গেছে। বেদীতে পাতা বহুমূল্য গালিচা। তার উপর মখমলের তাকিয়া।

দূরে লছমিমহলের জাফরির আড়াল থেকে রুক্মিণীবাই তার কৌতূহলভরা চোখ রেখে দেখছিল নতুন ও পুরানো আতরের মেশামেশি। লছমিবাই হাত দিয়ে ইশারা করতে সরে গেল।

প্রদ্যুৎনারায়ণ তাকিয়া টেনে বসে পড়ে বললেন—কাকে ইশারা করলে?

—ঐ রুক্মিণীকে।

—থাক, বেচারী। নতুন যৌবনের এমনিই কৌতূহল থাকে।

লছমিবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন—একি, বসবে না?

—শরবত আনিগে।

—না, বোস।

—তামাক বলব?

—তা বলতে পার। লছমিবাই দূর থেকে ইশারা করে একেবারে প্রদ্যুৎ-নারায়ণের পায়ের কাছে গিয়ে বসল।

প্রদ্যুৎনারায়ণ লছমিবাইএর একখানা হাত কোলে তুলে নিয়ে বললেন—এতদূরে বসে কেন? দেখ লছমিবাই, তোমার রঙিন দেহটাকে দেখে মনে হয় কি জান? তুমি আমার স্মরপ্রিয়া।

আলবোলা নিয়ে রুক্মিণীবাই এল। পান আর আলবোলা রেখেই সে ছুটে পালালো।

—লজ্জা কাটেনি এখনও। মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকেন প্রদ্যুৎনারায়ণ।

—এ লজ্জা মেয়েদের কোনদিনই কাটে না।

মিঠে ধোঁয়া ছেড়ে লছমিবাইকে কাছে টেনে নিয়ে এসে বললেন প্রদ্যুৎ-নারায়ণ—হ্যাঁগো, এতরূপ তুমি কোথায় পেলে ?

লছমিবাই মৃদু হাসল। আপনার দয়ায় আমার রূপ।

আকাশের দিকে দু'জনে তাকায়। শরতের মেঘ। একফালি চাঁদের পাশে কাশফুলের মত সাদা সাদা মেঘের টুকরো এসে জুটেছে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ লছমিবাইএর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন—আমার শরীরটা ভাল নেই।

—তা এলেন কেন ?

—দু'দিন বাদে বড় একটা জলসা বসাচ্ছি। বাইরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসবেন।

—শুনেছি।

—আমার নাম রেখো।

লছমিমহল থেকে বীণার শব্দ ভেসে এল।

—কে বাজাচ্ছে ? প্রদ্যুৎনারায়ণ জিজ্ঞাসা করেন।

লছমিবাই প্রদ্যুৎনারায়ণের পায়ে হাত রাখল। বলল—রুক্মিণী ওস্তাদের কাছে শিখছে।

—ভারি সুন্দর দেখতে। কোথা থেকে আমদানী করলে ?

—আমি ডাকিনি। আপনিই এসেছে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ এবার উঠে বসলেন। লছমিবাইএর দিকে তাকিয়ে এক শিহরণ অনুভব করেন।

বৃদ্ধ। চোখদুটি ভারি। জল এসে জমেছে চোকের কোণে। বয়সের জল। গালের চামড়া কুঁচকে গেছে। পিঠের দিকটা কেমন যেন আলগা। চলতে গিয়ে তাই বারবার ঝুঁকে পড়েন। চাঁদের দিকে তাকিয়ে লছমিবাই বলল—সুরা আনতে বলব ?

প্রদ্যুৎনারায়ণ পাশ ফিরে লছমিবাইএর একেবারে কোল ঘেঁসে বললেন—তোমার কি মনটা ভাল নেই ?

—ছিঃ ছিঃ! তসলিম জানালো লছমিবাই। বলল—আপনি এসেছেন, মন খারাপ থাকতে পারে?

—তবে এত নীরব কেন?

লছমিবাই হেসে উঠে প্রদ্যুৎনারায়ণের কপালে চুমু খেয়ে আরও একটু নিবিড় হয়ে বসল। মিষ্টি সুরে বললো—গান গাইব?

—কোন বাজনাদার ডাকতে হবে না। সেই গান্ধারীটা গাও। বলে লছমিবাইএর এক গোছা চুল নাকের কাছে তুলে বললো—তোমার চুলের গন্ধ আতরের চেয়েও মিষ্টি।

লছমিবাই চোখ বোজে। অতৃপ্ত আত্মা একবার আর্তনাদ করে উঠল। দূর—বহুদূরের পাহাড়ী খাদে আটকা পড়া বদ্ধ জলরাশি কেন যেন মুক্তির জন্য হাহাকার করে উঠল। তবু জোর করে হাসি টেনে বলল—আমার তো সবই ভাল।

—সত্যি লছমি। তুমি যে আমার কত আদরের। বলে বুকের কাছে নিবিড় ভাবে টেনে নেন।

লছমিবাই হঠাৎ প্রদ্যুৎনারায়ণের হাত সরিয়ে দেয়—উঁহুঁ।

প্রদ্যুৎনারায়ণের চোখে সুরায় মত্ত হাজার হাতী যেন ছুটে আসছে। বলল—হঠাৎ অমৃতে অরুচি?

লছমিবাই আস্তে বলল—রুক্মিণীর বীণা থেমে গেছে।

—তাতে হয়েছে কী?

—বড্ড লুকিয়ে দেখার স্বভাব। বড্ড দুষ্টু, আপনি জানেন না।

—কেন লছমি, রুক্মিণী যদি আমাকে ভালবেসে ফেলে? লছমিবাই অমনি প্রদ্যুৎনারায়ণের মুখ চেপে ধরে বলল—না-না, ও কথা বলবেন না।

কী অদ্ভুত নারীর মন। এই বৃদ্ধের ঐশ্বর্য আছে, প্রতিপত্তি আছে। এ ছাড়া এমন কিছু তার নেই যাতে রুক্মিণী ওকে ভালবাসতে পারে। তবু এই কথায় নারীর মনে কোথায় কোন্ এক দুর্বল স্থানে আঘাত লাগে। লছমিবাইও সেই দুর্বলতা কাটাতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠেছিল।

লছমিবাই তাকাল। এই বৃদ্ধের কী অদ্ভুত আকর্ষণ। চোখ বুজে অনুভব করে। কতদিন কতবার এই বৃদ্ধের দুই বাহুর মধ্যে নতুন নতুন আলিঙ্গনের তীব্রতর আবেগে দেহ কেঁপে উঠেছে। অধর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে নিবিড়তর চুম্বনে। আশ্চর্য! এই প্রদ্যুৎনারায়ণের শ্লথ দেহে লুকিয়ে আছে কামনার এক শক্তিমান পুরুষ। তবু লছমিবাই শান্ত হয়নি। কিসের একটা ব্যর্থতা,

একটা প্রচণ্ড অভাব। প্রদ্যুৎনারায়ণকে সে ভালবাসতে পারেনি। শ্রদ্ধা না থাকুক তবে কৃতজ্ঞতা আছে, ভয়ও পায় ভীষণ।

প্রদ্যুৎনারায়ণের দৃঢ় বাহুবন্ধনে লছমিবাই সত্যি সত্যি এবার নিজেকে ছেড়ে দেয়।

কান পাতলে শোনা যায় জলসামহলের আনন্দ-উচ্ছ্বাস। বাইজীদের অভিসার নৃত্যচপল হয়ে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে মহলে মহলে।

প্রদ্যুৎনারায়ণের ক্ষুধিত নয়নের দিকে তাকাতে পারে না লছমিবাই। তৃষিত অশ্রু তাঁর চোখের কোণ থেকে নেমে আসছে। এ মোটেই সইতে পারে না। হাত সরিয়ে বলল—সুরা নিয়ে আসিগে। উঠে দাঁড়ায়।

ছুটে যায় মহলে। রুক্মিণীবাইকে সুরা নিয়ে যেতে বলে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল।

নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল—আর পারি না। আর কত দিবি, এত দিয়েও তো বৃদ্ধ তলিয়ে যায় না। আশ মেটে না।

প্রদ্যুৎনারায়ণ তাকে ভালবাসে। তাকে নিয়ে তার অহংকারের সীমা নেই। কিন্তু—না-না, এ তার চোখের নেশা। তার ভাল লাগে না ভাঙ্গা নৌকায় দরিয়ায় পাড়ি দিতে।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নীচে নামতে গিয়ে থমকে যায়। বহুদূরে প্রাকারের উপর সেই দীর্ঘকায় মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। লছমিবাই থাম ধরে ফেলে বলে উঠল—কে তুমি জানি না। কিন্তু ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আমাকে ভোলাও কেন?

হঠাৎ হাসির শব্দে খেয়াল হয়। নীচে নেমে যায়। রুক্মিণী প্রদ্যুৎ-নারায়ণের কাছে ধরা পড়েছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রুক্মিণীবাই একটা ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাল।

প্রদ্যুৎনারায়ণ হো হো করে হেসে উঠে বললেন—জান লছমি, ও বলে কচি গাছে বুড়ো ডাল বাঁধলে নাকি কচি গাছ মরে যায়। কিন্তু ও জানে না ঐ গাছে একটু রঙীন সুরা ঢেলে দিলে দু'জনেই বাঁচে।

লছমিবাই হেসে সুরাপাত্র তুলে ধরল।

—তুমি খাবে না? বলেন প্রদ্যুৎনারায়ণ।

তসলিম জানিয়ে বলল লছমি—আপনি খান, শেষে আমি খাব।

—এখানেই আমাদের অভিসার হবে? এযে খোলা জায়গা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল একখণ্ড মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিয়েছে। প্রাকারও অন্ধকারে ডুবে গেছে। লছমিবাই বলল—কেউ দেখবে না।

প্রদ্যুৎনারায়ণ শূন্য সুরার পাত্র ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন—জান লছমি, তোমার তরঙ্গায়িত যৌবনে আমার নৌকা না ডুবছে না স্রোতের টানে ছুটে চলছে। শুধু নাচন—শুধু শূন্য আর জলের হাত ধরে দুলোদুলি।

লছমিবাই গান ধরল। গান্ধারী। গানের শেষটুকু সুর হারিয়ে থেমে গেল। প্রদ্যুৎনারায়ণ নিঃসাড় হ'য়ে পড়ে। প্রাকারের দিকে তাকাল। অন্ধকার। রুক্মিণীবাই নাচছে। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা যায়। পেবলি নৃত্য —তাণ্ডব নৃত্যের অপভ্রংশ। দেহখানি শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে কী অদ্ভুত নৃত্যচপলতা। এ নাচ নাচতে সে ভালবাসে। বাজনার তালে তালে সে কী উন্মত্ততা।

আবার তাকালো প্রদ্যুৎনারায়ণের দিকে। যতই ঘৃণা তার থাকুক না কেন, তার সম্মান এই বৃদ্ধটি দিয়েছে। তার আবদারও কম রাখেনি। তারই কথামত এই মহলটি তৈরী হয়েছে। লছমিবাই থামের গায়ে শরীর এলিয়ে দেয়। আপনি চোখ বুজে আসে। সুরার ঝাঁঝালো গন্ধে মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল।

সারা হলুদপুরমল্লায় লছমিবাইকে নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। প্রদ্যুৎ-নারায়ণের কড়া শাসনে নন্দীপুরুষরা লছমিমহলে ঘেঁসতে সাহস পায়নি। অন্দরমহলে বৌরাণীদের এতে ক্রোধের সীমা ছিল না। লছমিবাইএর ব্যঙ্গ হাসি অন্দরমহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। অবশেষে বৌরাণীরা হাল না ছেড়ে প্রতিযোগিতায় নেমে সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে উঠল। বহুমূল্য পাথর খচিত নানা রঙের ঘাগরা পরল। পায়ে দিল জরি বসান নাগরা জুতো। মখমলের কাঁচুলি বক্ষের শোভাবর্ধন করল। সেতার বীণা ঝংকার দিয়ে উঠল। দু'চারটে ঠুংরি, দরবারি গান গিয়ে আশ্রয় নিল বৌরাণীদের কণ্ঠে। একদিন অন্দরমহলের আইন ভঙ্গ করে নূপুরের পরিবর্তে ঘুঙুর বাজিয়ে নেচে উঠল। বাইজীদের মত ওড়নায় মুখ আড়াল করে ভ্রূপল্লব বাঁকিয়ে ঠোঁটের কোণে পাতলা হাসি হেসে নন্দীপুরুষদের সংগে প্রেমের অভিনয় করতে শুরু করল। মনেপ্রাণে বাইজী না হলেও আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায় বাইজী হয়ে উঠল বৌরাণীরা।

কিন্তু লছমিবাই জাতবাইজী। তার সৃষ্টি নিজস্ব। তার কল্পনায় সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। তাই বৌরাণীরা বার বার হার মানল লছমিবাইএর সর্বনাশা চটুল চাহনিতে।

কাজের ফাঁকে শীমুলা নিজের ঘরে এসে নয়নকে প্রায়ই দেখে যায়। বড় নিরীহ আপনভোলা মানুষ। তরোয়াল ওর ধাতে সয় না। তবু উপায়ন্তর না দেখে এ কাজ তাকে বেছে নিতে হয়েছিল। প্রহরীদের অনেক কাজ। সময় সময় লাঠি ধরে ছোট খাটো জমিদারের লাঠিয়ালদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। শীমুলা পুরনো দাসী। বড়কর্তা প্রত্যুৎনারায়ণ এই দাসীটিকে তার শান্ত স্বভাবের জন্য অন্য দৃষ্টিতে দেখেন। তাই নয়নকে কোনদিন লাঠি ধরতে হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না।

নয়নের জন্মবৃত্তান্ত তার অজানা নয়। তাকে বাইজীমহলেই ছোট্ট এক পুঁটুলিতে আবিষ্কার করেছিল, সে আজ অনেকদিনের কথা। সদ্যোজাত শিশুটিকে মাটিতে চাপা দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। শীমুলা সেদিন শিশুটিকে বুকে করে ফিরে এসেছিল নিজের ঘরে। নয়ন পচা রক্তে জন্মালেও মনটা নোংরা হলো না। শীমুলা আর বাঁশী এ দু'টি ছাড়া সে আর কিছু জানত না। আজ দুলেরার কাছে এ কী শুনলো!

দুলেরা এইমাত্র তাকে সব বলে গেল। আজ শীমুলা ঘরে চুপ করে বসে আকাশ-পাতাল ভেবেও কূলকিনারা পাচ্ছিল না। দুলেরা ওকে শপথ করিয়ে নিয়েছে যাতে আর কেউ জানতে না পারে। একটা বিশাল ভীতি তার বুক চেপে ধরল। লেহারাবাই শেষ পর্যন্ত নয়নকে হাতের পুতুল করছে! এতে ওর লাভ কি? প্রথম থেকেই নয়নকে সাবধান করতে হবে। সন্ধ্যা হতে আর বাকি নেই, শীমুলা বেরিয়ে যায়।

নয়ন বাইরে কাজে ব্যস্ত ছিল। নায়েব সুবন্ধনী পালিতের ব্যস্ততার অন্ত নেই। আজকে বিরাট জলসা বসবে। তিনজন বিখ্যাত জমিদার এসেছেন লছমিবাইকে দেখতে। রূপে ও কণ্ঠে পরিতৃপ্ত হবার জন্যই তাদের এই দীর্ঘযাত্রা।

নয়ন পাশের একজন কর্মরত লোককে জিজ্ঞেস করল—জলসাঘরে লেহারাবাইও থাকবেন?

উত্তরে সে শুধু বললে—হতেও পারে।

নয়ন নিশব্দে তার ঘরে এসে দাঁড়াল। লেহারাবাই জলসায় নাচবে, কিন্তু কেন? এক অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। নয়ন ভুলে যায় লেহারাবাই একজন বাইজী মাত্র, সাধারণ নারীর মত সে নয়। গাইতে হয়, নাচতে হয়। নয়ন বাঁশী নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

লেহারাবাই সাজতে বসে, কিন্তু সাজা আর হলো না। ফুলেরা এসে সংবাদ দিল করণকুমার আজ আর আসবে না। এলেও রাত হবে। লছমিবাইকে আজকে সে দেখতে যাবে, যদিও এই সংবাদ অতি গোপনীয়। চিরুনি ফিতে সব ছুঁড়ে ফেলে দিল। সারা ঘরময় হাতের কাছে যা পেল সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অবশেষে আয়নার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখদু'টি ছুরির ফলার মত ঝকমকিয়ে ওঠে। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে—আমার নাম লেহারাবাই। প্রতিশোধ নিতে আমিও জানি।

চীৎকার করে ডাকল—ফুলেরা!

ফুলেরাকে দেখে বলল—দরজা বন্ধ করে রাখবি, ছোটবাবু এলেও খুলবি না।

ফুলেরা বললো—তা হয় না।

—কেন?

—আমরা ওনার কেনা দাসীবাঁদী, আর তুমি—।

—ও বুঝেছি।

—তুমি কি করবে? লছমিবাইএর আগুনে সকলে পুড়ে মরেছে, ছোট বাবুতো সামান্য। শুধু তুমি নও, অন্দরমহলের বৌরাণীরা পর্যন্ত লছমিবাইএর কাছে হার মেনেছে।

লেহারাবাই ফুলেরার পানে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। কে এই লছমিবাই! সকলে বলে রূপের রাণী। কি জাদুকরী বিদ্যা জানে? তার প্রিয়তম করণকুমারও শেষ পর্যন্ত আনমনা হয়ে পড়েছে।

শূন্যে আকাশ জ্যোৎস্নাস্নাত। একটা চাপা কান্না লেহারাবাইএর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে। বার বার সে হেরে যাচ্ছে। কান পাতল। না, কিছু শোনা যায় না। লছমিমহলে আজ বিরাট জলসা। এক রুদ্ধ আক্রোশে লেহারাবাইএর সুন্দর দেহটা কুঁকড়ে যেতে থাকে।.....

আসর বসবে, অসুস্থতার জন্য প্রদ্যুৎনারায়ণ আজ জলসায় যেতে পারবেন না। তবু লছমিবাইকে একটি পত্র লিখলেন। ভাল লিখতে না জানলেও বাংলা লেখা বুঝতে পারে লছমিবাই। পত্রের প্রতি ছত্রে এক সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি মারছে। "অতিথিবৃন্দদের শুধু রূপে আর সুকণ্ঠে ভোলান যেতে পারে, এর বেশী কিছু নয়।"

যথা সময়ে অন্য নন্দীরাজপুরুষদের সংগে আরও তিনজন অতিথি গিয়ে উপস্থিত হলো জলসায়। সমস্ত ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে। লছমিবাইএর সাহায্যকারিণী এগিয়ে এসে তসলিম জানালো। তারপর সুরভিকুঞ্জে গিয়ে সংবাদ দিল।

সবে প্রত্যুৎনারায়ণের পত্রখানা পড়া শেষ করেছে। এক ব্যঙ্গের হাসি তখনও ঠোঁটের ফাঁকে লেগে রয়েছে। রুক্মিণীবাইকে দেখে বলল লছমিবাই—ঝাড়ে চেরাগ জ্বালিয়ে রোশনাই কর। আমি কৈঁকা জলসাঘরে যাব।

রোশনাইএ ঝাড়বাতি শত শিখায় জ্বলে উঠে। পাথরের ধুনুচি তার শত ফুকোর দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সারা কৈঁকামহল সুগন্ধে ভরপুর করে তুলল। দেওয়ালের গায়ে কালো ও লাল রঙের প্রলেপে আঁকা হয়েছে নানা ধরনের লতাপাতা ও হরিণ-হরিণী। ঘরের মেঝে লাল কার্পেটে ঢাকা, তাতে ছড়ানো জরিদার তাকিয়া। নন্দীরাজপুরুষরা নিজেদের মাঝে নমস্কার বিনিময় করে বসে পড়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ; হাতে তুলে নিল কারুকার্য খচিত শূন্য রুপোর পেয়ালা।

সুরাপাত্র নিয়ে রুক্মিণীবাই এসে দাঁড়াল। লাক্ষ্ণৌ থেকে আমদানী হয়েছে। কচি বয়েস। যৌবনের দুষ্টু চাহনি সুর্মামাখা ঝিনুকের মত সাদা চোখের কোলে সবে ফুটে উঠেছে। কালো মখমলের কাঁচুলিতে ঢাকা বুকের সৌন্দর্য। নীল ও রূপালী জরিদার ঘাগরা দেহের গোলাপী রংকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। সকলে বাহ্বা দিয়ে উঠল। এক বাক্যে স্বীকার করল লছমিবাইএর পছন্দকে। অতিথিরা আশ্চর্য হলো। তাদের আগ্রহ ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। চাপাস্বরে বলল—লছমিবাই কোথায় ?

সুরা ঢালতে থাকে রুক্মিণীবাই। দু'একজন নন্দীপুরুষ হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইলো লাক্ষ্ণৌএর সেরা ফুলটিকে। রুক্মিণীবাই হাসির কটাক্ষে সেলাম জানিয়ে আতরমাখা ওড়না নন্দীপুরুষদের নাকের ডগায় উড়িয়ে সরে গেল ধরা না দিয়ে, ছোঁয়া না দিয়ে। সকলে হেসে উঠল। পাক্কা বাইজী হতে রুক্মিণীবাইএর আর বেশীদিন লাগবে না। ঘন ঘন পেয়ালা সুরাশূন্য হয়ে যায়। দেওয়ালের চারপাশে টাঙানো ডাচদেশীয় বড় বড় আয়না তাতে রুক্মিণীবাইএর ছন্দপূর্ণ দেহের সাবলীল ভঙ্গি খেলে যায়। ঝাড়বাতির আলোতে ঘরের কার্পেট আগুনের মত জ্বলতে থাকে। অদূরে দরজায় পাতলা রঙীন মসলিন আর নীল রঙের মখমলের পর্দা ঝুলছে। ঐ পথে সুন্দরী লছমিবাই এসে তসলিম জানাবে সকলকে।

ছোটকুমার করণকুমার নতুন সাজে কৈঁকা জলসাঘরে এসে দাঁড়াল। জলসাঘরের পাশে জাফরিকাটা ছোট্ট একটি অলিন্দ ছিল। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় ঝুলছে পর্দা। একটুখানি সরিয়ে পাশে দাঁড়ালো যাতে কেউ

দেখতে না পায়। অনেকদিন ধরে লছমিবাইএর সৌন্দর্যের কথা শুনে এসেছে। আরও শুনেছে সংগীত আর নৃত্যেও নাকি অদ্ভুত পারদর্শিনী।

প্রদ্যুৎনারায়ণ অসুস্থ। এই সংবাদ পেয়ে করণকুমার এই সুযোগ হারাতে চাইলো না।

সারেঙ্গীর আওয়াজে করণকুমার পর্দা সরিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতরে জমজমাট ব্যবস্থা। নন্দীপুরুষদের সংগে অতিথিবৃন্দরা রঙ্-বেরঙের বহুমূল্য পোশাক পরে আলো করে বসে। করণকুমারও ভিতরে বসতে পারত কিন্তু পিতৃব্যের আসরে এই নির্লজ্য বসাটা দৃষ্টিকটু। তা'ছাড়া তার ইচ্ছে গোপনে লছমিবাইকে দেখে সকলের অলক্ষ্যে কল্পীমহলে ফিরে যাবে। কিন্তু সে জানতে পারল না তার অজ্ঞাতে গোপন আয়নায় পড়েছে তারই প্রতিবিম্ব।

অবশেষে কৌতূহলের সমাপ্তি ঘটিয়ে মখমলের পর্দা তুলে ধরল দু'টি দাসী। ঝুমুর মধুর ধ্বনি তুলে আসরে এসে দাঁড়াল লছমিবাই। মাঝরাতে একটানা ঝঙ্কৃত সেতারের তার হঠাৎ যেন ছিঁড়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আয়নাতে করণকুমারের প্রতিবিম্ব। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে লছমিবাই। চোখ বুঝলো। প্রাকারের দাঁড়িয়ে থাকা মনুষ্যমূর্তির সংগে একবার মিলিয়ে নেয়। হ্যাঁ, এই সে ব্যক্তি। ছোটকুমার —তার কল্পনার পুরুষ। খেয়াল হয় মোহরের শব্দে। অতিথিরা মুগ্ধ হয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে মোহর, হীরার আংটি আর সোনার বাজু।

করণকুমারের কোন কথা স্ফুরিত হয় না। মুগ্ধ হলো তার অপূর্ব সৌন্দর্যে। তার কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এল এক অস্ফুট শব্দ 'লছমিবাই'!

লম্বা বিনুনি। তার তলায় ঝোলান সোনার ঝুমকো। তাতে জড়ানো লাল মসলিনের ফিতে। দীর্ঘ শিবনেত্রের পাশে পাতলা সুর্মা টানা। সাদা মসলিনের ওড়নায় ঢাকা অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি। রেশমের ঘাগরা, রেশমী জমিতে সোনারূপোর কাজ করা। সোনালি কাজের মাঝে আয়নার তারা। হাতের তালুতে আঁকা দু'টি রক্তবর্ণ পদ্ম। শেতপাথরের মত পায়ে বের হয়ে মূল্যবান রঙিন পাথর বসানো রাজপুতী সরু মল। মরক্কো চামড়ার নীলবর্ণের নাগরায় আকাশের রঙ্ ধরা দিয়েছে।

নাগরাই খুলে সুন্দর দেহ একটু বাঁকিয়ে তসলিম জানাতে গিয়ে মুখের ওড়না খসে পড়ল বুকের উপর। লাল মখমলের কাঁচুলিতে উদ্ধত যৌবন যেন বাঁধা থাকতে চাইছে না।

কিছুদূর এগিয়ে এসে ছোট্ট বৃত্তের আকারে কালো কাশ্মিরী কার্পেটের উপর লছমিবাই ধীরে বসে পড়ে। রুক্মিণীবাইকে ডেকে চুপি চুপি কানে কিছু বলে দিয়ে কপালে হাত ছুঁয়ে আবার তসলিম জানালো। অবশেষে লছমিবাই গান ধরল। ঘরোয়ানা নিজস্ব। তার সুমধুর স্বরে কৈকামহল বারবার মূর্ছা গেল। অন্দরমহল থেকে বৃদ্ধ প্রদ্যুৎনারায়ণ মৃদু হেসে জানালো মধুর শুভেচ্ছা।

সংগীত শেষ হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ায় লছমিবাই। শূন্যে ঝাড়বাতির আলো বাতসে কাঁপছে। মোম গলে শেষ হয়ে এসেছে। নাচতে তাকে আর হবে না। এক হাসির টুকরো ঠোঁট ছেড়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সারেঙ্গী বাদককে বলল—ওস্তাদজী, দেখ, আমার ঘরোয়ানা এমনিভাবে বরবাদ হয়ে গেল।

হেসে উঠল দু'জনেই। নন্দীপুরুষরা আর অতিথিত্রয় সুরায় অচ্ছন্ন হয়ে তাকিয়ার উপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে।

লছমিবাই বাদকদের যেতে বলে নিঃশব্দে ঘরের অলিন্দে যাওয়ার দরজায় এসে দাঁড়াল। পায়ের মল চমকে উঠে স্বধ্বনিতে বেজে উঠল।

সংগীতের সুরের রেস এখনও কাটেনি। চোখ বুজে আসে নিদ্রার আবেশে। একটা শুভ্র নিটোল হাত করণকুমারের হাত স্পর্শ করে। এক মিষ্টি কণ্ঠস্বরে করণকুমার চমকে উঠল। ফিরতেই দু'জনের চোখাচোখি হয়ে যায়।

—চুরি করে দেখতে ভাল লাগে, না?

করণকুমারের বাক্ রুদ্ধ হয়ে যায়। বিস্মিত চোখে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—ডেকে পাঠালাম, এলেন না কেন?

করণকুমার নিজেকে সামলে নেয়। একটা হাসি টেনে বলল—এই তো।

—কৈকামহল কল্কীমহলের চেয়ে তো খারাপ নয়? হেসে বলে লছমিবাই।

—কল্কীমহলের খোঁজ রাখ দেখছি।

বুকে হাত দিয়ে মৃদু স্পর্শ করে। একটু ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে লছমিবাই বলল—যিনি কৈকামহলের খবর রাখেন, তাঁর খবর আমি রাখব না? আসুন, বাইরে অমন ভাবে দাঁড়াতে নেই। আমার তসলিম নেবেন না?

—তোমার দূতী রুক্মিণীবাই আগেই তসলিম জানিয়ে গেছে। তবু তোমার তসলিম নেবার আগেই বলছি, সত্যি আমি মুগ্ধ হয়েছি। যা এতদিন শুনে এসেছি তা সত্যি।

—লছমিবাইকে লজ্জা দেবেন না, আসুন।

—কোথায়, তোমার খাসমহলে ?

—না, পুরনো মহলে। আজ সব ফাঁকা। দেখারও কেউ নেই। প্রহরীরা আমায় নতুন মহল পাহারায় ব্যস্ত।

করণকুমার মন্ত্রমুগ্ধের মত লছমিবাইএর সঙ্গে চলে। করণকুমার এবার এক মুচকি হাসি হেসে বলল—কিন্তু লছমিবাই, আমাদের আলাপ রাজাবাহাদুরের কানে গেলে বিলাপে দাঁড়াতে পারে। আমাদের গোপন অভিসার গোপনেই থেকে যাক না কেন ?

—গোপনের প্রতি আপনার একটা বিরাট আকর্ষণ আছে, না ?

রসিকতার মধ্যে একটা বিরাট শ্লেষ আছে তা বুঝতে দেরী হলো না লছমিবাইএর।

—জানি, আপনি কি বলতে চান। তবু এখানে রাজাবাহাদুরকে টেনে আনবেন না। আমি বাইজী, উদ্দেশ্য আমার অর্থ উপার্জন। তাই বলে আমার রঙিন চোখে মরা গাছকে কচি দেখি না।

—তুমি নিশ্চয় জানো বড়কর্তা তোমাকেই ভালবাসে।

—বড্ড পুরনো কথা। একটা ব্যঙ্গের হাসি লছমিবাইএর চোখে খেলে গেল।

—পুরনো হলেও এযে সত্যি, তাতে কি সন্দেহ আছে ?

—আমরা যে জাতবাইজী, ছোটকুমার। আমাদের ভালবাসা রামধনুর মত, ক্ষণিকের আলেয়ার মত মিথ্যে।

থমকে দাঁড়ায় করণকুমার, বলল—সকলেই জানে তুমি বাইজী, তবু বারবার ওকথা বলছো কেন ?

লছমিবাইএর বড় চোখে ছড়িয়ে পড়ে এক বিস্ময়। মুখটি মলিন হয়ে ওঠে। এরকম কথা সে আশা করেনি। কোন মতে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বলল—তবু আমি যে মেয়ের জাত। তাই বড্ড ভয়। বলে লছমিবাই করণকুমারের হাতদু'টি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

—কিসের ভয় ? করণকুমার প্রশ্ন করে।

—যদি ভালবেসে ফেলি !

—এ তোমার মিথ্যে ভয়। এর আগে তাহলে কাউকে ভালবাসনি ?

—শুনে আপনার লাভ ? যাক্, এখানে আর নয়। আসুন আমার সঙ্গে

—কিন্তু—।

—কিছু নয়, আসুন। এখানে এভাবে দাঁড়ালে দেখে ফেলবে।

চলতে শুরু করে।

করণকুমার প্রশ্ন করে—কে দেখে ফেলবে বলছিলে ?

—কানোল খাঁ।

—কানোল খাঁ! এখানে কেন? বিস্ময়ে বলে উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে করণকুমার।

লছমিবাই হেসে ফেলে—হ্যাঁগো, সেই ডাকাত পাঠানটা আমাকে পাহারা দেয়। তার কৃপাণ এড়িয়ে একটি মাছিও ঢুকতে পারে না। জলসাঘর আর খুব জোর এই মহল পর্যন্ত আসা চলে কিন্তু তারপর একটি পাও না।

—ওঃ। এক অস্ফুট শব্দ করে চলতে শুরু করে করণকুমার।

অবশেষে দু'জনে লছমিবাইএর পুরনো মহলে খাসকামরায় এসে দাঁড়াল।

একটি আরাম কেদারায় বসতে বলে দ্রুতগতিতে ঘর ছেড়ে লছমিবাই চলে গেল। তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে করণকুমার চোখ ফেরাতে পারে না। এত রূপ, এত গুণ সে কি করে পেল! ভাগ্যবান প্রদ্যুৎনারায়ণ। সেও আজ ক্ষণিকের দেখায় উন্মত্তমুগ্ধ। জানে না এর শেষ কোথায়।

এবার ঘরের দিকে নজর গেল। সাধরণ ভাবে সুসজ্জিত। আজকাল খুব বেশী ব্যবহার হয় না ; তা দেখলেই বোঝা যায়। অদূরে চন্দনকাঠের তৈরী টেবিলের উপর জ্বলছে একটি রূপোর পাত্রে বসান বড় মোমবাতি। দেওয়ালে টাঙানো দু'খানা তৈলচিত্র। বিরহের মর্মজ্বালায় শকুন্তলা আপন চিন্তায় মগ্ন। তার উদাস মন দুষ্মন্তের জন্য আকুল হয়েছে। অদূরে মিথ্যা অবজ্ঞার অপমানে উগ্রমূর্তি দুর্বাসা অভিশাপ দিচ্ছে। পাশের অন্য ছবিটি একটি সাগরের বেলাভূমি। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ জল ছুঁই ছুঁই করছে।

আরাম কেদারায় বসে পড়ে করণকুমার। সারা মেঝে কার্পেটে ঢাকা। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। একরাশ চিন্তা মুহূর্তে তাকে ছেয়ে ফেলে। হয়তো আজকের দিনে সবই তার ওলট পালট হয়ে গেল। প্রথম দর্শনেই তার হৃদয়ে কি ঝড় তুলে দিল। এতদিনের সংযম কার নির্দেশে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে উদ্যত! লছমিবাইকে দেখার আকাংক্ষাকে এক সংযমের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিল এতদিন। প্রদ্যুৎনারায়ণ তার জ্যেষ্ঠতাত। স্নেহ করেন তাকে। আদর করে ডাকেনও 'রাজা' বলে। লছমিবাইও তাঁর প্রিয়। এই দুই প্রিয়ের মিলন প্রদ্যুৎনারায়ণ কি করুণার চোখে দেখবেন? অসম্ভব। এ কী সে করতে

চলেছে। এ যে অন্যায়। আগুনে হাত পুড়বে জেনেও এই দুঃসাহসে লোভ কেন? অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে।

হঠাৎ একটা স্পর্শে করণকুমার মুখ তুলে তাকায়। লছমিবাই তাকিয়ে। চমকে উঠল। ঐ ঘন পল্লবে তার জীবনের সবটুকু আশা ভরশা লুকিয়ে। যত সহজ মনে করছে ঠিক ততটা সহজ নয়। বহুদিনের এক ব্যথাতুর হৃদয়ের আকুল প্রশ্ন ঐ ঘন পল্লবে শেষ সমাধানটুকু খুঁজে পেয়েছে যেন।

লছমিবাই শরবত গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল—এটুকু খেয়ে নিন।

—শরবত?

—যা মনে করবেন তাই।

—শরবত না সুরা, লছমিবাই?

প্রথম সম্বোধনে লছমিবাই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘ জীবন ধরে এই সম্বোধনটুকুর জন্যই বোধহয় অপেক্ষা করে বসেছিল। সামলে নিয়ে বলল—এ আগ্রার সেরা প্রেমসুরা। একবার খেলে ভুলতে পারবেন না।

করণকুমার শরবত খেয়ে শূন্য গ্লাস লছমিবাইএর হাতে তুলে দিয়ে বলল—পুরনো মহল কি এখনও ব্যবহার কর?

—মাঝে মাঝে এখানে আসি। ইদানীং রুক্মিণী এই ঘর ব্যবহার করে। এখানে বেশ নির্ভয়ে কাটানো যায় কিন্তু।

—নির্ভয়ে কেন?

কানোল খাঁ এখানে বড একটা নজর দেয় না। তাছাড়া এদিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই, যদিও আছে তা বিপৎসংকুল।

করণকুমার লছমিবাইএর হাত ধরল।

প্রথম পরশ। লছমিবাই হাত ছাড়িয়ে একটু সরে গেল। মাথা নীচু করে বললো—পোশাকটা বদলে আসব?

—তা হঠাৎ পোশাক বদলাবে কেন?

—আজ আমার সবই হঠাৎ। আপনি এলেন আর আমিও যে—

—থেমে গেলে কেন লছমিবাই?

করণকুমারের পায়ের কাছে বসে পড়ে লছমিবাই বলল—সবটুকু আমাদের বলতে নেই।

—বেশ, বলো না। কিন্তু এত সুন্দর বাংলা আর কথা বলার ঢং এত তাড়াতাড়ি শিখলে কোথা থেকে?

—আপনাদের অন্নে আপনাদের অর্থে যে আমাদের বাঁচতে হয়।

করণকুমার হাসল।—কিন্তু দয়া বা দাক্ষিণ্যের উপর তোমরা তো নির্ভরশীল নও। যাক্, বাংলাদেশ তোমার কেমন লাগছে?

—আগে ভাল লাগতো না, কিন্তু আজকাল খুব ভাল লাগছে।

—বেশ, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে না তো, আমি হঠাৎ এলুম কেন?

লছমিবাই স্বপ্নমাখা সুন্দর চোখ তুলে করণকুমারের দিকে তাকায়। পাতলা ঠোঁট দু'টি কিসের এক আবেগে থর থর করে কেঁপে গেল। আস্তে বলল—এ আমার সৌভাগ্য। থেমে গিয়ে আবার বলল—আজ আমি কোন অন্যায় করছি কিনা জানি না, তবু বলছি আজ এতদিন পরে লছমিবাই সত্যি করে ছোটবাহাদুরের কাছে ধরা দিল।

—একি আমাকে বিশ্বাস করিতে বলো? লছমিবাই, একটু আগেই না বলছিলে তুমি জাতবাইজী?

—ঠিকই বলেছি। সাপুড়ে সাপ নাচায়, পেশাও বটে আবার নেশাও বটে। সাপ নাচায় বলেই যে সাপের কামড়ে মরে না এমন কথাও তো শুনিনি কোনদিন।

করণকুমার উঠে দাঁড়ায়—এবার আমি যাব, পথ দেখিয়ে দাও।

—এখুনি! বিস্ময়ে বলে লছমিবাই।

—হ্যাঁ, এখুনি। প্রথম প্রেমের রস। আকণ্ঠ পানে শরীর অসুস্থ হতে পারে।

লছমিবাই হাসল। বলল—প্রেমরসে এত ভীতি আপনার?

—না লছমিবাই, প্রেমরসে নয়, প্রেমবশে আমার বড্ড ভয়।

লছমিবাই কোন জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—চলুন।

ঘর ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গেলে করণকুমার আশ্চর্য হয়ে তাকাল। লছমিবাই হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে বলল—মহলের সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না। কানোল খাঁ দেখে ফেলবে। নীচে নেমে নতুন এক পথ দেখিয়ে দেবো, আসুন।

দু'জনে কত ঘর কত বারান্দা কত ভাঙা পথ পেরিয়ে অবশেষে এক গলিতে এসে দাঁড়াল। দু'পাশে উঁচু দেওয়াল। আকাশ দেখা যায়। লছমিবাই থমকে দাঁড়ায়। পথ দেখিয়ে বলল—এই পথ ধরে সোজা গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে প্রাচীরের গা ধরে চলে যাবেন, উঠবেন গিয়ে মল্লখালে। খুব সাবধান। দেওয়ালে গা ঢাকা দিয়ে কষ্টে সৃষ্টে যেতে পারবেন, কিন্তু—। থেমে গিয়ে

গলা নীচু করে বলল—তাই বলে এই পথে কখনও আমার এই মহলে আসবেন না।

করণকুমার বিস্মিত চোখে বলতে গিয়েও বলতে পারল না। হয়তো অনেক কিছু বলতে পারত কিন্তু বলল না। ডানদিকে আরও একটি গলিপথ। তার দিকে তাকিয়ে শুধু বলল—ঐ পথটা কিসের ?

নন্দীমহলে অনেক গোপন পথ আছে যা অনেক নন্দীরাজপুরুষরা পর্যন্ত জানতেন না।

—এও একটা গোপন পথ। ওটা গিয়ে মিশেছে কানাড়ি পথে। ওখানেও পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। সমস্ত জায়গা জুড়ে অসংখ্য প্রহরী।

করণকুমার এবার লছমিবাইএর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। এক ব্যঙ্গ হাসির ছটা তার সারা মুখটাকে কঠিন করে তোলে। বলল—বন্দিনী রাজকন্যার মত তুমি তাই সকলের কাছে এত বহুমূল্য, এত রহস্যময়ী, অথচ—।

লছমিবাই নিবিড় হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল, এক আবেগে বলে উঠল—অথচ বন্দিনী রাজকন্যা আজ ক্ষণিকের মুক্তির আনন্দে আত্মহারা।

চমকে উঠল করণকুমার। কৌতুকের হাসি মিলিয়ে যায়। হৃদয় সাগরে এক বিশ্বাসের সুর তরঙ্গাকুল হয়ে উঠল। আনমনা হয়ে যায় সে। সমস্ত সন্দেহ ভয় আত্মসম্মান ছাপিয়ে কণ্ঠে জেগে উঠল এক করুণ উৎসর্গ। বলে ফেলল—আমার সমস্ত কৌতূহল, অবিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে তোমার প্রেমের পরশে। জানি না, এ আবার কেমন তোমার অভিনয়।

লছমিবাইও নিজেকে হারিয়ে ফেলে। করণকুমারের হাত দৃঢ়ভাবে ধরে ফেলে আর্তনাদ করে উঠল—বিশ্বাস কর। আমার ভালবাসাকে তুমি এমনি ভাবে ভেঙ্গে দিও না। আমি জানি বাইজীকে ভালবাসতে নেই, ভালকথা বলতে নেই, সত্যি কথা বলতে নেই তবু নদীর পাড় ভাঙ্গে কেন ? মেয়ে হয়ে জন্মে—।

করণকুমার দু'হাতে লছমিবাইকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—আমাকে ক্ষমা কর, আজ আমিও হারিয়ে গেলাম।

করণকুমারের বুকে মুখ রেখে লছমিবাই কেন যেন সেদিন শিউরে উঠেছিল। এমনি করে কারো কাছে সে কখনও ধরা দেয়নি। আজ এই দেহটা নতুন হয়ে উঠেছে যেন। এর আগে দেহটাকে এগিয়ে তুলে ধরেছে অর্থের জন্য, মিথ্যে সম্মানের জন্য নারীত্বকে দিয়েছে বিসর্জন।...এতো নাচ নয়, গান নয়, দেহের ডাক নয়। মনের কথা, হৃদয়ের ভালবাসা—যুগযুগান্তের সুপ্ত চেতনার সজাগ উৎসর্গ।

করণকুমার বলল—আমাকে যেতে দাও।

লছমিবাই মুখ তুলে ওড়না দিয়ে চোখের জল মুছে বলল--এসো। আবার কবে দেখা হবে জানি না। প্রাকারে দাঁড়িও। আমি তোমাকে দেখব।

করণকুমার গলা থেকে একটি মুক্তোর মালা খুলে লছমিবাইএর কণ্ঠে পরাতে গেলে সে পিছু হটে যায়।

—একি! তুমি আমার মালা নেবে না?

—এ গলায় নয়। এখানে যে দশজন প্রেমের অভিনয় করে কত মালা পরিয়েছে। হাতে দাও, মাথায় তুলে—। এক আবেগে লছমিবাইএর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। মালা বুকে চেপে বলে উঠল--যেদিন চাইবো সেদিন নিজের হাতে আমাকে পরিয়ে দিও।

করণকুমার লছমিবাইএর হাতটা একটু স্পর্শ করে ছেড়ে দেয়। তারপর চলতে শুরু করে। গলির শেষপ্রান্তে করণকুমার আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। পিছনে তাকায়, দেখে লছমিবাই দাঁড়িয়ে। ওড়নায় মুখ ঢেকে সে কাঁদছে।

দূর থেকে প্রহরীর সতর্ক কর্কশ স্বর ভেসে এল। তড়িৎগতিতে করণকুমার অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওড়না সরিয়ে লছমিবাই দেখে করণকুমার চলে গেছে। কতদিন—কত দিন পরে সে কাঁদল। আজ কাঁদতে এত ভাল লাগছে কেন তার! এই কান্না বাইজীর নয়। এ যে নারীর অন্তস্তলের সত্যিকারের অশ্রুর ফল্গুধারা। আত্মহারা প্রেমের খাঁটি কান্না। দাঁড়িয়ে থাকে। এতক্ষণে করণকুমার নিশ্চয় প্রাকারে উঠে গেছে। আজ এই বিপৎসংকুল পথে ছেড়ে দিতে তার ভাবনা হলো না। তা না হলে সে যে তাকে সম্পূর্ণভাবে পেতো না।

জেহারাবাইএর তন্দ্রা হঠাৎ কেটে যায়। কার নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভূত হয়। করণকুমার আসবে বলে সে বসেছিল। কিছুক্ষণ হলো চোখ বুজেছে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। তাকিয়ে দেখে নয়ন দাঁড়িয়ে।

—একি তুমি এখানে!

নয়ন পালঙ্ক ধরে দাঁড়িয়ে হেসে বলল—অনেক ডাকলাম বাঁশীতে, এলে না। শেষ পর্যন্ত গাছ বেয়ে জানালা দিয়ে এলাম।

লেহারাবাই ভীত চক্ষে চারিদিকে তাকাল।

নয়ন বলে—ভয় নেই। ডুলেরা ঘুমে অচেতন।

ঘটনা ঘটল চকিতে। লেহারাবাই সশব্দে নয়নের গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল—এত সাহস তোমার, যাও এখান থেকে।

নয়ন চমকে উঠে পিছিয়ে আসে।

—যাও এখান থেকে—চলে যাও।

—লেহারা! চীৎকার করে উঠল নয়ন। লজ্জায় ঘৃণায় কাঁপতে থাকে সারা দেহ।—ছিঃ, লেহারা। আমি কাল থেকে তোমাকে দেখিনি বলে এসেছি। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। আর আসব না। এক উত্তাল কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়ে।

নয়ন দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে নামতে উদ্যত হলে লেহারাবাই মুহূর্তে সামলে নেয় নিজেকে। ভীষণ এক ভুল করতে বসেছে সে। পালঙ্ক থেকে নেমে টলে পড়ে যেতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল—নয়ন, আমার মাথা ঘুরছে।

নয়ন ঘুরে দাঁড়ায়। ভুলে গেল সমস্ত অপমান। দৌড়ে এসে লেহারাবাইএর দেহটা ধরে ফেললে সে নয়নেয় বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নয়ন আশ্চর্য হয়ে যায়। মাথায় হাত রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সস্নেহে ডাকল—লেহারা!

—ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না নয়ন, ওরা আমাকে মারবে। লেহারাবাই এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল।

নয়ন লেহারাবাইএর মুখখানি তুলে ধরে দৃঢ়স্বরে বলল—কে তোমাকে মারবে? আমাকে বল, বল লেহারা। সত্যি সত্যি উত্তেজিত হয়ে উঠল নয়ন।

লেহারাবাই হাত সরিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—সময় হ'লে বলব। পারবে তো তখন আমাকে রক্ষা করতে?

—নিশ্চয় পারব।

নয়নের হাত ধরে আস্তে বলল লেহারা—এখন যাও। ছোটকুমার চলে আসতে পারে। সোনা আমার, যাও।

নয়ন জানালায় এসে দাঁড়াল। নামতে গেলে লেহারাবাই নয়নের গালে একটা চুমু খেয়ে বলল—এত ভালবাসতে নেই। আমরা যে বাইজী।

উত্তরে নয়ন বলল—মরূদ্যানের সন্ধান যখন পেয়েছি তখন বিশাল মরুভূমির করাল গ্রাসকে ভয় পাই না।

নেমে যায় নয়ন।

লেহারাবাই হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠল। নীচে তাকায়। নয়ন নেমে গেছে। আপনমনে বলে উঠল—বড্ড বোকা লোকটা। লেহারাবাইকে ভালবাসে। কিন্তু লেহারাবাই?

চুপ করে যায়। কান পাতে। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল। ছুটে যায়। দোর খুলে ফেলে। কৈ কেউ তো নেই! করণকুমার আজকে তাহ'লে আর এলো না। বুকটা জ্বলে যায়। সে হয়তো এখনও লছমিবাইএর হাত ধরে কত প্রেমের মালা গাঁথছে। তবে তার ভালবাসার কোন মূল্যই নেই? এক রুদ্ধ আক্রোশে গলায় রজনীগন্ধার মালা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে সারা ঘরময় ছড়িয়ে দিল।

জানালায় এসে দাঁড়ায়। বাতাসে ভেসে এল ঘুঙুরের মন্থর ঝংকার। এত রাত্রে নাচছে কে? লেহারাবাই গান ধরল। তার অজ্ঞাতে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল ললিত। সুরের মধুর স্বর বাতাসে ভেঙ্গে ছড়িয়ে গেল। কিন্তু সেদিন তার আকুল সংগীত ছোটকুমার করণকুমারের কানে পৌছাল না।

প্রদ্যুৎনারায়ণ কোমরে হাত রেখে ঘরময় পায়চারি করে কি যেন ভাবছিলেন। লম্বা বড় ঘর। দেওয়ালের চারপাশে টাঙানো পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র। কেউ ব্যাঘ্র শীকার করছে, কেউ বা মল্লক্রীড়ায় ব্যস্ত। দূরে কোণে নিজেরও একটি প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে। নাকের কাছে তুলে একটি ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছেন।

প্রদ্যুৎনারায়ণ। বৃদ্ধ মানুষটা আজ বিশেষ কোন চিন্তায় মগ্ন। জানালায় এসে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকারে সুরভিকুঞ্জের বড় থামগুলি দেখা যায়।

লছমিবাইএর হঠাৎ একটা পরিবর্তন তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছে। গতকাল মাঝরাত্রি পর্যন্ত লছমিমহলে ছিলেন। গান গেয়েছে, তাঁকে সুরা খাইয়েছে, আদরও করেছে। রুক্মিণীবাইএর অদ্ভুত নৃত্য তাঁর রক্তে চঞ্চলতা এনে দিয়েছে। যতবার তিনি লছমিবাইকে বুকে টেনে নিয়েছেন ততবারই সে ধরা দিয়েছে কিন্তু সে ধরা যেন ঠিক ধরা নয়। লছমিবাইএর দেহটা মনে হচ্ছিল একটা মাংসপিণ্ড। প্রাণ নেই, চঞ্চলতা নেই। নির্লিপ্ত ভাব। জিজ্ঞেস তিনি করেননি কিছু। তারপর মহল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

হঠাৎ লছমিবাইএর কণ্ঠে গান শুনে কম আশ্চর্য হননি। ঐ আকুল সংগীত তাঁর উদগ্রীব মনকে এক কৌতূহলে ভরে দিয়ে গিয়েছিল।

এক ডাকে চমকে উঠলেন। পিছনে তাকিয়ে দেখেন—নায়েব সুবন্ধনী পালিত।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন—জলসার সময় আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

—না হুঁজুর, সব ব্যবস্থা করে কাছারিবাড়ী গিয়েছিলাম।

—আপনাকে কি বলেছিলাম? গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে প্রদ্যুৎনারায়ণ। নায়েব থতমত খেয়ে হাত জোড় করে বলল—প্রহরার কোন ত্রুটি তো করা হয়নি।

—জলসার সময় বাইরের কেউ ওখানে ঢুকেছিল?

নায়েব দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলল—আজ্ঞে কেউ না।

—জলসা শেষ হবার পর অতিথিরা কোথায় ছিলেন?

—কেবল ভাটপাড়ার নন্দ জমিদার রাঘবেন্দ্র ছাড়া সকলেই শেষরাতে চলে গিয়েছিলেন।

—রাঘবেন্দ্র যাননি কেন?

নায়েব মাথা নত করে আস্তে বলল—সুরার মাত্রা একটু বেশী হওয়ায় যেতে পারেন নি।

—উনি কি লছমিমহলে গিয়েছিলেন?

—যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু থাকবার নিয়ম নেই এই কথা কানোল খাঁ বলাতে আর তিনি যাননি।

—আচ্ছা, আপনি যান।

নায়েব চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু প্রদ্যুৎনারায়ণ আবার ডাকলেন।—রাঘবেন্দ্র গেলেন কখন?

—সেই সকালে। রোদ্দুর ওঠার আগেই।

—দেখতে কেমন?

নায়েব মুখ নীচু করে হাসল। সন্দেহ মানুষকে কতখানি পাগল করে দেয়।—চেহারার চেয়ে চাকচিক্যই বেশী। তবে সেদিন আসর একদম জমেনি।

—কেন?

—আপনি না থাকলে কি কিছু হয় হুঁজুর। সুরা খেয়েই সব বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

—আচ্ছা, আপনি যান।

নায়েব সুবন্ধনী পালিত মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেল।

আবার এক স্তব্ধতা সারা ঘরে নেমে আসে। অন্ধকার-মাখা আকাশের দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তার সমাধান খোঁজেন প্রদ্যুৎনারায়ণ।

আলবোলা হাতে এসে ঢুকল জগুয়া।

প্রদ্যুৎনারায়ণ আরাম কেদারায় গিয়ে বসলেন। চোখ বুজে লছমিবাইএর পরিবর্তনের নানা কারণের সূত্র ধরে টানতে থাকলেন। দেশের জন্য মন আকুল হয়ে উঠেছে? ওর তো কেউ নেই যে আকর্ষণ থাকবে। এখানে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে? তাই বা কি করে হয়? কোন অভিযোগ তো তার ছিল না।.........

জগু প্রদ্যুৎনারায়ণের হাতে তুলে দিল আলবোলার নল। টান দিয়ে মিষ্টি ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে বললেন—বলতে পারিস জগু, মক্ষিকা ফুলের কাছে যায়, না ফুল লোভ দেখিয়ে মক্ষিকাকে আকর্ষণ করে?

বৃদ্ধ জগু কল্কেতে কাঠি দিয়ে আগুন উস্কে দিতে দিতে বলল—দু'জন দু'জনকে চায় বলেই একসংগে দেখা যায়।

—তবু এর মধ্যে কে কার কাছে আগে যায়?

জগু সাদা চুলে একবার হাত বুলিয়ে বলল—জানি না হুঁজুর, ছোট মুখে বড কথা মানায় না।

প্রদ্যুৎনারায়ণ হাসলেন।

জগু আবার বলল—কে কার কাছে আগে যায় তার সন্ধান কিন্তু হুঁজুর মাটিই দিতে পারে আর বলতে পারে বাতাস।

প্রদ্যুৎনারায়ণের আলবোলা টানা বন্ধ হয়ে যায়। জগুর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন। মুহূর্তে তার চোখদু'টি ক্ষণিকের জন্য চক্ চক্ করে উঠল।

উঠে দাঁড়ালেন প্রদ্যুৎনারায়ণ।—চাদরটা দে তো।

জগু চাদর এগিয়ে দিয়ে বলল—কোথায় চললেন হুঁজুর?

—লছমিমহলে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ সেদিন দ্রুতগতিতে লছমিমহলে এসে দাঁড়ালেন। অসময়ে দেখে দুটি দাসী ছুটে এল। তসলিম জানিয়ে সরে দাঁড়াতে প্রদ্যুৎনারায়ণ চারিদিকে কৌতূহলী সঞ্চারী দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন—লছমিবাই কেমন আছে?

—এখন ভাল। শুয়ে আছেন। সংবাদ দেবো? একটি দাসী বলে।

—না থাক। রুক্মিণীবাই কোথায়?

—উনি তো পুরনো মহলে।

—বেশ। একজন গিয়ে তাকে খবর দাও। আমি ওখানে যাব। আর একজন আমাকে নিয়ে চল সেখানে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ সোজা পুরনো মহলে এসে দাঁড়ালেন। রুক্মিণীবাই কম আশ্চর্য হয়নি সেদিন। লাল ঘাগরা পরে, চুল খোলা। চোখে সুর্মা মাখেনি। যেন রাতের ফুল। কলি ফোটেনি। রুক্মিণীবাই সভয়ে তসলিম জানিয়ে সরে দাঁড়ায়।

প্রদ্যুৎনারায়ণ আরাম কেদারায় গিয়ে বসলেন। তিন দিন আগে ঠিক এইখানেই করণকুমার বসেছিল।

প্রদ্যুৎনারায়ণ হেসে বললেন—লছমিবাইকে দেখতে এসেছিলাম। এখন কেমন আছে?

রুক্মিণীবাই একটু দূরে কার্পেটের উপর বসে পড়ে মাথা নেড়ে জানাল—ভাল।

—ভাল লাগল না। তাই একটু গল্প করতে এলাম।

রুক্মিণীবাই মাথা নীচু করে হাতের নোখ খুঁটতে খুঁটতে বলল—সে আমার সৌভাগ্য।

—জলসা তোমাদের কেমন হলো?

—ভাল।

—রাঘবেন্দ্র এই ঘরে এসেছিলেন কেন?

রুক্মিণীবাই চমকে মুখ তুলে দেখে প্রদ্যুৎনারায়ণের কুটিল চোখ দু'টো তার দিকে তাকিয়ে।

—চমকে গেলে কেন রুক্মিণী?

—আজ্ঞে কেউ তো এখানে আসেনি। ঢোক গিলে বলে ফেলে। কানে ভেসে উঠল লছমিবাইএর সাবধানী বাণী।

—আহা রাঘবেন্দ্র না আসুক, অন্য কেউ তো এসেছিল। তা বেশ করেছে। শুনে'ছ আমি। এখানেও কি লছমিবাই গান গেয়েছিল?

—আজ্ঞে আপনি ভুল বলছেন।

—মিথ্যা কথা বলো না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রদ্যুৎনারায়ণ বলে উঠল আবার—মিথ্যা কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

রুক্মিণীবাইও রুখে উঠে বলল—আমিও মিথ্যা কথা বলিনি। আমার সাক্ষাতে কিছু ঘটেনি।

—তোমার সাক্ষাতে যা ঘটেছে তা নিশ্চয় জান? কে এসেছিল?

—আজ্ঞে তাও জানি না।

প্রদ্যুৎনারায়ণ জোরে বলে উঠল—তাহ'লে কী জান ?

—গাইতে জানি, নাচতে জানি।

হঠাৎ প্রদ্যুৎনারায়ণ রুক্মিণীবাইএর কথা শুনে হেসে উঠলেন।—আশ্চর্য, রুক্মিণী এত ভীতু তুমি ? আচ্ছা, সেতার বাজনা কতদূর শেখা হোল ?

—আজ্ঞে আমি তো বীণা শিখছি।

—ঐ হলো না হয়। প্রদ্যুৎনারায়ণ এবার শরীরটাকে পাশে একটু হেলিয়ে বললেন—জান রুক্মিণী, তোমার তসলিম একদিন লছমিবাইএর চেয়েও মূল্যবান হবে। সেই দিন আর বেশী দূরে নয়।

রুক্মিণীবাইএর চোখদু'টিতে এক আনন্দের ঝিলিক খেলে যায়।

—তোমার কোন আরজি নেই রুক্মিণী ?

রুক্মিণী হেসে ফেলে—হ্যাঁ, আরজি আছে। আজকে আমাকে ছুটি দিন।

ভ্রুকুটি করে প্রদ্যুৎনারায়ণ বলেন—আমি এখানে থাকাতে তোমার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে ?

রুক্মিণীবাই তসলিম জানিয়ে সভয়ে বলল—ছিঃ, আমি প্রস্তুত নই, তাছাড়া শরীরটাও আমার ভাল নেই।

প্রদ্যুৎনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। কাঁধে চাদর ফেলে আপন মনে বলে উঠলেন—সাদা পায়রা উড়িয়ে দেখি নেমে এল কালো পায়রা। ফুল তুলে দেখি অজান্তে কাঁটা ফুটেছে।

একজন দাসী এসে দাঁড়াল। প্রদ্যুৎনারায়ণকে বলল—লছমিবাই অন্দর-মহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রুক্মিণীবাইএর মাথাটা একবার আস্তে করে নেড়ে দিয়ে প্রদ্যুৎনারায়ণ বললেন—আতর ছড়িয়ে বোতল শূন্য করতে নেই। শরীর অসুস্থ এ-কথা কখ্‌খন বলো না। তাহ'লে ফুলের আর দাম থাকবে না। বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।—আচ্ছা রুক্মিণীবাই, চললাম। চোখে নতুন করে আবার কাজল লাগাও, আগুন লাগাও সকলের মনে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেলেন। রুক্মিণীবাই তার চলে যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঠোঁট উলটে বলল—জলকে বেরোবার পথ বাতলে না দিলেও চলে। সে-পথ সে নিজেই খুঁজে নেয়।

লছমিবাইএর শরীর ক'দিন যাবৎ ভাল যাচ্ছিল না। প্রদ্যুৎনারায়ণ কয়েকবার এসে ফিরে গেছেন। কিন্তু সে কী করবে, সাজতে তার ভাল

লাগে না। শুধু জানালার ধারে উঁচু আসনের উপর বসে অন্ধকারে প্রাকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দাসীর মুখে শুনল রুক্মিণীবাইএর সংগে দেখা করার জন্য প্রদ্যুৎনারায়ণ পুরনো মহলে গেছেন। ভয় হলো। করণকুমারের সংবাদ কি পেয়েছেন! দাসীকে পাঠিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে বসতে হলো। সাজতে হলো নানা সাজে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ এলেন।

লছমিবাইএর খাসকামরায় এসে দাঁড়ালেন—এখন শরীর কেমন? প্রশ্ন করলেন প্রদ্যুৎনারায়ণ।

লছমিবাই দোলনা ছেড়ে কপালে হাত দিয়ে বলল—মাথাটা বড্ড ভার হয়ে আছে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ দোলনায় বসে পড়ে হেসে বললেন—ভাবনা মানুষকে বড়ই দুর্বল করে দেয়।

লছমিবাই চমকে মুখ তুলে তাকাল। তারপর হাসি টেনে বলল—ভাবনা করলেই ভাবনা। আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

—কেন? পা দিয়ে দোলনা দুলিয়ে হাসতে থাকেন।

রুক্মিণীর কাছে ওভাবে যাওয়া আপনার ঠিক হয়নি।

—কেন লছমিপ্রিয়া? জল তেষ্টা পেলে একই পুকুরে জল খেতে হবে তাই বা কে বললে?

লছমিবাই নীচে বসে পড়ে হেসে বলল—জল ঘোলা করে খেলে রাগ হয় বৈকি।

প্রদ্যুৎনারায়ণ হালকা হাসির সুর টেনে বললেন—রুক্মিণীবাইএর সংগে একটু রসিকতা করতে গিয়েছিলাম।

—শুধু রসিকতা?

—এ্যাঁ? হ্যাঁ। জলসা কেমন হলো? তাছাড়া জলসার পর তোমার একটু পরিবর্তন দেখছি—তাই জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম।

—শরীর অসুস্থ। এটাকে কি পরিবর্তন বলছেন? উঠে দাঁড়িয়ে লছমিবাই প্রদ্যুৎনারায়ণের একবারে কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটি হাত তুলে নিয়ে বলল—শুধু বুঝি ঝগড়াই করবেন? আপনার শরীর কেমন?

প্রদ্যুৎনারায়ণ লছমিবাইএর দেহের উষ্ণতা অনুভব করেন।—এখন একটু ভাল। তুমি ওষুধ খাওনি?

—আপনি আজকাল একটুও ভালবাসেন না। এতদিন পরে বুঝি খোঁজ নেওয়ার সময় হলো ?

মুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে লছমিবাইএর হাতটা বুকে চেপে ধরে আবেগে বলে উঠলেন—আজ আমি বৃদ্ধ। তুমি আমাকে ভালবাস না লছমিবাই ?

—আপনার বুঝি খুব সন্দেহ হয় ?

—না-না, তুমি যে আমার প্রাণ। কথা দাও লছমি, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না ?

লছমিবাই চোখ বুজে ক্ষণিকের জন্য চমকে উঠে। কোন কথা স্ফুরিত হয় না। এক দুঃসহ বেদনায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। এই বৃদ্ধের কি অদ্ভুত আবদার। কেন বুঝতে চায় না, সে আজ বৃদ্ধ। শুধু স্নেহ আর কৃতজ্ঞতায় প্রেম হয় না। তবু করুণস্বরে বলল—সব সাধ আমার মিটেছে। এখন শুধু মরতে ইচ্ছে করে।

—ও-কথা বলতে নেই লছমিবাই।

প্রদ্যুৎনারায়ণের স্নেহমাখা চোখের দিকে তাকিয়ে লছমিবাই বলল—কেন বলতে নেই ?

—অমি যে মরিনি এখনও।

—না-না, ও কথা বলবেন না। লছমিবাই দোলনার রূপোর শিকল ধরে ফেলে হাঁপাতে থাকে। সত্যি তো সে প্রদ্যুৎনারায়ণকে ভালবাসে না। ভালবাসতে পারে না। তবু তাকে ছলনা করতে হচ্ছে। উপায় নেই। কোন পথ নেই এছাড়া। এক উৎকট যন্ত্রণা সে আর সইতে পারছে না।

প্রদ্যুৎনারায়ণ চীৎকার করে উঠল—কে আছিস! দাসীরা ছুটে এল। প্রদ্যুৎনারায়ণ ততক্ষণে লছমিবাইকে ধরে ফেলেছেন। অসুস্থ লছমিবাইকে শয্যার উপর শুইয়ে দিয়ে সমস্ত কৌতুহল, সন্দেহ বিসর্জন দিয়ে মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেলেন।

লছমিবাই শুয়ে থাকে। ঠিক আগের মত তার প্রাণচঞ্চলতা আর নেই। আজ তার কত চিন্তা। অন্তর্দ্বন্দ্বে সে জর্জরিত। উঠে বসে। বাইরে ছুটে যেতে চায়। আবার সামলে নেয় নিজেকে। না-না, এ ভাল না। সে যে বাইজী। সে নারী, তাই বলে অতি নারী হ'তে গেলে যে তার চরম মৃত্যু হবে। তিলে তিলে মৃত্যু—উঃ! সেও যে বাইজীদের জীবনে ভয়ংকর স্বপ্নের মত। প্রদ্যুৎনারায়ণকে সে ভালভাবে চেনে। করণকুমার তাকে ভালবাসে না। এ তার চোখের নেশা। তাকে কেউ ভালবাসে না—কেউ না। তার রূপ,

তার যৌবনের দৌলতেই ঝালরের এত আলো। উঃ! এইভাবে কতদিন সে বাঁচতে পারে? আজ ক'দিন ধরে অসুস্থ। কৈ দাসীগুলো ছাড়া আর তো কেউ একটু সংবাদও নিলে না!

না-না, সে আর বসবে না। ঐ জানালায় গিয়ে সে আর গাইবে না। থাকুক অন্ধকারে ঐ প্রাকারে দাঁড়িয়ে। সারারাত দাঁড়িয়ে থাকলেও সে আর যাবে না। আজই সে চিঠি দেবে। না-না, এ ভাল নয়। প্রথম অঙ্কুরেই বিনাশ হওয়া ভাল। বাড়তে সে আর দেবে না। সত্যি সত্যি লিখতে বসল। বার বার ভুল হলো। বাংলা সে যে লিখতে পারে না। উর্দু কবিতা লিখল। কেটে দিল। করণকুমার এতো বুঝবে না। নাঃ, আজ থাক।

কিন্তু পারল না। জানালায় এসে দাঁড়ায়। ক্লান্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে বসে পড়ে সেখানে। প্রাকার অন্ধকার। আকাশের তারাগুলি কেমন যেন জ্বলজ্বল করে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ বুজলো। দূর থেকে রুক্মিণীবাইএর বীণা বাদনের শব্দ ভেসে আসে। বেশ হয়েছে ওর হাতটা। সেও তার মত মরবে। কাল করবে তার ঐ রূপ। মরুক-গে! কী হবে বেঁচে এই দুর্বিষহ জীবনটাকে টেনে টেনে। তাইতো জীবন উপভোগের প্রতি এত আকর্ষণ। রূপে রসে দেহটাকে সাজিয়ে যেন আশ মেটে না। তাইতো আলোর এত জ্বলন্ত রূপ। চোখ ধাঁধিয়ে, কামনার সুরা ঢেলে যতক্ষণ উন্মাদনা সৃষ্টি করা যায়। তারপর তেল ফুরোলেই সব শেষ।

পায়চারি বন্ধ করে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল করণকুমার। কয়দিন হলো সে শুধু নিরাশই হয়েছে। প্রাকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ জ্বালা করছে। একটুখানি চোখের দেখা তাও সে দেখতে পায়নি কয়দিন। শুধু কানোল খাঁর জন্য আজ তার এত বড় ব্যর্থতা।

নয়নকে সে ডেকে পাঠিয়েছে। ওর হাতেই সে পত্র দেবে। প্রহরীই প্রহরীর চোখে ধূলো দিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আজ তার কিছুই ভাল লাগছে না। ছোট্ট ছোট পায়ে চলতে শুরু করে। কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। নয়ন আসছে। ঘরে আবার ফিরে এল। এদিকে আবার প্রদ্যুৎনারায়ণ তার আদরের রাজাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অস্থির মনের সময় যেন দীর্ঘ। এক অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য তার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলোকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে শত সহস্র বার।

নয়ন নমস্কার করে সামনে এসে দাঁড়াল। করণকুমার তার আপদমস্তক একবার দেখে নিয়ে আস্তে করে বলল—তোরই নাম নয়ন ?

নয়ন বিস্ময়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। করণকুমারকে নতুনভাবে দেখল। এই হচ্ছে লেহারাবাইএর পুরুষ—তার ভাগ্যকর্তা। তারপর চমকে উঠে বলে উঠল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রথমটা ইতস্তত: করে করণকুমার। পরক্ষণেই মরিয়া হয়ে যথাসম্ভব গলা খাটো করে বলল—লছমিমহলে একবার তোকে যেতে হবে।

—আমি ! বিস্ময়ে বলে নয়ন।

—কেন, তোর যেতে আপত্তি আছে ?

—আজ্ঞে না। ওখানে ঢুকতে তো দেবে না হুঁজুর।

—দেবে। বুদ্ধি থাকলেই সব হয়। তুই ওখানে যাবি। কানোল খাঁ বা তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আটকালে বলবি—বড়কর্তা পাঠিয়েছেন।

—হুঁজুর ! ভীতার্ত চোখে নয়ন তাকায়।

—কোন ভয় নেই। এই নে। বলে জামার অন্তরাল থেকে একটি পত্র বের করে নয়নের হাতে দিল। এটা লছমিবাইএর হাতে পৌছে দিয়ে আসতে হবে।

নয়ন মাথা নত করে।

করণকুমার নয়নের হাতে অনেকগুলো মুদ্রাখণ্ড দিয়ে আবার বলল—বলবি, বড়কর্তা জানতে চেয়েছেন, এখন উনি কেমন আছেন।

তবু নয়নকে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে করণকুমার কঠিন হয়ে উঠল। বলল—আমি যা বলছি তা করতেই হবে। কানোল খাঁর ব্যবস্থা আমি করছি, তুই যা।

নয়ন পত্রখানা লুকিয়ে ফেলে ম্লান মুখে বলল—হুঁজুর—

কথা শেষ হবার আগেই করণকুমার মোলায়েম স্বরে বলল—আমি বলছি, কোন ভয় নেই। চিঠি দিয়েই আমাকে সংবাদ দিয়ে যাবি।

নয়ন এক অজানা আশংকায় ভীত-মন্থর গতিতে চলে যায়। তার যাওয়ার পথে তাকিয়ে চীৎকার করে ডাক দিল করণকুমার—কে আছিস্!

ঘরে এসে ঢুকল রঘু। বৃদ্ধ। পাহারার নামে শুধু ঘুমোয়। তরোয়ালে বোধ হয় মরচেও পড়ে গেছে।

—কানোল খাঁকে ডাকতে পারবি ?

—কেন পারব না হুঁজুর।

—এখুনি যা। বলবি কাল সকালে সময়মত আমার সংগে একবার যেন দেখা করে। আর হ্যাঁ, আমি বড়কর্তার সংগে দেখা করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে একটা লোক এসে কিছু খবর দিলে তা শুনে রাখিস। আমি এলে পর বলবি।

করণকুমার নিজের মহল ছেড়ে চৈত্র মহলে পা বাড়ালো। এমনিভাবে করণকুমারকে মাঝে মাঝে প্রদ্যুৎনারায়ণ ডেকে পাঠান। ভ্রাতুষ্পুত্রটি তাঁর বড় প্রিয়। ডাকেনও 'রাজা' বলে। চৈত্রমহলে বেশীক্ষণ থাকতে পারল না। শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখা ছাড়া প্রদ্যুৎনারায়ণ আজ আর বেশী কিছু বললেন না। একটা বিশ্রী দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে করণকুমারও সেখানে বেশীক্ষণ বসতে পারল না।

চৈত্রমহল থেকে বেরিয়েই করণকুমার প্রাকারে ছুটে এল। দূরে লছমিমহল। জানালার সামনে বসবার আসন শূন্য। অন্ধকার। ঝালরের বাতি জ্বললে তার আলো ঐ আসনের উপর ছিটকে এসে পড়ে। সেই আলোয় লছমিবাইকে দেখতে পায়। তারই ইশারায় সে গান ধরে। আজ অন্ধকার। কি হলো লছমিবাইএর। করণকুমার আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে—সত্যি কি সে লছমিবাইকে ভালবেসেছে!

দূর থেকে মল্লাখালের জলের কলকল ধ্বনি ভেসে এল। করণকুমারও আজ শত চিন্তার মাঝে ভাসিয়ে দেয় নিজেকে। কত দুর্জয় শক্তির আধার সে, তবে আজ এত দুর্বল কেন? কেন এত চিন্তা? বার বার একই টানে এখানে ছুটে আসা। এই তো ভালবাসা।

কিন্তু লছমিবাই? সে যে বাইজী। চোখের সুর্মাতে মাখা ওদের ছলনা। আর তাদের চোখে সব কিছু নিঙ্‌ড়ে নেওয়ার কামনা। না-না, তার চোখে সে দেখেছে সত্যিকারের ভালবাসার অভিব্যক্তি। লছমিবাই সত্যিই ভালবেসেছে তাকে।

সে পুরুষ, লছমিবাই নারী। তবে কি তাদের এটা দেহের আকর্ষণ? তাহ'লে লছমিবাইএর সংগে লেহারাবাইএর কি প্রভেদ রইল? লছমিবাই যে কোমল, ফুলের মত। আর লেহারাবাইএর বিদ্যুতের মত চমক আছে, কিন্তু—না না, এই মিথ্যা সন্দেহে তার মনকে ভারাক্রান্ত করবে না। তাদের ভালবাসা অন্তরের।

হঠাৎ করণকুমারের খেয়াল হয়। কত রাত্রি ঠাওর করতে পারল না। চমকে উঠল। এক আনন্দের উত্তেজনায় চীৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে হলো।

বাতায়নে লছমিবাই দাঁড়িয়ে। ঝালরের বাতি জ্বলছে। হাতে তার একটি কাগজ। তার পত্র তবে সে পেয়েছে। লছমিবাইও প্রাকারের দিকে তাকিয়ে। বড় অন্ধকার। তাই হয়তো সে তাকে দেখতে পাচ্ছে না। বাতায়নে মাথা রাখল। সত্যি সে অসুস্থ। করণকুমার এক অপূর্ব আকার্ষণ অনুভব করে। এক বেদনা হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। তা সে সইতে পারে না। নালিশ জানালো শূন্য আকাশকে। লছমিবাই সরে যায়। আলো তেমনি জলতে থাকে। কেবল আলোর মানুষটি চোখের দৃষ্টিতে হারিয়ে গেল।

করণকুমার ফিরে এল নিজের মহলে। রঘু সেদিন আর ঘুমোয়নি। সংবাদ দেওয়ার জন্য ঠাঁয় বসেছিল। সে বলল—কানোল খাঁ আসবে হুজুর। নয়ন এসেছিস্, বললে আপনি যা করতে বলেছিলেন তা সে করে এসেছে।

সেদিন করণকুমার কল্পীমহলে এসে দাঁড়াল। অশান্ত মনটাকে কিছুতেই যেন স্থির রাখতে পারছে না সে। দোর বন্ধ। বাইরে মসলিনের পর্দা হাওয়ায় উড়ছে। আস্তে দোরে গিয়ে টোকা দেয়। রাত তখন অনেক। শূন্যে ঝালরের বাতির মোম প্রায় গলে শেষ হয়ে এসেছে।

দোর খুলে যায়। অতরাত্রে করণকুমারকে দেখে দুলেরা চমকে উঠে। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে যায়। সেলাম জানিয়ে পথ ছেড়ে দিল।

ঘরে ঢুকে করণকুমার জিজ্ঞেস করল—লেহারাবাই কোথায়?

—শুয়ে আছে, আপনি বসুন।

এগিয়ে এসে আরাম কেদারায় বসে পড়ে অলসস্বরে বলল—ও কি ঘুমুচ্ছে?

—হ্যাঁ হুজুর।

—থাক, ওকে আর জাগিও না। তুমি বরং না হয় সুরা আর পেয়ালাটা আমার কাছে দিয়ে যাও।

দুলেরা ভয়ে আঁৎকে ওঠে। কিন্তু কোন উপায়ন্তর না দেখে ছুটে যেতে হয়। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দেখে বাগানের দোর খোলা। লেহারাবাই বাগানে গেছে।

দুলেরার চোখে জল এসে পড়ে। এই বয়েসে সে কি ঐসব কর্তাদের কাছে তুলে ধরতে পারে? ওদিকে প্রেমের নামে ছোঁড়াটার মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে লেহারাবাই।

আবার ওপরে ছুটে এল। ঘরে ঢুকে বড় আয়নাটায় চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল। চামড়া কুঁচকে গেছে। চুলও সব সাদা হয়ে গেছে। তবু অঙ্গভঙ্গি করে। মহড়া নেয় কিভাবে সুরা ঢালবে।

সুরা আর পেয়ালা নিয়ে করণকুমারের কাছে এসে দাঁড়াল।

মেঝেতে রেখে থর থর করে কাঁপতে থাকে। দুলেরার অবস্থা দেখে করণকুমার হেসে ফেলল।

—আমি নিজেই করে নিচ্ছি। তুমি যাও দুলেরা।

দুলেরা যেন প্রাণ পায়। একরকম দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সোজা বাগানে এসে দাঁড়াল। গাছপালা সরিয়ে আস্তে ডাকল—লেহারা! দৌড়ে দৌড়ে খুঁজতে থাকে চারিদিকে।

হঠাৎ এক হাসির শব্দে দুলেরা দাঁড়িয়ে পড়ে। ঐ তো দু'জনে বসে। আহা যেন লায়লামজনু! আপন মনে বলে উঠল—নয়ন কি ওর ঐ শয়তানি বুদ্ধি একটুও বুঝতে পারে না? মরণ আছে। ডাকল—লেহারা!

নয়ন শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বড় একটা গাছের আড়ালে লুকোলে দুলেরা বলে উঠল—আর ঢং দেখাতে হবে না।

লেহারা গাছে হেলান দিয়ে বসেছিল। বলল—কি হলো রে দুলেরা?

—ছোটবাবু এসেছেন।

লেহারাবাই অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল—যাই নয়ন। তা অতো হাঁপাচ্ছিস্ কেন? বললি না কেন, বাগানে বেড়াচ্ছে।

—না, বলতে পারিনি। বললাম—ঘুমুচ্ছে।

—এবার সত্যি সত্যি তোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবো। একটুও বুদ্ধি নেই। বলে একরকম দৌড়ে লেহারাবাই চলে যায়। লাল ওড়না আগুনের শিখার মত একবার জ্বলে উঠে নিভে গেল।

লেহারাবাই ঘরে এসে দাঁড়াল। করণকুমার বড় দোলনায় চোখ বুজে শুয়ে। দূরে আরাম কেদারার কাছে সুরাশূন্য পেয়ালা উলটে পড়ে আছে। এরকম দৃশ্য ইতিপূর্বে সে কখন দেখেনি। সে এলো এখানে। কাউকে ডাকল না। নিজের হাতে সুরা পেয়ালায় ভরে খেল। এক ব্যঙ্গ হাসি হঠাৎ চোখের কোণে কঠিন হয়ে ভেসে উঠল। হায়রে, পত্র দিয়েও দুঃখের রাত্রি ভোর হলো না। বুকের ভিতরে একটি নাম ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে ধ্বনিত হলো—লছমিবাই, লছমিবাই।

সেখান থেকে সরে এসে লেহারাবাই জানালার পাশে দাঁড়াল। হঠাৎ কেন যেন এক উত্তাল কান্না বুকের ভিতরে আকুলি বিকুলি করে উঠল। আগ্রা, লখনউ, পেশোয়ার সে ঘুরে এসেছে। তার সংগে রাঙিয়ে এসেছে কত পুরুষের মন। তার কপাল ভাঙা। তাইতো কত অভিসারক

স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে ভাগ্যের ছলনায় কিন্তু প্রতিশোধ এপর্যন্ত সে নেয়নি। চলে এসেছে শুধু ব্যর্থতা নিয়ে, লোকের করুণায় প্রাণটুকু নিয়ে সে পালিয়ে এসেছে সুদূর দেশদেশান্তর থেকে।

পেশোয়ারের নসীবখানের খাসকামরায় তার নৃত্যচপল পদঝংকারে সেকি ভেবেছিল একদিন ছন্দপতন ঘটবে! ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না সেখানে। কত গান, কত নাচ, নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ একে একে উপহার দিয়েছে নসীবখানকে। কতই না ভালবেসেছিল, আর একটুখানি ভালবাসা পাওয়ার জন্য সে কীই না করেছে। নসীবখানের শান্ত-সুন্দর চোখ দু'টি এখনও সে ভুলতে পারে না। তারপর একদিন দিল্লীতে চাকরি নিয়ে নসীবখানের যাওয়ার কথা ঠিক হলো। লেহারাবাইও সংগে যাবে। সেখানে নাকি বাই উঠে গিয়ে হবে বিবি। নসীবখানের হবে প্রিয়তমা। সব ঠিক ঠাক, হঠাৎ কোথা থেকে এল জেহানা। বড়ঘরের মেয়ে। রাগ ছিল না, কিন্তু তেজ ছিল। তবু সে নসীবখানের প্রেমকে বিশ্বাস করেছিল। জেহানা নাকি তার আত্মীয়া। তার পিতা একজন বিশিষ্ট ওমরাহ। নসীবখান একদিন চুপি চুপি লেহারাবাইকে বলল তাকে দিল্লী যেতে হবে। তবে তার সংগে নয়, কয়েকটি ব্যবসায়ীকে সে ঠিক করেছে। তাদের সংগে সে লুকিয়ে এগিয়ে যাবে। তারপর নসীবখান একদিন না জানিয়ে জেহানা আর তার বাপকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। পথে গিয়ে মিলবে লেহারাবাইএর সংগে। সে দিল্লী যাচ্ছে এ-কথা জানতে পারলে সে আর তার প্রাণ নিয়ে দিল্লীতে যেতে পারবে না। লেহারাবাই সেদিন বিহ্বল চিত্তে নসীবখানের কথা বিশ্বাস করেছিল। সত্যি সত্যি সে একদিন কয়েকটি ব্যবসায়ীর সংগে পাড়ি দিল।

মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। রাত্রিতে তাঁবু পড়ল। আলো জ্বলল, নাচগান শুরু হলো, লেহারাবাই কিন্তু শুয়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে, তাকিয়ে দেখে তার সামনে ইসমাইল দাঁড়িয়ে। যার সংগে সে দিল্লী চলেছে। সেদিন পাঠানটা বলেছিল নাসীবখান তাকে চড়া দরে বিক্রী করে দিয়েছে। লেহারাবাই এখন থেকে ইসমাইলের। সেও জাতে ইরানী, ছোরা খুলে নিজের বুকেই বসাতে গিয়েছিল। ইসমাইল সেদিন ধরে ফেলে বলেছিল—তুমি মরতে আসনি, তোমার চোখের আগুনে সব পুড়িয়ে দিতে এসেছ। সত্যি সেদিন ঐ কথায় সে প্রাণ পেয়েছিল।

হঠাৎ এক ডাকে লেহারাবাই চমকে উঠে তাকিয়ে দেখে তার পাশে করণকুমার দাঁড়িয়ে।

লেহারাবাই গম্ভীর স্বরে বলল—আমাকে না ডেকে নিজের হাতে সুরা ঢেলে নিলে কেন?

—কেন, তোমার হাতে খেলে আরও মিষ্টি হতো?

—এত ভাগ্য কি আমার!

—ডাকিনি, তুমি যে ঘুমিয়ে ছিলে।

—বাবুজি, আজ তোমার কি হয়েছে?

করণকুমার ম্লান হাসি হেসে বলল—নদীর পাড় ভেঙেছে।

—কিন্তু আমার সব ভেসে গেলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, বাবুজি?

করণকুমার তাকায়। আশ্চর্য হলো লেহারাবাইএর এক নতুন রূপে। তবু কঠিন স্বরে বলল—তোমরা না বাইজী।

—হ্যাঁ, আমি বাইজী, তাই বলে—

—ভালবাসতে নেই লেহারা। বাইজীদের ভালবাসতে নেই। ছলনা তোমার রক্তে রক্তে, তাকে শান্ত করে সাধারণ হতে যেও না।

—বাবুজি! আর্তনাদ করে ওঠে লেহারাবাই। চোখ বুজল। রুদ্ধশ্বাসে আবার বলে উঠল—তবে লছমিবাইকে ভালবাসলে কেন?

—লছমিবাই আমাকে ভালবাসে কিনা জানি না, কিন্তু আমি ভালবেসেছি।

—ওঃ, এতদিন পরে সত্যি কথা বললে। বেশ।

করণকুমার বলে উঠল—জানি না আমাকে ভালবাসলে কেন, কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি না তা কি তুমি বোঝ না?

—না-না, বুঝব না আমি। উত্তেজনায় ঘন ঘন মাথা নেড়ে কেঁদে ফেলে।

করণকুমার এবার ঘুরে দাঁড়ায়।—কান্না আমি সইতে পারি না। শক্ত হও, বুঝতে চেষ্টা কর, মনে কর আমি একজন রাজপুরুষ, তোমাকে—

লেহারাবাই চীৎকার করে উঠল—জানি আমি। আর কাঁদব না। শুধু নাচব, গাইব। আমি যে বাইজী। বাবুজি, তুমি ঠিকই বলেছ।

ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে উদ্বেলিত কান্না চেপে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। করণকুমার চমকে উঠল বাঁশীর শব্দে। নিশীথ রাত্রির বুক ফেটে করুণ সুর বাতাসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। লেহারাবাই যা প্রকাশ করতে পারল না, তা যেন বাঁশীর সুরে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

করণকুমার আর দাঁড়াতে পারে না। কম্পিত পদে কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হলো লেহারাবাই কাঁদছে। হেসে উঠল আপনমনে।

কি নিষ্ঠুর এই ভালবাসা! এর ফাঁদে যে একবার পড়েছে সে এমনি করেই জ্বলে পুড়ে মরেছে। নন্দীমহলে ভালবাসা নেই। ব্যর্থতা আছে, কিন্তু তার কোন সান্ত্বনা নেই। ভালবাসার নামে আছে ছলনা আর মিলনের নামে মৃত্যু। কল্পীমহল ছেড়ে করণকুমার এগিয়ে চলল। ঝালরের বাতি প্রায় নিবু নিবু। রাত ফুরিয়ে এসেছে। রাত শেষ হলে আবার আসবে দিন। সেই দিনের আলোতে লেহারাবাই শক্ত হোক। বাইজীর জীবনযাত্রা ভাবতে চেষ্টা করুক দু'চোখ মেলে।

নয়নের পথরোধ করে দাঁড়াল শীমূলা। জিজ্ঞেস করল—রাতে কি জেগে থাকিস?

—আমি যে প্রহরী, মা।

—দেখ্ নয়ন, আমার চোখে ধুলো দিস না।

হাসল নয়ন—কি হয়েছে?

—তুই লেহারাবাইএর পাল্লায় পড়েছিস।

—কে বলল মা, আমি তাকে ভালবেসেছি।

—আর কাউকে বলিস না। কর্তাদের কানে গেলে তোর রক্ষা নেই। নয়ন, এখনও ওপথ থেকে ফিরে আয়।

—কেন মা?

শীমূলা দোরটা ভেজিয়ে আস্তে বলল—বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাইছিস?

—আমার জাত নেই। লেহারাও কোথা থেকে এসেছে সে তা জানে না।

—লেহারাবাই তোকে ভালবাসে?

—নিশ্চয়ই।

—না নয়ন। ওরা কখনো কাউকে ভালবাসতে পারে না।

—বুনো হাতীও পোষ মানে মা।

—তা মানে, আবার সেই পোষা হাতীর উপর রাজ-রাজড়ারা চেপেই রাজ্যি জয় করতে যায়।

—আমি কিন্তু তাকে নিয়ে আবার সেই জঙ্গলে ফিরে যাব।

শীমূলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—ভগবান! কিছু হবার আগে আমার যেন মরণ হয়।

নয়ন এগিয়ে এসে শীমূলাকে জড়িয়ে ধরে বলল—মা আমার!

শীমূলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে শুধু বলল—ছাড়, কাজে যাই।

নয়ন হেসে সরে দাঁড়াল। তাদের ভালবাসাকে কেউ যে বিশ্বাস করবে না তা সে জানত।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। নানা অভিসারের ইঙ্গিত এলেও করণকুমার প্রাকার ছেড়ে লছমিমহলে যেতে পারেনি। সেখানে যাওয়া নিয়েই হলো প্রধান সমস্যা। বুদ্ধিমান করণকুমার প্রেমের দহনে পুড়ে মরলেও কোন উপায়ই তার ছিল না।

অবশেষে আলোর আভাষ দেখা গেল। কানোল খাঁ প্রচুর অর্থে বশীভূত হলো। বহুদিন তার কথা সে শুনতে চায়নি। করণকুমার তখন বলেছিল, তার নামে প্রদ্যুৎনারায়ণকে লাগালেও কোন সুবিধে হবে না। কারণ কোন প্রমাণ নেই। বরং তার কথায় কানোল খাঁরই অনিষ্ট হতে পারে। কানোল খাঁ সেদিন সেলাম জানিয়ে বার বার বলেছিল—হুঁজুর আমাকে অপবাদে ফেলবেন না। তবু সেদিন শোনেনি করণকুমার। শেষে কানোল খাঁও প্রচুর অর্থের লোভ সামলাতে পারেনি। সকল প্রহরীকে বশীভূত করা অবশ্য সম্ভব হয়নি।

কানাড়ি গুপ্ত পথ একমাত্র মহলের পুরনারীদের জন্য ব্যবহৃত হতো। সেই সুযোগ নিল করণকুমার।

প্রাকার দিয়ে গেলে চতুর প্রহরী ভেন্দার চোখে পড়ার সম্ভবনা খুব বেশী। জলসাঘরের দিকে অসংখ্য প্রহরী। কেবল উৎসবের সময় সেই সংখ্যা একেবারে কমিয়ে দেওয়া হয়। কারণ তখন লছমিবাইকে ঘিরে থাকে সকলে।

একদিন এক সন্ধ্যায় সেই কানাড়ি পথ দিয়ে লছমিমহলে যাওয়ার গুপ্ত পথে এসে দাঁড়াল সে। যে পথ দিয়ে লছমিবাই বৌরাণীদের সংগে যেত মন্দিরে।

রুক্মিণীবাইএর মুখে শুনে লছমিবাই বিশ্বাস করতে পারে না। করণকুমার সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তার কাছে এসেছে। চারিদিকে এক সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বলল—আমার শোবার ঘরে নিয়ে যা। দেখিস, কেউ যেন ওখানে না ঢোকে। স্বয়ং প্রদ্যুৎনারায়ণ এলেও না।

লছমিবাই চোখ বুজে নিঃশ্বাস নেয়। এক আনন্দের শিহরণ তার সারা দেহে খেলে যায়। করণকুমার তাকে ভালবাসে। সে এসেছে তারই কাছে।

চোখ খুলল। আজ তার সাজাও হয়নি। না, সে সাজবে না। রূপের ডালি দিয়ে তাকে ভোলাবে না। রূপকে ভালবেসে থাকলে সে তো তাকে পাবে না। সে এমনিই যাবে।

মন্থর গতিতে ঘরে এসে দাঁড়াল। পা জড়িয়ে আসে এক লজ্জা আর কুণ্ঠায়। করণকুমার ঝরোকার পাশে দাঁড়িয়ে।

লছমিবাইএর নিঃশ্বাসের শব্দে করণকুমার ঘুরে দাঁড়ায়। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায় এক বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলে। কারো মুখে কথা স্ফুরিত হয় না। লছমিবাই কপালে হাত দিয়ে অভিবাদন জানিয়ে করণকুমারের কাছে এসে দাঁড়াল। করণকুমার হাত প্রসারিত করে। লছমিবাই তার হাতে ধরা দিয়ে বলল—আমার ভীষণ ভয় করছে।

করণকুমার হাসে—কেন ?

লছমিবাই তার সুন্দর চোখ তুলে তিরস্কারের সুরে বলল—প্রাণের কি একটুকুও মায়া নেই ?

—না। করণকুমার আবার হাসে।

লছমিবাই হাত সরিয়ে বলল—যাও, এমন পাগলামো করে ?

করণকুমার লছমিবাইএর মুখখানি তুলে ধরল। এক লজ্জায় চোখ বুজল লছমিবাই। ঠোঁট দু'টো জ্বালা করতে থাকে এক তৃষ্ণায়।

—লছমিবাই !

মধুর ডাকে চোখ খুলে তাকাল লছমিবাই—বাইজীকে ভালবাসতে নেই।

—তুমি আমাকে ভালবাস না ?

করণকুমারের বুকে মাথা রেখে একবার চমকে উঠে, কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

—কেউ যদি দেখে ফেলতো। লছমিবাই আস্তে বলে।

—তাহলে ওরা আমাকে মেরে ফেলতো। তুমি শুনতে আমি মরে গেছি। করণকুমারের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে লছমিবাই আঁৎকে উঠল। করণকুমার সেদিন লছমিবাইএর মনের কথা জানতেও পারল না।

লছমিবাই তার বুকে মাথা রেখে একটা অলক্ষণে আশংকায় বার বার কেঁপে উঠেছিল। যদি ধরা পড়তো! হারিয়ে যেত তার জীবনের শেষ সম্বলটুকু। করণকুমারকে সে ভালবেসেছে। নারীর ভালবাসা। এ ভালবাসা নেশাগ্রস্ত নয়—মোহ নয়। আজকে সে বাইজী নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই। নেই দ্বন্দ্ব। এর জন্য সব সময়ে সে মরতে প্রস্তুত। তাই

বলে প্রেমের যূপকাষ্ঠে করণকুমার আত্মত্যাগ করবে তার জন্য! মৃত্যুর আগে তাহ'লে জানতেও পারবে না, তার মত এক নারীর পবিত্র ভালবাসার স্বীকারোক্তি। এত বড় ব্যর্থতা—এত বড অভিশাপ নিয়ে সে কী করে বাঁচবে!

লছমিবাই এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—এসো, এখানে বসো। বলে পালঙ্ক দেখিয়ে দেয়। করণকুমার দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় এসে বসে বলল—আমার চিঠি পেয়েছিলে?

মাথা নেড়ে জানাল লছমিবাই—হ্যাঁ।

—উত্তর দিলে না কেন?

—বাংলা যে লিখতে পারি না ভাল।

করণকুমার হেসে উঠে। পরক্ষণেই লছমিবাইএর মুখখানিতে চিন্তার মেঘ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠল—কি ভাবছ লছমিবাই?

লছমিবাই চমকে উঠে। বড় চোখ তুলে করণকুমারের দিকে তাকাল। চারচোখে-সহজ সুন্দর দৃষ্টি বিনিময় হয়।

—ভাবছি, এ ভাল হচ্ছে না ছোটকুমার।

করণকুমার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকায়—কেন ভাল হচ্ছে না?

লছমিবাই পালঙ্কের হাতল ছেড়ে দেয়—তোমার ক্ষিধে পেয়েছে, না? যাই কিছু বলে আসি।

করণকুমার লছমিবাইএর একখানা হাত খপ্ করে ধরে ফেলে উত্তেজিত হয়ে বলল—কেন ভাল হচ্ছে না—বল।

—আঃ, লাগে। তিরস্কারের চাহনি তুলে বলে উঠে দৌড়ে চলে যায় লছমিবাই। করণকুমার পালঙ্ক থেকে নেমে জানালায় এসে দাঁড়াল। হাতের মুষ্টি ব্যর্থতার আবেগে নিষ্পেষিত হতে থাকে। এ যে প্রথম আঘাত! যা চেয়েছে তার বেশী সে চিরকালই পেয়ে এসেছে। তবে এই কথার কারণ কি? তবে কি লছমিবাই তাকে ভালবাসে না! এও কি ছলনার এক অন্যরূপ!

—একি, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? এই দুটো মিষ্টি খেয়ে নাও।

—না, থাক। কেন ভাল হচ্ছে না, বল।

লছমিবাই একটি মিষ্টি করণকুমারের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলল—পাগল।

করণকুমার লছমিবাইএর হাত চেপে ধরে বলল—সত্যি লছমিবাই, তুমি আমাকে ভালবাস না?

—ভালবাসা, ভালবাসা। মনের কেনাকাটার মাঝে দেহটার অধিকার নেওয়ার কি অদ্ভুত ফন্দি। লছমিবাই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। করণকুমারের এই উগ্র রূপ সে সইতে পারছে না। ভয়ে তার বুক দুরু দুরু করে উঠল। কী ভয়ংকর এই পুরুষ জাত।

করণকুমার জোর করে লছমিবাইএর মুখটা ঘুরিয়ে কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারল না। লছমিবাইএর চোখে জল। সে কাঁদছে।

লছমিবাই ওড়না দিয়ে চোখ মুছে বলল—কেন যে কথায় কথায় আজকাল চোখে জল এসে পড়ে।

—কেন লছমিবাই ?

লছমিবাই ম্লান হাসি হাসল—মরণ ঘনিয়ে এসেছে বলে। তাই বলছিলাম, এ ঠিক হচ্ছে না।

করণকুমার লছমিবাইএর মুখখানিতে হাত রেখে বলল—ভয় কি ? মরি তো দু'জনেই মরব।

—কেন আমার জন্য তুমি মরবে ? আমি তো বাইজী। দেহের রূপ দেখিয়ে আমাদের বাঁচার অধিকার। তাইতো আমাদের ভালবাসতে নেই।

—বেশ, তুমি বেসো না। ছেড়ে দাও। আমি আর আসব না।

—কোথায় যাবে ?

—জানি না।

—ওমনি রাগ হলো। বেশ, আর ওকথা তুলব না। হলো তো ?

করণকুমার এবার অন্য কথা বলে।—ওদিকের খবর কি ?

—কি খবর দেবো, বল।

—কেউ কি সন্দেহ করে ?

—আমার একটু পরিবর্তনে, তা সন্দেহ করে, তবে নায়কটি কে তা ঠিক ধরতে পারছে না। যাক্ সে কথা। তুমি একটা বিয়ে কর—লছমিবাই হঠাৎ বলে ফেলে।

—হঠাৎ এ-বুদ্ধি এল কেন ?

লছমিবাই করণকুমারের বুকে মাথা রেখে বলল—আমি যে তোমাকে ভালবাসি, তাই সব ভাবতে হয়।

—বিয়ে করলেই আমি সুখী হবো তাই বা কে বললে ?

—তবু তাতে একটা সৌন্দর্য থাকবে, কলঙ্কহীন জীবন হবে। এই পচা নোংরা দেহটাকে নিয়ে কি করবে ?

—ভালবাসার আগুনে আমার লছমিবাইকে খাঁটি করে তুলব। আবার ফুল ফোটাব।

লছমিবাই করণকুমারের দিকে তাকায়। চঞ্চল কালো তারাদু'টির মাঝে খোঁজে তার শেষ সম্বল। হৃদয় ছেড়ে তার বিবেকের তন্ত্রীতে কে যেন এসে ঘা দেয়। এও কি সম্ভব! এই দেহটার যৌবন ও রূপে ভালবাসা হয়তো জিয়ানো থাকবে কিন্তু একদিন তার বয়েস হবে, তার রূপও ঝরে যাবে—তারপর? লছমিবাই বলল—কিন্তু কেউ তো বিশ্বাস করবে না তোমার আমার ভালবাসাকে।

—এই হলুদপুরমল্লার কেউ বিশ্বাস না করুক। বাইরে শত শত নগরী বিশ্বাস করবে।

—এটুকু খেয়ে নাও। আমি কি নিজের হাতে খাইয়ে দেবো? করণকুমার হাসল—সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি। এই হাতে শুধু সুরাই দিয়েছি কিন্তু মুখমিষ্টি কখনো কারো করিনি।

লছমিবাই করণকুমারের মুখে মিষ্টি তুলে ধরে।

করণকুমার হাতটা ধরে ফেলে—আগে কথা ঘুরিয়ে নাও।

—কি কথা?

—'এ ঠিক হচ্ছে না' আর কখ্খনো বলবে না, বল।

—বেশ, আর বলব না। যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

—তুমি আমাকে ভালবাস না? আবার সেই প্রশ্ন করে বসে করণকুমার। ছলনা আর সন্দেহ হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ায়। তাই মানুষের মনে এত দ্বন্দ্ব।

লছমিবাই চোখ বোজে। এই ভীষণ প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারছে না। এ যে বলতে নেই। শুধু বলল—এই পাপীর মুখে এ-কথা নাই বা শুনলে।

—আবার ও-কথা। ধমক দেয় করণকুমার।

—যা সত্যি তা বলব না? কেন বোঝ না আমার কথা। বেশ, যখন শুনতে চাইছো তাহলে বলি। তোমাকে ছাড়া আর সকলকে ভালবাসি।

—এ আবার কি ধরনের কথা?

—ঠিকই তো। তুমি তো সকলের মত নও? তাই তোমার মালা গলায় পরতে পারলাম না।

—বেশ, তাহ'লে আমি চলে যাই।

—কোথায় যাবে ?

—জানি না।

—আমি জানি। মেহারাবাইএর কাছে।

—তা, আমি ওখানে যাই। সেও সত্যি করে আমাকে চায় কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

—শুনে লাভ ? তুমি তো আমাকে ভালবাস না।

লছমিবাই হঠাৎ বসে পড়ে। তারপর করণকুমারের একটা পা জড়িয়ে ধরে এক কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

—একি লছমিবাই !

—না-না, যতই ডাক, কিছুতেই উত্তর দেবো না। কথা দাও আমাকে ভুলে যাবে। বল।

—বেশ, এই কথা শুনলে যদি তুমি খুশী হও, তাই হবে। পা ছাড়।

—না, ছাড়বো না। বল এই পাপীকে এমনি করে তোমার পায়ে ঠাঁই দেবে ?

করণকুমার এবার লছমিবাইকে টেনে তুলে বুকে চেপে ধরল। কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু স্বরে বলে—কথা দাও, তুমিও আমার ভালবাসাকে অপমান করবে না ?

—যদি বড়কর্তা জানতে পেরে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে তিলে তিলে মেরে ফেলে ?

—করণকুমার থাকতে এতবড় সাহস কার আছে ?

লছমিবাই মুখ তুলে বলল—যদি নিজেই আমি তিলে তিলে মরে যাই ?

হঠাৎ এক ডাকে লছমিবাই সরে দাঁড়ায়। দোরে রুক্মিণীবাই দাঁড়িয়ে, মাথা নীচু করে বলল—অনেকক্ষণ হয়েছে, কানোল খাঁ সেলাম জানিয়েছে।

করণকুমার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—হ্যাঁ। এবার আমি যাই।

রুক্মিণীবাই দোর থেকে দৃষ্টির অন্তরালে সরে যায়। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়।

—চলি লছমিবাই।

—এসো। হঠাৎ চোখ তুলে ফস্ করে বলে ফেলে—কৈ কিছু তো চাইলে না আমার কাছে ?

—কি চাইবো ?

—সকলে যা চায়।

—আমি তো সকলের মত নই। বেশ, আমি যা চাইবো তা দেবে? প্রতিদিন সন্ধ্যায় জানালায় এসে দাঁড়াবে। আমি তোমাকে দেখব।

—দাঁড়াব। আবার কবে আসবে?

—সময় আর সুযোগ পেলেই আসব।

করণকুমার ঘর ছেড়ে গলির মুখে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ লছমিবাই করণকুমারের হাত ধরে বলে উঠল—একটা কথা আমার রাখবে?

করণকুমার বিস্ময়ে তাকায়—কী কথা?

—আমাকে ভুলতে চেষ্টা করো।

—এতো গেল আমার বেলায়। কিন্তু তুমি পারবে আমাকে ভুলতে? লছমিবাই এক ম্লান হাসি হাসল। পরমুহূর্তে ধমকের সুরে বলে উঠল—বেশী মদ খেও না। যদি শুনি কমাওনি, দেখো, তাহলে আমি ঠিক বিষ খেয়ে মরে যাব।

—আচ্ছা চেষ্টা করব, বলে করণকুমার দ্রুতগতিতে গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লছমিবাই ঘর ছেড়ে অলিন্দে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার। আলো আর তার ভাল লাগছে না। নিজের দেহটাকে নিয়ে হঠাৎ কেন যেন তার চিন্তার সীমা নেই। এক ঘেন্নায় শিউরে ওঠে তার সারা মন। অন্তরের ভালবাসা ছাড়া তার আর কি আছে? সত্যি যদি করণকুমারকে সে ভালবেসে থাকে তবে ভয় কিসের? ভালবাসার আগুনে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাক। মরণের ভয় তার আর নেই। সময় এসেছে! এবার তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে সত্যি সত্যি সে নিঃস্ব হবে। মনে করবে দেহ, রূপ আর যৌবন আজ নিঃশেষিত। মনের শত দুয়ার খুলে গেছে। এক অমৃত আস্বাদনের জন্য সে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। দূর থেকে মন্দিরের আরতিধ্বনি ভেসে এল। শূন্যে হাত তুলে প্রণাম করে বলল—ওগো ঠাকুর, আমার সব কেড়ে নিয়ে শুধু ভালবাসার প্রেরণাটুকু দাও। এতে যদি মৃত্যু আসে তা আসুক। মরতে আজ আমার একটুও ভয় নেই।

সময়ের আবর্তে এভাবে অনেকগুলো দিন আর রাত কেটে যায়। প্রণয়াভিসারের গোপনকক্ষে দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটল কতবার। সেই সুযোগে করণকুমার তার যৌবন উদ্যানের বসন্তের ফুলগুলি একে একে উপহার দিল লছমিবাইকে।

একদিন। লছমিবাই এসে দাঁড়াল মহলের গুপ্ত পথে। ছোট্ট সুড়ঙ্গ পথ। দীর্ঘ সোপানশ্রেণী ধাপের পর ধাপ নীচে নেমে গেছে। সেই পথ গিয়ে মিশেছে মল্লাখালে। প্রদ্যুৎনারায়ণ আর লছমিবাই ঐ পথ দিয়ে মল্লাখালে গিয়ে বজরায় চেপে নৌ-বিহার করতে বেরোতেন।

রুক্মিণীবাইকে বারবার সাবধান করে লছমিবাই মুখে ওড়না টেনে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। অন্ধকার পথ। অন্য সময় হলে দেওয়ালে লাগানো মশালের আগুন জ্বলে আলো ছড়াতো। কিন্তু আজ তা সে হতে দিল না। চতুর ভেন্দার চোখে পড়লে রক্ষে নেই। হাতে একটি বড় মোমবাতি নিয়ে সন্তর্পণে নেমে যায়। দু'পাশের দেওয়াল আজ এক কৌতুকে লছমিবাইএর অভিসার দেখছে। সফেদ ঘাগরা, হাত পর্যন্ত লম্বা সাদা রূপালী কাজ করা বহুমূল্য কামিজ। কপালে পরেছে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। পায়ে জরিদার নাগরাই। হাতের মোমবাতির মৃদু আলোতে চলতে গিয়ে বারবার হোঁচোট খায়। অবশেষে সুড়ঙ্গের বহির্মুখে এসে দাঁড়াল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া সর্বাঙ্গে এক স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

এক ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দেয়। হ্যাঁ, ঘাটে একটি বজরা বাঁধা। ছোট্ট বজরা, চারটে দাঁড়ি। বজরার উপর দাঁড়িয়ে করণকুমার। ইশারা এল, লছমিবাই ক্ষিপ্র পদে নৌকায় গিয়ে উঠে পড়ে।

দাঁড়ের টানে বজরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বজরার ভিতরে ছোট্ট এক সিঁড়ি নীচে একটা ঘরে গিয়ে থেমেছে। মন্থর গতিতে ঘরে গিয়ে দাঁড়াল তারা। সুসজ্জিত ঘরখানি। সাদা দেওয়াল। জানালায় টাঙানো রঙিন পর্দা। গোল তক্তাপোশ, তাতে পাতা মোটা সাদা গালিচা। তিন চারটে তাকিয়া তার ওপর। লছমিবাই মুখের ওড়না ফেলে দিয়ে তাকিয়া টেনে আধশোয়া অবস্থায় বসে পড়ে হেসে ফেলল—বাবাঃ, যা ভয় করছিল!

করণকুমার জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে দেখে। বজরা নন্দী প্রাসাদ ছাড়িয়ে তর তর করে ছুটে চলেছে।

—কিসের ভয়?

—যদি কেউ দেখে ফেলত!

—ফেললেই বা, খবর পৌছতে না পৌছতে বজরা বহুদূর চলে যেত।

—কতদূর যেতে?

—ত্রিবেণী ছেড়ে যতদূর যাওয়া যায়।

—আমার জন্য বংশ-সুখ সব ছেড়ে দিতে?

—সত্যি কথা লছমিবাই। আমাদের বংশে এ পর্যন্ত এরকম কেউ করেনি। তবে আমি করতাম। বদ্ধ পাষাণের শাসন আর আমার ভাল লাগে না। তোমার ভাল লাগে?

লছমিবাই হাসল।—আমার আবার ভাল লাগা। এতদিন এই ধারণাই ছিল, শূন্য আকাশ ছাড়া কোথাও বুঝি মুক্তি নেই। কিন্তু আজ আমি মুক্তি চাই। নতুন জীবন নতুন মানুষ নিয়ে ঘর বাঁধতে চাই।

—তোমার আকাংক্ষা মিটতেও তো পারে।

লছমিবাই কপালে হাত ছুঁয়ে বলল—এই নসিব বড় মন্দ। করণকুমার এবার লছমিবাইএর একেবারে কাছে বসে পড়ে হেসে বলল—তুমি এত সুন্দর কেন?

—আমার অদৃষ্ট খারাপ বলে। এই তো আমার কাল করল। আজ এ না থাকলে কেউ ডাকত না, আর তুমিও এমনি ভাবে পাগল হ'তে না।

—এ তো নারীর গর্ব, যুগযুগান্তরের সাধনা।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। যৌবনের উত্তাপ আছে, সুরও আছে। কিন্তু সেই আগুনের ছলনায় কত লোকেরই না সর্বনাশ হয় তা জান না?

করণকুমার লছমিবাইএর মাথায় হাত রাখলে সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে উঠল—চাই না আমার রূপ। বল, আমার রূপে তুমি ভোলনি? করণকুমারের দিকে সোজা হয়ে তাকাল।

—ভালবাসা যে শিবসুন্দর। তার বিশ্লেষণ আমি করতে পারব না। জানি না, তোমার কি দেখে ভুলেছি। আমি জানি না, শুধু এইটুকু জানি আমার জীবন নাটকের শেষ অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে।

বিস্ময়ে দেখে লছমিবাই। করণকুমারের ভাবুকতার চোখে খোঁজে তার ভালবাসার ইঙ্গিত। অর্থ ধরতে পারে না। হাত বাড়িয়ে তার হাতদু'টি বুকে টেনে আস্তে ডাকল—এই, শোন।

করণকুমার মুখ নীচু করে। লছমিবাইএর সুন্দর চোখের দিকে তাকাতে সে হেসে ফেলে।

—ঐ দেখ।

জানালা দিয়ে দু'জনে তাকায়। মল্লাখালের দু'ধারে অন্ধকারমাখা পল্লীর ছায়া। মাঝে মাঝে পাতলা বনানীর স্তিমিত দৃষ্টি।

লছমিবাই উঠে বসে। তরঙ্গিণীর তরঙ্গিত ধ্বনি ভেসে আসে। তারা বহুদূর চলে এসেছে। বেশ লাগছে তার। এভাবে যদি তারা ভেসে যেত! ঠিকানা থাকবে না—ঘাট থাকবে না, দেনা পাওনার হিসাবও থাকবে না।

করণকুমারের মুখটা নিজের দিকে টেনে এনে বলল—কি ভাবছ?

কি সুন্দর করণকুমার! সরু ভুরু তার বিশাল নয়নের ভাববিহ্বল দৃষ্টিকে আটকে রেখেছে। তা যেন সইতে পারে না লছমিবাই।

চোখ বুজল। রাঙা পাতলা ঠোঁট কিসের এক আবেগে থর থর করে কাঁপতে থাকে। নিমীলিত চোখে দেখে, করণকুমার তার দিকে তখনও তাকিয়ে। ওড়না টেনে দেয় মুখের ওপর।

—ওকি!

—লজ্জা করে না বুঝি, ওভাবে তাকাও কেন?

—কিসের লজ্জা?

—যাও, একটা কথা বলব, শুনবে? হাসবে না?

—কি কথা বল।

লছমিবাই তাকিয়ার উপর উপুড় হয়ে পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—আমি তোমাকে ভালবাসি।

—এই কথা, এ বুঝি নতুন কথা শোনালে।

লছমিবাই ওঠে না।

—এই, একটা গান গাও না, কতদিন তোমার গান শুনিনি।

উত্তর এল না।

করণকুমার পিঠে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। লছমিবাই কাঁদছে।

—একি তুমি কাঁদছ?

তবু ওঠে না। জোর করে তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল চোখের জলে সারা মুখ লিপ্ত।

—একি লছমিবাই!

—আমি যে সইতে পারছি না। আমি একি করলাম!

—তুমি তো কিছু করনি।

—না-না, আমি অন্যায় করেছি। আমাদের যে ভালবাসতে নেই।

হঠাৎ নৌকার উপর থেকে ডাক এল, করণকুমারকে উঠে যেতে হয়।

লছমিবাই ওড়না দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে। মসৃণ পথে যাদের চলার অভ্যাস, তাদের পাহাড়ী রাস্তায় নিয়ে এলে তারা বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে।

দেওয়ালের পাশে তেপায়ার উপর বড় মোমবাতি জ্বলছে। কি স্নিগ্ধ আলো। ছিঃ, বেড়াতে এসে এভাবে কান্না তার অন্যায়। অদৃষ্টে যা হ'বার তা হোক। করণকুমারকে ছাড়া সে বাঁচবে না। যে রকম বিপদই আসুক তা সে মাথা পেতে নেবে। অনেক রাত হলো বোধহয়।

করণকুমার ফিরে আসে। তেপায়ার পাশে লছমিবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল—বজরা ফেরাতে বললাম।

করণকুমার এগিয়ে এল। কাছে যেতেই লছমিবাই এক ফুঁয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল। একরাশ অন্ধকারে ঘর ছেয়ে যায়।

লছমিবাই খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর সব চুপ। বাইরে দাঁড়ের জল কাটার শব্দ ভেসে এল। মাঝিদের কথাবার্তা চাপা দিয়ে লছমিবাই তার কণ্ঠে সুর টানল। ঠুংরি নয়, খেয়াল নয়, বহু যত্নে শেখা আপন ঘরোয়ানা, যা সে রুক্মিণীবাইকে দিয়ে যাবে। তারপর ভজন ছাড়া আর কিছু গাইবে না।

লছমিবাইএর মিষ্টি সংগীতের সুরে বজরার তরঙ্গাভিঘাত আর দাঁড় পড়ার শব্দের ছন্দপতন ঘটে বারবার।

করণকুমার লছমিবাইএর হাতখানি নিজের মুখে চেপে ধরল সংগীতের ভাবাবেগে। চোখ জড়িয়ে আসে। দু'জনে ভেসে যেতে চায় অনন্ত স্রোতে।……

সকলের অন্তরালে লছমিবাই আর করণকুমারের প্রেমের অভিসার ফুলে ফুলে মালা গেঁথে তোলে। প্রাকারে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সে গান শোনে। করণকুমারের পত্রের বদলে লছমিবাই লাল গোলাপের স্তবক পাঠায় প্রেমের অর্ঘ্য স্বরূপ।

কিন্তু কালের চক্রে নিষ্পেষিত হয়ে বসন্তের দিন ফুরিয়ে গেল। মহলের দেওয়াল নিশ্চল হলেও তার কান ছিল। পত্র সহ একদিন নয়ন ধরা পড়ল সুখলালএর হাতে। সে সন্দেহ করেছিল বহুদিন ধরে। তাই কানাড়ি পথে মাঝে মাঝে ওঁৎপেতে বসে থাকত। নয়ন পত্র ফেলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। সুখলালের হাতের বর্শা একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। অন্ধকারে নয়নকে দেখতেও পায়নি সে। পত্রখানা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রদ্যুৎনারায়ণের খাসকামরায় ছুটে গেল।

প্রদ্যুৎনারায়ণ আরাম কেদারায় বসে রাত্রির আমেজ অনুভব করছিলেন। লছমিমহলে রাত্রিটা কাটিয়ে এসেছেন। রুক্মিণীবাইএর কথা বারবার মনে পড়ছিল। লছমিবাইএর মধুর সংগীতের সংগে কি অপূর্ব নৃত্যের লহরী তুলেছিল সে। হঠাৎ একটা দ্রুত পদশব্দে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখেন সুখলাল দাঁড়িয়ে।

পত্রখানা হাতে দিলে প্রদ্যুৎনারায়ণ সোজা হয়ে সুখলালের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন।

সুখলাল বলে উঠল—হুঁজুর! শয়তানকে ধরতে পারিনি। কৈঁকামহলে নিয়ে যাচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি চিঠি খুলে ফেলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন প্রদ্যুৎনারায়ণ। সম্বোধন করেছে লছমিবাইকে। নীচে সই—। মাথা ঘুরে যায়। সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন—কানোল খাঁ কি করছিল?

—ওর কাজে আমার সন্দেহ হয় হুঁজুর।

—আচ্ছা তুই যা।

সুখলাল চলে যায়। নিজের দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য সুখলালকে তাড়াতাড়ি আড়াল করলেন তিনি।

পত্রখানা ভালভাবে মেলে ধরেন। প্রেমপত্র। হাত কাঁপতে থাকে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। এই দীর্ঘ জীবনে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটেনি কখনও। আপন মনে জড়িত স্বরে বললেন—করণকুমার ও লছমিবাইএর প্রেম তাহলে চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। আশ্চর্য! এতদিন তিনি কিছুই জানতে পারেননি!

পত্রখানার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ এক ব্যঙ্গভরা উন্মত্ত হাসি ঠোঁটে লাফিয়ে ওঠে। প্রণয়পত্র, না পাতঞ্জল মহাভাষ্য। উঠে দাঁড়ালেন। ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছে। মনে হলো, মহলের বড় বড় থামগুলো এক নিমেষে তাঁর মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে।

উত্তেজিত হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। যেন এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়িয়ে আছেন। জানালায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। দূরে সুরভিকুঞ্জ।

আজ কেন এত অস্পষ্ট দেখছেন। বিরাট পরাজয়ের একটা চাপা কান্না গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মনের দুর্যোগ আকাশেও জমেছে।

রাজা। তাঁর রাজা একি করল! বংশের সম্বল। মেজভাই সুপ্রিয় শঙ্কর মৃত্যুর সময়ে তাঁরই হাতে দিয়ে গিয়েছিল। তার অযত্নও তিনি কোনদিন করেননি। বড় আদরের তাঁর রাজা!

লছমিবাই। কত অহংকার ছিল। তাঁর লছমিবাই। সেই আগ্রা থেকে আনা অবধি তার জন্যে কিই না করেছেন। বাইজীর সংগে নন্দীবংশের ছেলের প্রেম এই প্রথম।

বিশ্বাসঘাতকতা! তাঁর সংগে সাপিণী লছমিবাই শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করল! চীৎকার করে উঠলেন—কে আছিস বাইরে!

একজন প্রহরী ছুটে এল। কম্পিত স্বরে বললেন—এখুনি নায়েবকে ডাক।

প্রদ্যুৎনারায়ণের এরকম ভয়ংকর মূর্তি সে কখনো দেখেনি। প্রহরী ছুটে চলে যায়।

একি, তাঁর শরীর কাঁপছে কেন? মুষ্টি বদ্ধ করতে গিয়ে পারলেন না। আজ মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি তিনি কত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। দাঁড়াতে পারলেন না। আরাম কেদারায় বসে পড়েন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। একি হলো! ধারাবাহিক আভিজাত্যের মাঝে আকস্মিক ছন্দপাত। নন্দীবংশে বান ঢুকেছে। এতবড় সর্বনাশ! লছমিবাই ভালবেসেছে করণকুমারকে, তাঁর রাজাকে। এত বড় দুঃসাহস। তাঁর সোনার পালঙ্কে শুয়ে তাঁরই আভিজাত্যকে ব্যঙ্গ করা? রাজাও তাকে ভালবাসে। একি তার ভালবাসা! তাই সেদিন বিয়ের কথা শুনে চমকে উঠেছিল সে। শেষে কিনা এক বাইজীকে সে ভালবাসল!

এক ডাকে সম্বিত ফিরে আসে। উঠে দাঁড়ালেন। নায়বের দিকে তাকিয়ে চলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকেন।

—হুঁজুর, আপনার শরীর কি অসুস্থ? নায়েব আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

—অসুস্থ? হ্যাঁ, দেহ নয়, এই মন। মহলগুলি কার তত্ত্বাবধানে?

গম্ভীর স্বরে নায়েব সুবন্ধনী পালিত চমকে ওঠে।

—আজ্ঞে আমিই দেখাশুনা করি।

—লছমিমহলে কে পাহারায় থাকে?

—সুখলাল, ভেন্দা আর কানোল খাঁ।

—কানোল খাঁ! চীৎকার করে উঠে প্রদ্যুৎনারায়ণ নায়েবের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—আজ থেকে লছমিমহলের প্রতিটি দোর বন্ধ হয়ে যাবে।

—হুঁজুর।

—চুলই পাকিয়েছেন নামের মশাই, বুদ্ধি আপনার হয়নি। যা বললাম, তাই করবেন। আর রাজার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। শুধু তাই নয়, তার প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক হবেন। তার কণ্ঠে লছমিবাইএর নাম উচ্চারিত হবার সংগে সংগে আমি যেন জানতে পারি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় নায়েব সুবন্ধনী পালিত। সব পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। যা এতদিন কানাঘুষা শুনে এসেছে তবে তা সত্যি।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো।

আলবোলা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল জগু। নায়েব মন্থর পদে বেরিয়ে যায় প্রদ্যুৎনারায়ণ আরাম কেদারায় বসে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন—একি হলো! আমার রাজা শেষে একি করল!

জগু আলবোলার নল হাতে তুলে দিয়ে বলল—তবু সে রাজা। আপনারই রাজা। ভুল করলেও আপনাকেই ক্ষমা করতে হবে।

—তুই সব শুনেছিস?

—হ্যাঁ। রাজাকে ডেকে আনব?

প্রদ্যুৎনারায়ণ সোজা হয়ে বসলেন।—না, ওর বেয়াদবী কিছুতেই সহ্য করব না। চাবুক মেরে চামড়া তুলে নেবো। হাঁপিয়ে পড়েন। তারপর থেমে গিয়ে বললেন—তুই যা। আমাকে একা থাকতে দে।

শূন্যে ঝালরের বাতি বাতাসে দুলতে থাকে। ঝড় উঠেছে। প্রদ্যুৎনারায়ণ আবার চোখ বুজলেন। তাঁর হৃদয়েও এক ঝড় উঠেছে। সব চিন্তা আজ যেন হারিয়ে গেছে। বন্য অশ্ব মৃত। উন্মাদ হস্তী দিকভ্রষ্ট। তাঁর দেহ আজ বলহীন। দৃষ্টি, সেও লক্ষ্যহীন। যা পুরানো আজ তা অতীত। বর্তমান স্তব্ধ। ভবিষ্যৎ নিয়ে আসছে অনিশ্চিত ভাগ্য। বাঁচা চিরন্তন প্রথা মৃত্যুও তেমনি মহাসত্য। কিন্তু—

দুহাত দিয়ে বুক চেপে প্রদ্যুৎনারায়ণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন ঝড়ের উল্লাস। এক অসহ্য যন্ত্রণা। তাঁর দেহটাকে ভেঙ্গে চুরে একাকার করে দিয়ে যেতে চায়।

সারা বাইজীমহলে সব ওলট পালট হয়ে গেল। লছমিবাইএর বেরোবার সমস্ত পথ রুদ্ধ হলো। মন্দিরে নয়, মল্লাখালে নয়, কেবল ঘরে বসে থাকা। প্রাকারে বসল প্রহরী। এক কড়া শাসনের শত হাত লছমিমহলকে ঘিরে ধরল।

সকলকে আশ্চর্য করে হঠাৎ একদিন প্রদ্যুৎনারায়ণ লছমিমহলের দোরে এসে দাঁড়ালেন। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে তিনি যেন বার্ধক্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখের নীচে মাংস ঝুলে পড়েছে। বেঁকে গেছে শক্ত অটুট দেহ। কেমন এক থমথমে ভাব সারা মুখে। চলেছেন অতি মন্থর গতিতে। কপালের বলিরেখায় অসন্তোষের ছায়া ফুটে উঠেছে।

অবশেষে প্রদ্যুৎনারায়ণ এসে দাঁড়ালেন কৈঁকা জলসাঘরে। যথা নিয়মে রুক্মিণীবাই এসে তসলিম জানালো। চোখের দিকে তাকাতে ভয়ে দুরু দুরু করে ওঠে বুক। পা জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল রুক্মিণীবাই।

সেদিন অন্য কোন পুরুষ জলসাঘরে আসার হুকুম পায়নি। আজ প্রদ্যুৎনারায়ণ নিভৃতে লছমিবাইকে চান।

লছমিবাই এল। সাজসজ্জার কোন ত্রুটি ছিল না। প্রদ্যুৎনারায়ণ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ধূম উদ্গীরণ করে চোখ বুজে কি ভাবছিলেন। ঘুঙুরের শব্দে চোখ খুললেন। নলটা সরিয়ে এক ক্রুর হাসি হাসলেন।

বহুদিন বাদে মল্লভূমিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যেন এসে দাঁড়িয়েছে। প্রদ্যুৎ-নারায়ণের তীব্র চাহনি সইতে না পেরে মাথা নোয়াল লছমিবাই। তসলিম জানিয়ে মধুর স্বরে বলল—আজ এখানে?

—তোমার বাজনাদাররা কোথায়?

—ওদের কি দরকার পড়বে?

—পড়বে না কেন? ডাক ওদের। নাচো, গাও।

—শরীর আমার ভাল নেই।

—ওসব অভিনয় ছাড়। যা পেশা তাই করতে চেষ্টা কর। আকাশের চাঁদকে ধরতে যেও না।

লছমিবাই নিজেকে সামলে নেয়। অপমানে ঠোঁট কামড়ে ধরে ক্ষণিকের জন্য। তারপর ডাকল—রুক্মিণী!

পর্দার পাশেই ছিল। বেরিয়ে এল।

—ওস্তাদকে ডাক।

রুক্মিণীবাই ছুটে চলে যায়।

প্রদ্যুৎনারায়ণ স্থির দৃষ্টিতে লছমীবাইএর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছেন। বৃদ্ধ। অতিবৃদ্ধ। এক ধাক্কায় তার কাঠামোটা হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়েছে।

এতবড় আঘাত বোধহয় প্রদ্যুৎনারায়ণ সইতে পারছিলেন না। তাঁর বড আদরের প্রিয়তমা লছমিবাই কিনা শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করল! তাঁদের বংশে এরকম আঘাত কোন বাইজী কখনো কাকেও দেয়নি।

যথাসময়ে লছমিবাই কণ্ঠে ঠুংরী চাপালো। উঠে পডে নাচের ভঙ্গিমায় আসর জমাতে চাইলো। আজকের জলসা যেন শ্মশানযাত্রী শোক-সন্তপ্তদের মিথ্যা প্রবোধের মত। প্রদ্যুৎনারায়ণ সুরার পাত্র ঠোঁটে তুললেন কিন্তু পাত্রের পর পাত্র শূন্য করলেন না। বাহবা দিলেন না।

বাইজীশ্রেষ্ঠা লছমিবাইএর দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন এড়ালো না। প্রদ্যুৎনারায়ণের চিন্তান্বিত মুখখানি বারবার তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল

গান শেষ হয়ে গেল। ক্লান্ত লছমিবাই প্রদ্যুৎনারায়ণের কাছে বসে পড়ে। পেয়ালায় সুরা ঢেলে দিতে গেলে প্রদ্যুৎনারায়ণ তার হাত খপ্ করে ধরে ফেলে বলে উঠলেন—থাক সুন্দরী। অভিনয়ে তোমরা ওস্তাদ, জানি। আজ কিন্তু কিছুই জমাতে পারছো না। তারপর পাশে ঝুঁকে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—সব গান, তোমার সব গান যে নিজের খাসকাম্‌রায় উজাড় করে দিয়ে এসেছো!

অন্য সময় হলে লছমিবাই হয়তো অনেক কিছু বলে বৃদ্ধের উপর টেক্কা মারতো। কিন্তু আজ সে-শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে, কেউ যেন তার গলা টিপে কথা কেড়ে নিয়ে যেতে চায়। তবু বলল—একি কথা বলছেন রাজাবাহাদুর?

—ঠিকই বলছি। তোমার বাজনাদারদের বিদেয় কর। লছমিবাইএর ইঙ্গিতে সকলে চলে যায়। প্রদ্যুৎনারায়ণের দৃঢ় মুষ্টি থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয় লছমিবাই। সে যা আশংকা করেছিল তা অমূলক নয়। তাহ'লে প্রদ্যুৎনারায়ণ তাদের গোপন অভিসারের কথা সব জেনেছে। তার হৃদয়ে এক দমকা হাসিতে মুখাবয়ব কঠিন হয়ে ওঠে। সে যা করেছে, তা ঠিকই করেছে। মৃত্যুর জন্য সে সব সময় প্রস্তুত।

প্রদ্যুৎনারায়ণ হঠাৎ হাত দিয়ে লছমিবাইএর চিবুক তুলে ধরে বললেন—ঠিকই বলেছি লছমিবাই। চোখে সুর্মা মেখে সকলের চোখে এতদিন ঠুলি পরিয়ে এসেছ। এতে তোমার পারদর্শিতা স্বীকার করি। কিন্তু ভুলে যেও না, আমিও ঐ ঠুলি পরাবার জন্য সেরা বাইজীদের আহ্বান জানিয়েছি। অনেকে তা পরিয়েছে আর এখনো পরাচ্ছে। কিন্তু তোমার মত কারো দুঃসাহস দেখিনি লছমিবাই।

—কিসের দুঃসাহস? স্বর কেঁপে যায়।

—সকলের কাছে ভালবাসা হলেও তোমাদের মত বাইজীদের কাছে এ দুঃসাহস ছাড়া আর কি বলব। হাত সরিয়ে নিলেন।

প্রদ্যুৎনারায়ণের কণ্ঠে একটা কিসের যেন ইঙ্গিত। এক অমঙ্গল পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। লছমিবাইএর বুকের কোণে এক অজানা আশংকা কেমন ধারা গুর গুর করে উঠল। অতিকষ্টে হাসি টেনে বলল—আমি মেয়ে, ভুলে যাবেন না।

—কিন্তু তাই বলে অতিনারী হ'তে চেও না। মশাল নিয়েই ঘুরে বেড়াতে পার। প্রদীপ হাতে নেবার অধিকার নেই।

—আমারও তাই ধারণা ছিল রাজাবাহাদুর। কিন্তু ভালবাসার প্রদীপ হাতে নেবার অধিকার সকলেরই আছে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ রুদ্ধ আক্রোশে বলে উঠল—সেই হাতকে আমি এই পায়ে দলে মেড়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবো।

এক উত্তেজনায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন প্রদ্যুৎনারায়ণ। থমথম করতে থাকে ফেঁকা জলসাঘর। লছমিবাইও যেন শক্তি হারিয়ে ফেলে। সব চিন্তা গুলিয়ে যায়।

—লছমিবাই!

প্রদ্যুৎনারায়ণের গম্ভীর ডাকে চমকে উঠল লছমিবাই। বুক থেকে নিঃশ্বাস টেনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চোখের উপর চোখ রাখে।

রুক্মিণীবাইএর বয়েস কত?

লছমিবাইএর মুখে কে যেন এক চড় বসিয়ে দেয়। এক নারীর সামনে অন্য নারীর মূল্য যাচাই! অসহ্য। চোখ থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে এল একটুকরো আগুন। যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল—আঠারো।

—শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে চলবে না?

—রাজাবাহাদুর! এবার লছমিবাইএর কণ্ঠে এক ভিন্ন সুর প্রকাশ পায়। প্রদ্যুৎনারায়ণ এতে বিচলিত না হয়ে উত্তর দিলেন—তুমি যখন থাকবে না তখন তো ওকেই আমার চাই।

—কিন্তু সে কি পারবে আপনাকে ভোলাতে?

—কেন পারবে না? চীৎকার করে ওঠেন প্রদ্যুৎনারায়ণ। মুহূর্তে হিংস্র হয়ে ওঠে বৃদ্ধ শান্ত মানুষটি। শূন্যে ঝাড়বাতির আলোগুলি একবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাকিয়া ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন—না পারলে এত মেহনত কেন? না, আমি বুড়ো বলে মন উঠবে না? মানে সেও সুযোগ পেলে তোমার মত বিশ্বাসঘাতিনী হবে।

—রাজাবাহাদুর! দৌড়ে গিয়ে দোরের পর্দাটা ধরে ফেলে। থরথর করে কাঁপতে থাকে লছমিবাই।

—ব্যাঘ্র বৃদ্ধ হলে তার থাবা হয়তো দুর্বল হয়ে পড়ে। একবার না পারুক, দু'বার না পারুক কিন্তু একবার সে আঘাত করবেই। তার লক্ষ্য যে অব্যর্থ সে কি তুমি অস্বীকার কর? শেষে কি না সাপের মাথায় পা দিলে? এত বড় সাহস তোমার?

কর্কশ চীৎকারে ঘরের চারদিকের দেওয়াল চমকে উঠল

ভীতা, অপমানিতা লছমিবাই দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ল। প্রদ্যুৎনারায়ণ আশ্চর্য হলেন। এরকম কান্না সে কখনো দেখেনি। একি ভালবাসার কান্না!

—এখন তুমি যেতে পার—যাও।

লছমিবাই সেই অবস্থায় অন্দরমহলে ছুটে চলে গেল। পশ্চাতে রেখে গেল একরাশ ঘুঙুরের ঝংকার। নন্দী প্রাসাদের, জলসাঘরের একছত্রী সম্রাজ্ঞী লছমিবাই এক মুহূর্তে ভিখারিণী হয়ে গেল।

প্রদ্যুৎনারায়ণ এবার উঠে পড়ে হাঁক দিলেন—কানোল খাঁ! তারপর আপনমনে বলে চললেন—নেমখারাম! ডাকাতি করে মরতে গিয়েছিল। উদ্ধার করে আশ্রয় দিলাম। আমার নিমক খেয়ে আমারই সংগে শয়তানি?

কানোল খাঁ ঘরে ঢুকে কুর্নিশ করে প্রদ্যুৎনারায়ণের চোখের উপর চোখ পড়াতে ভয়ে শিউরে উঠল।

বহুদিন বাদে খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এক ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র। ঘরময় পায়চারি করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার চীৎকার করে ডাকলেন—সুখলাল, ভেন্দা!

হঠাৎ হাওয়ার ধমকে ঝালরের বাতি হেলতে দুলতে থাকে। দূর থেকে ভেসে এল অলস স্বরে সংগীতের সুর। রুক্মিণীবাই গাইছে।

এসে দাঁড়াল ভীষণাকৃতি দুই লাঠিয়াল। ঝাঁকড়া চুলে বাঁধা লাল ফিতে। পরণে রক্তবর্ণ কাপড। হাতে রূপোর বালা। কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু সুবিশাল পেশীগুলি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। স্থির অর্থহীন দৃষ্টি। তাদের কাছে ন্যায় অন্যায় বলে কিছুই নেই।

প্রদ্যুৎনারায়ণ থমকে দাঁড়াল। তারপর ভেন্দার দিকে তাকিয়ে বলল—কানোল খাঁ ইনাম পেয়েছে। ওকে একশো ঘা বেত মেরে আটকে রাখ—কুত্তা কোথাকার।

কানোল খাঁ আর্তনাদ করে প্রদ্যুৎনারায়ণের পা জাপটে ধরল। হুজুর, বেইমানি আমি করিনি। আমার কথা শুনুন।

—চুপ কর্ হারামজাদা। এই, নিয়ে যা।

ভেন্দা কানোল খাঁকে জোর করে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায়। কানোল খাঁ কোন বাধা দিলে না। দস্যু পাঠান কানোল খাঁ সেদিন কেমন অন্যায়ের চাবুকে ছোট্ট এক শিশুর মত হয়ে গিয়েছিল।

বাইরে বেরিয়ে প্রদ্যুৎনারায়ণ সুখলালকে বলল—আজ রাতেই কাজ হাসিল করতে হবে। বহুদিন তো খুনখারাপি করিসনি, কানোল খাঁকে চাবুক মেরে লাল গড়ে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবি। লোকজন নিয়ে যাস—যা।

সুখলাল কিছুদূর গিয়ে প্রদ্যুৎনারায়ণের ডাকে থমকে দাঁড়ায়।—তুই আজ থেকে লছমিমহল পাহারা দিবি। দেখিস্ লছমিবাই যেন কোথাও উড়ে না যায়। জান দিবি কিন্তু দৃষ্টি হারিয়ে ফেলিস না, যা।

দ্রুত ঘটনার সংগে সুখলাল যেন পা ফেলে চলতে পারছিল না। বোকার মত তাকিয়ে থেকে জোরে বলে উঠল—যে আজ্ঞে। বুকে হাত ঠুকে দৌড়ে চলে যায়।

হঠাৎ প্রদ্যুৎনারায়ণ হেসে উঠলেন। অট্টহাসিতে সারা মহল কেঁপে উঠলো। সুপ্ত রক্ত যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু থেমে যায় এক মিষ্টি আওয়াজে। ঝালরের বাতির কাটগ্লাসগুলি বাতাসে নানা ধ্বনিতে বেজে উঠেছে। তার রাজা। বংশের শেষ দু'টি প্রদীপ—রাজা আর ছোট ভাইএর ছেলে কেশব। কেশব এখন বালক। তাঁর রাজা একি করল! নিবিয়ে দেবেন, পুড়িয়ে ফেলবেন প্রদীপের দু'টি সলতের মধ্যে একটিকে। হ্যাঁ, ক্ষমা তিনি কিছুতেই করবেন না।

লছমিমহলে নেমে এল যবনিকা। লছমিবাই সুরভিকুঞ্জে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে খোঁজে সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রাকার শূন্য। যমদূতের মত প্রহরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আজ বন্দিনী। করণকুমার নজরবন্দী। বসে পড়ে থামে মাথা রেখে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। সে মরবে। কিন্তু করণকুমারের দেহকে স্পর্শ করতে দেবে না। যতই অত্যাচার হোক, তার প্রেমকে সে বুকে তুলে রাখবে। তার দেহটা নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কেউ তার প্রেমকে মুছে ফেলতে পারবে না। গুছিয়ে নিল পোশাক, লুকিয়ে ফেলল বীণা। মিষ্টি কণ্ঠে জেগে উঠল মেঘমল্লার। হার সে মানবে না। কানে ভেসে আসে এক সতর্ক ধ্বনি। গোপন খেলার শেষ হয়েছে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতেই হবে তাকে।

দ্রুত ঘটনা হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়াল। লছমিমহলে সতর্কতার সীমা নেই। প্রতিটি পথ বন্ধ। মন্দিরে যাওয়ার পথও পাথর দিয়ে গেঁথে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। আজ রুক্মিণীবাইএর যা স্বাধীনতা আছে লছমিবাইএর তার এক কণামাত্রও নেই। করণকুমারেরও নিজ মহল আর লেহারাবাইএর মহল

ছাড়া সব পথ বন্ধ। লছমিবাইকে দেখার কোন সুযোগই রাখেনি। দু'টি বদ্ধ প্রাণ হঠাৎ যেন কড়া শাসনে স্তব্ধ হয়ে গেল। করণকুমার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারত কিন্তু লছমিবাইএর দিকে তাকিয়ে তা সংবরণ করে নিয়েছে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে প্রদ্যুৎনারায়ণের মনে হলো, এ ঠিক হলো না। শান্ত মনের সুবুদ্ধির পরামর্শ। নিস্তরঙ্গ জলের ছলছল হাসি তিনি অনুভব করলেন। তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত। প্রেমের বাঁশী যতই তীব্রভাবে বাজুক না কেন সে বেসুরো হয়ে পড়েছে। লছমিবাইকে তিনি মধুর সম্বোধন করতে পারেন কিন্তু সেই সম্বোধনটা কি তার কানে মধুর হয়ে ধরা পড়বে? তিনি ইচ্ছে করলে লছমিবাইকে এখান থেকে সুদূর বর্ধমানের শাবলি বাগানবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে পারেন। কঠিন শাসনের বেড়াজালে পড়ে লছমিবাই হয়তো তার কাছে থাকবে কিন্তু দুরন্ত যৌবনের আকাংক্ষা বারবার হতাশায় ভেঙ্গে পড়বে না কি? লছমিবাইএর বীণা ঝংকৃত হবে। কণ্ঠে ভেসে উঠবে বসন্ত রাগ, কিন্তু সংগীতের আহ্বান? করণকুমারের কাছেই ফিরে যাবে। বাস্তবে দু'জনে দূরে থাকবে পরিবর্তে হৃদয়ে হবে তারা আরো নিবিড়। সন্দেহে দোদুল্যমান ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে প্রদ্যুৎনারায়ণ বাঁচতে চায় না। দেখা যাক। এমনিভাবে বদ্ধ জীবনে যদি পরিবর্তন আসে। তাঁর রাজাকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। লছমিবাই এই দুঃসহ জীবনের চাপে পড়ে ভুল বুঝে যদি ক্ষমা চায়, তা তিনি ক্ষমা করবেন।

ক্রমে ঘটনার চক্রও থেমে যায়। বিরাট অগ্নুৎপাত ঘটিয়ে আগ্নেয়গিরি শান্ত হয়ে আসে। আজকাল করণকুমার কল্পীমহলে পড়ে থাকে। সুরায় ভিজিয়ে রাখে অশান্ত মনটাকে। লেহারাবাই বাধা দেয় না। নাচে গানে তার মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন পরিবর্তন হলো না। কত রাত্রিতে লেহারাবাই করণকুমারের পায়ে মাথা রেখে শুধু কেঁদেছে। নেশা পাতলা হয়ে এসেছে। হঠাৎ সজাগ হয়ে দেখেছে, লেহারাবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। করণকুমার এ সইতে না পেরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বার বার বলেছে—আমি তোমাকে ভালবাসি না—বাসিনা। তবু লেহারাবাই করণকুমারের সঙ্গ ছাড়েনি। কখনো কখনো উঠে পড়ে সুরাশূন্য পেয়ালা দু'হাতে ধরে সুন্দরভাবে বাজিয়ে আস্তে আস্তে গেয়েছে। করণকুমার মুখ ফিরিয়ে বিস্ময়ে শুনেছে। দুর্বোধ্য ভাষায় অদ্ভুত সুরের গান। মনে হলো সুদূর ইরানের একটি ছোট্ট মেয়ে এমনিভাবে তার মন ভোলাতে চেষ্টা করছে।

সেদিন লছমিবাই অলিন্দের একটি ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিল তার অদৃষ্টের কথা। দেশ, পিতা, মাতা, কারো কথা ভাল করে মনে নেই। হ্যাঁ, আলতাফই তার পিতা। কত যত্নে গান শিখিয়েছে—নাচ শিখিয়েছে। একদিন প্রত্যুৎনারায়ণ প্রচুর অর্থে তাকে কিনলো। আলতাফের কথামত সেদিন এখানে যদি না আসত তাহলে ভালই হতো। না-না, তাহ'লে তো করণকুমারকে সে পেতো না।···

হঠাৎ চমকে উঠল। দূরে স্নান ঘর থেকে রুক্মিণীবাইএর হাসির টুকরো ভেসে এল। স্নান করছে সে। দাসীরা ঘিরে তার সংগে রসিকতা করছে। লছমিবাই হাসল। নজর গেল নিজের মলিন বেশের দিকে। কতদিন সে ভালভাবে স্নান করেনি। আয়নাতে মুখ দেখা ভুলে গেছে। সন্ধ্যা হতে বাকী নেই। ঝাড়ে এখনও চেরাগ জ্বলেনি। কতদিন—কতদিন হলো সে তার প্রিয়তমকে দেখেনি। সংবাদ নেওয়ার উপায় নেই, এইভাবে দুর্বিষহ জীবনকে বয়ে কি হবে? পাগল হয়ে যাবে সে। দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে আকুল হয়ে বলে উঠল—আমার কেউ নেই। হঠাৎ এক বাঁশীর শব্দে মুখ থেকে হাত সরায়। বহুদূর থেকে বাঁশীর সুর করুণ স্বরে ভেঙ্গে পড়ছে। কে বলে তার কেউ নেই? করণকুমার তো আছে। সে তো ছেড়ে চলে যায়নি। তার জন্যই তো সব সম্মান, সুখ বিসর্জন দিয়েছে। দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সুড়ঙ্গের দোরের দিকে। মল্লাখালে যাওয়ার গুপ্তপথ। একটা বড় তালা ঝুলছে। চাবিটা কার কাছে? ম্লান চোখ ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কে যেন হেসে উঠল। চমকে উঠে সরে দাঁড়ায়। রুক্মিণীবাই আসছে। সেজেছে। আজ থেকে প্রদ্যুৎনারায়ণের প্রধানা বাইজী। আগুন লেগেছে তার সর্বাঙ্গে। লাল আর লাল, লাল ঘাগরায় রক্ত গোলাপ পাপড়ি মেলেছে। লাল পোশাক পরতেও ভালবাসে সে। লছমিবাইএর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার খুঁৎগুলি ধরা-পড়ে। রুক্মিণীবাই এসে দাঁড়াল। প্রধানা বাইজী হবার পর লছমিবাইকে তসলিম জানাতে এসেছে।

লছমিবাই বলল—অত লম্বা করে সুর্মা টেনেছিস কেন? ছোট কর। হাতের লাল পাথরের চুড়ি খুলে হলুদ রঙের পাথরের চুড়ি পরে নে। কানে লম্বা ঝুমকো খুলে ফেলে চুনি-পান্নার ঐ ছোট্ট ঝুমকো লাগিয়ে নিস্। রুক্মিণীবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলতে গিয়ে আবার এক ডাকে থমকে দাঁড়াল।—অতো জোরে হাঁটিস কেন, পা গুণতে শিখিসনি? যা।

রুক্মিণীবাই চলে যায়। তারপর এসে দাঁড়াল চুমকি। রুক্মিণীবাইএর সহকারিণী। লজ্জা এখনো পুরামাত্রায় রয়েছে। সাজার কৌশল এখনো সে আয়ত্ত করতে পারেনি। তবু তার মুখের দিকে তাকালে প্রতিটি লোক একবার থমকে দাঁড়াবে।

চুম্‌কিকে তার বড ভাল লাগে। তার হাসিটা ভারি সুন্দর! ঠোঁটে ফুটে ওঠার অনেক আগে চোখদু'টি উথলে ওঠে হাসির জোয়ারে।

লছমিবাই তার গলার দিকে তাকিয়ে বলল—ওটা কি পরেছিস?

চুম্‌কি হাসল।—সাদা পাথরের মালা।

—দূর, এদিকে আয়। নিজের গলা থেকে মুক্তোর মালা খুলে চুম্‌কির গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল—এবার তো মানিয়েছে। নাচতে জানিস?

চুম্‌কি মাথা নেড়ে বলল—না।

—গাইতে?

—না।

—খেতে জানিস কেবল।

চুম্‌কি হেসে উঠল। লছমিবাই গালটা টিপে দিয়ে বলল—ঐ হাসিতেই অনেক হবে—যা।

চুম্‌কি চলে যায়। লছমিবাই মনে মনে ঠিক করে ফেলে। ওকে দিয়েই চাবিটা চুরি করিয়ে আনতে হবে। ওকেই পাঠাতে হবে করণকুমারের কাছে। নতুন পথ তাকে বেছে নিতেই হবে। এই দুর্বিষহ, অপমানিত জীবন অসহ্য। এখান থেকে পালাতে হবে। একবার আগ্রায় আলতাফের কাছে পৌঁছতে পারলেই হ'ল। ব্যস—কারো সাধ্যি নেই তার কেশ স্পর্শ করে। করণকুমারকে নিয়ে তারপর সোজা আরও পশ্চিমে চলে যাবে। ঘর বাঁধবে। আবার নতুন করে বাঁচবে। হঠাৎ খেয়াল হয়—সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

দোলনায় বসে এক অসহ্য অস্থিরতায় লেহারাবাই ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। নয়ন বলেছে লছমিমহল থেকে একজন নতুন দাসী নাকি করণকুমারের সংগে সাক্ষাৎ করেছে। নিশ্চয় কিছু সংবাদ বয়ে নিয়ে গেছে। প্রদ্যুৎনারায়ণ পারবে না। লছমিবাই শুধু রূপসী নয়। বুদ্ধিমতীও বটে। করণকুমারও তার জন্য উন্মাদ। নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সে কতবার লছমিবাইকে ডেকেছে। উঃ— লেহারাবাই আর সইতে পারে না। বারবার পরাজয়। দুর্ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর আঘাত, হঠাৎ দুলেরার ডাকে চিন্তায় বাধা পড়ে।

—এ কি, আজ সাজলে না?

—সাজব। তুই যা। আমাকে বিরক্ত করিস্ না।

তুলেরাও ঠোঁট উলটে বিরক্তি প্রকাশ করে চলে যায়।

লেহারাবাই উঠে দাঁড়াল। এবার শেষ চেষ্টা করবে। দেখা যাক্ লছমিবাইএর বুদ্ধির সংগে একবার প্রতিযোগিতা করে। করণকুমারকে তার চাই-ই।

আর নয়, এবার সাজতে হবে। নয়নের সংগে আজ তার হবে অভিসার। নয়নই তার শেষ আশা। সে পারবে তাকে সাহায্য করতে। সে যে তার প্রেমে পুড়ে মরছে। সেই আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে লছমিবাইকে। স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল। আজ সে সাজবে। যে সাজে নয়ন উন্মাদ হবে। তার রূপের ছটায় সে আচ্ছন্ন হবে। মনের সহস্র সর্পের প্রতিহিংসার ফণা হিস্ হিস্ শব্দ তুলে ধরল। সে ইরানী। প্রতিহিংসা তো ঘরোয়ানার মত তাদের নিজস্ব। কোমরে ছুরি রাখে না। মনে ঝুলিয়েছে রক্তলোলুপ তরবারি। দূরে প্রদীপের শিখা কি ভাবে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

পাথরের চৌবাচ্চাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল লেহারাবাই। তার মনের সংগে সারা শরীর জ্বলছে। জুড়িয়ে যাক আতরমাখা জলে। দেওয়াল নানা ধরনের কাচের টুকরোয় ঢাকা। শূন্যে ছোট্ট ঝালরের বাতির আলো তাতে প্রতিফলিত হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। লাল, নীল হলদে কাচগুলি জ্বলছে। যেন হাজার চোখ মেলে তার অপরূপ দেহকে বিস্ময়ে দেখছে।

লেহারাবাই সাজল। সর্বনাশা রূপ ফুটে উঠল তার সারা দেহ ঘিরে। ওড়না তুলে নিয়ে জানালায় এসে দাঁড়াল। উদ্যানে নয়ন এখনও আসে নি। আবার ফিরে আসে দোলনায়। দুলে ওঠে তার সুন্দর দেহ। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয়। গুন গুন করে গাইতে থাকে। পর্দার ফাঁক দিয়ে তুলেরা কয়েক বার দেখে গেছে। সাজের বাহারে চমকে উঠেছে। সন্দেহ হয়। কেন যেন এই লেহারাবাইকে সে বড্ড ভয় পায়। জাতে ইরানী। সাপের জাত। হাসির মাঝে লুকিয়ে থাকে নিষ্ঠুর ফন্দী। তবু এই হতভাগিনী লেহারাবাই সত্যি করে করণকুমারকে ভালবেসেছিল। ছোটবাবু একটুখানি করুণা করলেই যথেষ্ট হতো। ব্যর্থতায় আজ তার এক অন্যরূপ।

হঠাৎ লেহারাবাই উঠে দাঁড়ায়। চলতে গিয়ে সুরার পাত্রে চোখ পড়াতে থমকে দাঁড়াল। গাঢ় লাল সুরা। বুকের প্রতিহিংসাকে লাল সুরায় রাঙিয়ে

দোরে গিয়ে দাঁড়াল। কি মনে করে ফিরে এল। দেওয়ালে গোপন এক খোপর থেকে বের করল খাপে মোড়া একটি ছোরা। বাঁকানো ছোরাটা দেখলে মনে হয় এ-দেশীয় নয়। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে ঘাগরার আড়ালে, তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল। দুলেরা দাঁড়িয়ে।

—লক্ষ্য রাখিস। কর্তা এলে সুরা এগিয়ে দিয়ে আমাকে খবর দিস্।

—রাত তো বেশী হয়নি। এখন না গেলেই পারতে।

—আমার ইচ্ছে। দীর্ঘ দেহখানি জ্যা ছাড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এক ক্রোধে নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে ওঠে। বলল—আমি যা বললাম, তাই করবি।

দুলেরা ভয়ে সরে দাঁড়ায়। লেহারাবাই তড়িৎ গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

দুলেরা তাকিয়ে শুধু বলল—তীর, কার বুকে বিঁধবে কে জানে ?

লেহারাবাই উদ্যানে ঘুরে বেড়ায়। নয়ন এখনও আসেনি। ফোয়ারার পাশে গিয়ে বসল। টলটল করছে জল। রঙিন মাছের ঝাঁকের সে কী ছোটাছুটি। জায়গায় জায়গায় আলো। নিজের মনে ঠিক করে ফেলে কি করবে। অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়।

হঠাৎ শুকনো পাতার শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখে নয়ন দাঁড়িয়ে। লেহারাবাই উঠে দাঁড়ায়। সাদা কুর্তির উপর পশ্চিমা পাঞ্জাবী পরেছে। হাতে ছোট ভল্ল। বড় চোখে বিস্ময়ভরা চাহনি। লেহারাবাই আজ ভালভাবে দেখল। কে বলে নয়ন কুৎসীত? হতে পারে কালো। লেহারাবাইএর রূপে নয়নেরও চোখ ঝলসে যায়।

—এত সাজ সাজতে হয় ?

—কেন নয়ন ?

—সবে ফুলেরা পাপড়ি মেলেছে, তোমাকে দেখে আবার লজ্জায় গুটিয়ে নেবে।

—তাই নাকি ? এস। ঐখানটায় চল। তোমার সংগে আজ আমার শেষ কথা হবে।

নয়ন দাঁড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে চোখে নেমে এল বেদনার ছায়া, হারানোর আশংকায় বুকটা দুরু দুরু করে উঠল।

একটু আড়ালে গিয়ে বসল দু'জনে। নয়ন একটু সরে বসে। লেহারাবাই হাত বাড়িয়ে নয়নের হাত ধরে বলল—একটু কাছে এস। এই আমাদের শেষ দেখা নয়ন। লেহারাবাইএর কণ্ঠে হতাশার সুর।

—কেন লেহারা ? এ-কথা বলো না।

—ঠিকই বলেছি। কাল থেকে ওরা আমাকে বন্দিনী করবে, নয়তো—।

নয়ন উত্তেজিত হয়ে ওঠে।—বল আমাকে, কী হয়েছে।

—লছমিবাই জানতে পেরেছে।

—কী জানতে পেরেছে ?

—আমি যে তোমাকে ভালবাসি। তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য বড়কর্তাকে বলে দেবে বলে ঠিক করেছে। আমাকে বাঁচাও নয়ন। চল পালিয়ে, আজ শেষ রাতেই।

নয়ন লেহারাবাইএর হাত ধরে ফেলে বলে উঠল—সেই ভাল, চল পালিয়ে। পালিয়ে যাওয়ার পথ আমি জানি।

—কিন্তু কি করে পালাবে নয়ন ? আজ জলসা বসেছে। সেখানেই লছমিবাই বড়কর্তাকে সব বলে দেবে। শেষরাতে পালাবার আগেই জানতে পেরে যাবে।

—তবে উপায় ?

—উপায় আমি বার করেছি। আমি সব গুছিয়ে ফেলে পুরুষের পোশাক পরে তৈরী হয়ে থাকব। বড়কর্তাকে বলার আগেই লছমিবাইকে শেষ করে দিতে হবে।

নয়ন বিস্ময়ে তাকায়। শূন্যে আকাশে মেঘ জমেছে।

লেহারাবাই নয়নের কাঁধে মাথা রাখে। হাত দিয়ে তার মুখ টেনে বার বার আদর করে বলে চলে—আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচাব না। আমাকে বাঁচাও নয়ন।

নয়ন তবু বলে—তার চেয়ে চল না এখুনি পালিয়ে যাই।

লেহারাবাই মাথা নাড়ে। রাত না হলে আমার সরে যাওয়া মুশকিল। ভুলেরা পথ আগলে বসে। শেষরাত হলে ও ঘুমিয়ে থাকবে। একটুও টের পাবে না।

—বেশ, তাই হবে। কিন্তু—।

—কিন্তু নয় নয়ন। ভাবলে সময় শেষ হয়ে যাবে, যা করবে এখুনি কর। এই নাও।

নয়ন তাকায়। লেহারাবাইএর হাতে খাপে ঢাকা ছোরা। সে বলল—তুমি না পুরুষ। সুযোগ থাকলে আমিই করতাম।

নয়ন কম্পিত হাতে ছোরাটা তুলে নেয়।

—কথাবার্তা আজ এই পর্যন্ত। সময় নষ্ট না করে তুমি এগিয়ে যাও। নয়নের গালে একটু আদর করে লেহারাবাই উঠে দাঁড়ায়।

নয়নকে উঠে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু বিবেকের শাসন থেকে তখনো সে মুক্তি পায়নি।

লেহারাবাই এগিয়ে এল। হঠাৎ বলল—তার চেয়ে একটা কাজ কর নয়ন, ঐ ছোরাটা আমার বুকে বসিয়ে দাও।

নয়ন চমকে ওঠে। ভাববার সময় আর নেই। এতক্ষণে হৃদয়ে জেগে উঠেছে মৃত্যুর চঞ্চল পদধ্বনি। লেহারাবাই এবার নয়নের দেহ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখে।—নয়ন, তোমার লেহারাবাই তোমারই। যা হয় কর। জলসা বসার আগে কাজ হাসিল করা চাই। লছমিবাইএর মৃত্যুর হৈ-চৈএর মধ্যে আমাদের পালাতেই হবে।

নয়ন কঠিন হয়ে ওঠে। হাতের ভল্ল গাছের আড়ালে রেখে ছোরাটা লুকিয়ে ফেলে বলল—তুমি ঠিক হয়ে থেকো। আমি চললাম। অপেক্ষা করো।

নয়ন অদৃশ্য হয়ে যায়। লেহারাবাই দাঁড়িয়ে থাকে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়। এতদিন পরে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হতে চলেছে। লছমিবাই আর নয়ন, দু'জনেই সরে যাক এই পৃথিবী থেকে। করণকুমারকে তার হাতের মুঠোয় আনবেই। তাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তার কাছ থেকে।

হঠাৎ মেঘের ডাকে সে চমকে উঠল। ঝড় উঠবে। এ যে ঝড়ের রাত। নয়ন এতক্ষণে হয়তো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সত্যি নয়ন যদি তার কাছে এসে দাঁড়ায়? পালাবে? কোথায়! না-না, করণকুমারকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে? শেষ পর্যন্ত বেচারা নয়ন একটুও জানতে পারল না যে লেহারাবাই কোনদিনই তাকে ভালবাসেনি। একটু করুণা মেশান হাসি হাসল লেহারা।

মহলে ফিরে এল। দুলেরা দাঁড়িয়ে। তার চোখে কিসের এক সন্দেহ। লেহারাবাই তার দিকে তাকাতে পারে না। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু দুলেরার ডাকে থেমে যায়।

—নয়ন কোথায়?

—কেন?

—কোথায়, বল না।

—মরতে গেছে।

—কোথায়?

—জমের দুয়ারে। খিল খিল করে লেহারাবাই হেসে উঠে দৌড়ে চলে গেল।

ঝড় উঠেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে মাঝে মাঝে। প্রদ্যুৎনারায়ণ ঘরময় পায়চারি করছিলেন। করণকুমারকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আসেনি। অভিমান হয়েছে? লজ্জাও হতে পারে। জানালায় এসে দাঁড়ালেন। ঝড়ের ঝাপটায় সুরভিকুঞ্জ দেখা যায় না। কতদিন হয়ে গেল, লছমিবাইকে তিনি দেখেননি। এখনও যদি সে ক্ষমা চায় তিনি ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু সে চায়নি, ডাকেও নি তাঁকে।

এক আর্তনাদে প্রদ্যুৎনারায়ণ চমকে উঠলেন।

—রাজাবাবু! মেয়েলি ক্রন্দন। ঘুরে দাঁড়ালেন। একি!

শীমূলা দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আলুথালু বেশ। পাগলিনীপ্রায়। পিছনে ভেন্দা। তার দুই হাতে শায়িত রক্তাপ্লুত একটি মৃতদেহ।

প্রদ্যুৎনারায়ণের বুকটা একবার ধড়াস করে উঠল। টলতে থাকে সারা দেহ। তবু শক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন—কে?

শীমূলা পাগলের মত মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠল—আমার ছেলে, নয়ন।

ভেন্দা এবার বলে উঠল—এই সেই। মারতে গিয়ে নিজে মরেছে হুজুর।

—কাকে মারতে গিয়েছিল?

শীমূলা বলে উঠল—মারতে যায়নি। লছমিবাইকে মারতে পাঠিয়েছিল।

—কেন? প্রদ্যুৎনারায়ণ এবার ক্রোধে ফেটে পড়েন।

—রাজাবাবু! তবে শুনুন। শীমূলা বলে চলে—লেহারাবাই বাগানে নয়নের সংগে দেখা করে বলতো সে ওকে ভালবাসে। একবার নয় কতবার দেখা করেছে। নয়ন তাই বিশ্বাস করে তার রূপে ভুলে গিয়েছিল। সেই ওর কাল করলে বড় হুজুর!

—তা লছমিবাইকে মেরে লেহারাবাইএর স্বার্থ কি?

—স্বার্থ, আপনার রাজাকে—। শীমূলা আর বলতে পারে না। আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে।

ভেন্দা নয়নের মৃতদেহ মাটিতে রেখে একটা বাঁকানো ছোরা প্রদ্যুৎনারায়ণের কাছে তুলে ধরে।

—এই ছোরা কার? প্রদ্যুৎনারায়ণ প্রশ্ন করেন

—এটা নয়নের নয় হুজুর। লেহারাবাই দিয়েছিল মারবার জন্যে। শিমূলার মলিন চোখ দু'টি থেকে হঠাৎ আগুনের হলকা ঠিকরে বেরিয়ে আসে। চীৎকার করে জবাব দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ এবার ভেন্দাকে ইশারা করলেন নয়নের মৃতদেহটা তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভেন্দা বেরিয়ে যায়।

প্রদ্যুৎনারায়ণ শীমূলাকে সস্নেহে বললেন—কাঁদিস্ নে। তুই যা। তোর কান্না আমি সইতে পারছি না। ওঠ শীমূলা। এর বিচার আমি করব। তুই যা। ওঠ।

শীমূলা উঠে বসে। তারপর চীৎকার করে বলে উঠল—ভগবান এর বিচার করবে। আমি যদি মা হই আমার অভিশাপ ফলবেই। নয়ন! ফিরে আয় বাবা—নয়ন! শীমূলা দৌড়ে চলে যায়। তার আর্তনাদ দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ঝড়ের শব্দে হারিয়ে গেল।

প্রদ্যুৎনারায়ণ মুহ্যমানের মত দাঁড়িয়ে থাকেন। তার সব ভাবনা জট পাকিয়ে যায়।—ভগবান বিচার করবে! না-না, নন্দীবংশে ভগবানের বিচার নেই। সে বিচার তাঁকেই করতে হবে। এত বড় সাহস। বাইজীদের এত বড় দুঃসাহস!—কে আছিস বাইরে! গর্জে উঠলেন প্রদ্যুৎনারায়ণ।

প্রহরী এসে ঢোকে।

—ডাক সুখলালকে।

বাইরে বাজ পড়ল। সহসা ঝড়ের ঝাপটায় মহলে গুম গুম আওয়াজ ওঠে।

সুখলাল এসে দাঁড়ায়।

প্রদ্যুৎনারায়ণ তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন—আজ রাতেই আরও একজনকে বিদায় দিতে হবে। ভেন্দার কাছে সব শুনে নিয়ে এখুনি চেত্‌লী গলিতে যা। বুড়িকে সব ঘটনা বলে লেহারাবাইএর কাছে পাঠিয়ে দে।

—চেত্‌লী গলি! আঁৎকে উঠে সুখলাল।

—হ্যাঁ, বহুদিন বাদে। আজকে লেহারাবাইএর বিচারটাও ওর হাতে ছেড়ে দিলাম। যা।

সুখলাল চলে যায়। কিন্তু মাঝ পথে গিয়ে প্রহরীর ডাকে আবার ফিরে আসতে হয়।

সুখলালকে প্রদ্যুৎনারায়ণ আবার বললেন—বুড়ির কাজ শেষ হ'লে চেত্‌লী গলিতে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিবি—চিরদিনের জন্য। ও যেন জানতে না পারে, আজই ওর শেষ কাজ।

—হুঁজুর, দোর বন্ধ করে দেবো ?

প্রদ্যুৎনারায়ণ ক্রোধে চীৎকার করে উঠলেন—হারামজাদা! তোর চার পাশে দেওয়াল তুলে জীবন্ত কবর দেবো। এটুকু বোঝ না, হারামজাদা।

—বুঝেছি হুঁজুর, তাই হবে। ছুটে যায় সুখলাল।

প্রদ্যুৎনারায়ণ আর পারে না। এই বয়েসে দুর্বল দেহ এত ঘটনার ভার সইতে পারবে কেন! আরামকেদারায় বসে পড়ে ক্লান্ত স্বরে ডাকলেন—জগু!

জগু আলবোলা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ থেকে সে অপেক্ষা করছিল কিন্তু আসতে সাহস পায়নি। আড়াল থেকে সব দেখেছে, সব শুনেছে।

হাতে আলবোলার নল তুলে দিলে ক্লান্ত স্বরে প্রদ্যুৎনারায়ণ বললেন—চেত্‌লী বুড়ি আজ কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেল রে।

—সব দেখেছি হুঁজুর। যাদের যাওয়ার সময় হয়নি তারাই চলে যাচ্ছে। এই তো, আমার যাওয়ার সময় অনেক দিন আগেই হয়েছে, কৈ যম তো ফিরেও তাকায় না।

প্রদ্যুৎনারায়ণ তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এ জগুর অভিমানের কথা। বললেন—সত্যি রে জগু, আমিও আর পারি না। যাবার সময় আমারও হয়ে এসেছে। তাইতো সব বিচার নিজের হাতেই করে দিয়ে যেতে চাই।

—হুঁজুর! জগু প্রদ্যুৎনারায়ণের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। যাই করুন, কিন্তু রাজাকে ক্ষমা করবেন।

—এ অন্যায় কথা তুই কি করে বলিস জগু ?

—কেন বলব না? একই রক্ত। বিষ মেশালে যে আপনার রক্তেও মিশবে।

—ওরে জগু, আমি তা জানি। তাইতো আজও চুপ করে আছি। কিন্তু অদৃষ্ট! অদৃষ্টকে কেউ খণ্ডাতে পারে না রে। যা হবার তা হবেই।

—হুঁজুর, ঘরে চলুন। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

—হ্যাঁ যাই। কেউ পারে না অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যেতে। কেউ পারে না।

জগু পা ছেড়ে চোখের জল মুছল।—অদৃষ্টের কথা জানি না হুঁজুর। রাজাকে ক্ষমা করতেই হবে।

জানালা বন্ধ করতে সে এগিয়ে গেল।

ঘরটা আবছা অন্ধকার। ঝড়ো হওয়ায় চারটে ঝাড়ের বাতির মধ্যে দুটো নিভে গেছে। থাক নিভে। কী হবে জ্বালিয়ে! সত্যি তো আজ এই ঝড়ের রাতে দুটি জীবন কিভাবে হারিয়ে গেল!

লেহারাবাই দোলনায় বসে ভাবছিল। দুলেরা এইমাত্র দুঃসংবাদটা দিয়ে গেল। লছমিবাই মরেনি! মারতে পারল না নয়ন বরং নিজের রক্ত দিয়ে তার ঋণ শোধ করে দিয়ে গেল।

ঝড় ঠিক একই ভাবে চলেছে। কখনো হাওয়া কমে আসে, বৃষ্টি নামে মুষলধারে। আবার কখনো বৃষ্টির ধারাকে শূন্যে লক্ষ্য কণায় ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে হাওয়া সারা আকাশ জুড়ে শুরু করে দেয় দাপাদাপি।

একটা প্রচণ্ড ভীতি ভূতের মত তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। একা থাকতে আজ বড় ভয় করছে। এইমাত্র মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে দুলেরাকে। বলে, চেত্‌লীগলির বুড়ি নাকি তাকে মারতে আসবে। নয়নকে যে সে পাঠিয়েছে তার প্রমাণ কি?

মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় বন্ধ জানালা দরজায় কড়্‌কড়্‌ আওয়াজ উঠছিল। উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়া দেহটাকে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। জানালা খুলে ফেলে। ঝড়ের ঝাপটায় তার ওড়না উড়ে যায়। শোঁ শোঁ শব্দে ঝড়ের সে কী আস্ফালন। কৈ কেউ তো নেই! শূন্যে ঝালরের বাতি জোরে দুলতে থাকে। আলোর ঝলকানি দেওয়ালময় ছোটাছুটি করতে থাকে। জানালা বন্ধ করতে গিয়ে শুনল বাগানে কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে। লেহারাবাই দু'হাত দিয়ে কান দু'টো চেপে ধরে। বাঁশী থেমে যায়। আবার বাজছে! দূরে বহুদূরে মিলিয়ে গেল সে সুর। সশব্দে জানালা বন্ধ করে দিয়ে বলে উঠল—আবার কেন ডাকছো নয়ন? আমি যে তোমাকে ঠকিয়েছি!

আবার এক নিস্তব্ধতা ঘরে নেমে এল। দুলেরাকে না তাড়ালেই ভাল হতো। সত্যি আজ বড় ভয় করছে। এরকম তুফান আর বৃষ্টি বাংলাদেশে এসে এই প্রথম দেখছে। হঠাৎ বাইরে দরজায় করাঘাত হলো। কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। তবে কি করণকুমার এল! এই তুফানের রাতে সে এসেছে তার কাছে! ওড়না তুলে দৌড়ে গেল। দোর খুলেই চীৎকার করে পিছু

হঠে আসে। ঘরের একটি কোণে এসে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে।

চেত্‌লীবুড়ি দাঁড়িয়ে। কী কুৎসীত ভয়ংকর চেহারা। কী নোংরা দেহটা। লম্বা লম্বা হাত। মোটা হাড ফাটা চামড়ায় ঢাকা। চোখদু'টি কোটরগত। গালদু'টো ভেঙ্গে দাঁতগুলো ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। হেঁটে আসছে। মাথায় শণের মত পাতলা একগোছা চুল। কপাল থেকে বাঁদিকে ঘাড পর্যন্ত একটা দগ্‌দগে ঘা নেমে এসেছে। হেঁটে আসছে একটু ডান দিকে হেলে।

লেহারাবাই চীৎকার করে উঠল—না-না, তুমি যাও। আমি মরব না। ছোটকুমার! দেখো আমাকে মারতে এসেছে!

চেত্‌লীবুড়ি হাসল। হলুদরঙের চারটে দাঁত ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে এল। এতক্ষণে কথা বলল—আমি এসেছি, লেউহারা! সাপের মত জিহ্বা একবার বেরিয়ে আসে। কথা বলতে যতটুকু নিঃশ্বাস দরকার ঠিক ততটুকু মুখের ভিতরে টেনে এনে তাকে ভর করে কথা বলে।

ক্রোধে ঘৃণায় সর্পিণীর মত লেহারাবাই এবার রুখে দাঁড়ায়। —তুই যা। এই দেখ্। বলে ছোরা তুলে ধরল। টুকরো টুকরো করে ফেলবো।

চেত্‌লীবুড়ি আবার হাসল। মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ বার করল।

—আমি জাতে ইরানী। আগে তোকে মেরে তবে মরব। যা বলছি।

তবু এগিয়ে আসে। হাসছে। কোটরগত ঘোলাটে চোখ মাঝে মাঝে বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসে।

লেহারাবাইএর তলপেট থেকে একটা কাঁপুনি বুক পর্যন্ত উঠে আসে।

চেত্‌লীবুড়ি এবার থেমে গিয়ে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে বলল—তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? লোকে আমাকে ডাইনি বলে। এ কাজ আমি অনেক করেছি। তুই বোস্, কোন ভয় নেই। আমি মারব না।

—তবে এখানে এলি কেন?

—পাঠাল যে। আমার বয়েস কত কেউ জানে না, আমি নিজেই জানি না। অন্দরমহলে তিনজন বউরাণীকে আমি নিজের হাতে মেরেছি। তখন গায়ে জোর ছিল। লেউহারা, বোস্।

লেহারাবাই থমকে দাঁড়ায়। তবু তার চোখে কিসের এক সন্দেহ দোলা দেয়।

আবার বলে চেত্‌লীবুড়ি—আমি সব শুনেছি। সাবাস্ লেউহারা। তুই-ই প্রথম এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালি। কিন্তু ওকি! চমকে উঠে দোরে তাকায়।

লেহারাবাই আশ্চর্য হয়ে মুখ ফেরাল।

—ওঃ, নয়নের মা কাঁদছে। শুনছিস্ না?

লোহরাবাই কান পাতল। তুফানের শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

চেত্‌লীবুড়ি বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে। বলল—একটা কথা শুধু বলবো তোকে। নয়নের ভালবাসাকে এমনি করে অপমান করলি কেন?

লেহারাবাই ছোরাটা কোমরে গুঁজে রেখে উত্তর দেয়—কৈ, আমি তো কোনদিনই ওকে ভালবাসিনি।

—কিন্তু সে ভালবেসেছিল। মরবার সময় তোরই নাম সে করেছিল।

লেহারাবাই অধোবদনে তার কলঙ্ককে ঢাকতে চেষ্টা করে।

—একি করলি লেউহারা! মরবার সময় তোর নাম করেছে কিন্তু বলেনি যে তুই ওকে পাঠিয়েছিলি। উঃ—সে মৃত্যু যদি দেখতিস!

—না-না. আমি শুনতে চাই না। লেহারাবাই দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। এক অস্ফুট কান্নায় তার দেহ কেঁপে কঁপে উঠতে থাকে।

চেত্‌লীবুড়ি আবার হাসল। বলল—লেউহারা, কাঁদিস নি। এতে কি ওর আত্মা শান্তি পাবে? উঠি আমি এবার। যাওয়ার আগে বলছি এ তুই পাপ করেছিস।

লেহারাবাই মুখ থেকে হাত সরিয়ে তাকায়। দু'নয়ন ছেপে নেমে আসে অশ্রুধারা।

—একটা কাজ করবি লেউহারা? —চেত্‌লীবুড়ি বলে।

ওড়না দিয়ে চোখ মুছে চেত্‌লীবুড়ির দি:কে তাকাল লেহারাবাই।

—আমার সংগে চল। প্রাকারের পাশে যেখানে নয়নের দেহ পড়ে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে একটিবার বলবি, নয়ন, তোমাকে আমি ভালবাসি।

—বাইরে যে তুফান বইছে।

—ঝড়ের ভয়ে বাইরে যাবি না? সে তো তোর জন্য কোনদিকেই তাকায় নি। ভয় নেই। এতটুকু বললেই আমার ছুটি। তারপর তাদের কথা না শোনার জন্য মেরে ফেলবে, তা মারুক। আর আমি অন্যায় করব না। চেত্‌লীবুড়ি উঠে দাঁড়ায়।—আয় আমার সংগে।

লেহারাবাই চোখ বোজে। হ্যাঁ, সে শুনতে পাচ্ছে নয়নের সেই বাঁশীর সুরের ডাক।

—আয়। চেত্‌লীবুড়ি আবার ডাকে।

লেহারাবাই আর ভাবে না। চেতলীবুড়ির সঙ্গে এগিয়ে চলে।

দু'জনে প্রাকারে এসে দাঁড়ায়। ঝড়ের ঝাপটায় লেহেরাবাইএর ঘাগরা উড়তে থাকে। কী দারুণ ঝড়ের তাণ্ডবতা! রুক্ষ কেশরাশি উড়িয়ে মশাল হাতে রুদ্রের কি ভয়ংকর মেঘাড়ম্বর নৃত্য। দূরে মল্লাখাল। জলের সে কী সহস্র করতালি। প্রাকারের নীচে গভীর খাদ। কী নীচু। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। ঐখানেই নয়নের দেহ ঘুমিয়ে।

চেতলীবুড়ি থেমে যায়। আঙুল দিয়ে দেখাল—ঐ যেখানে প্রাকার বাঁক নিয়েছে ঠিক ঐখানেই যা। যা—চলে যা। শুনছিস না নয়নের আত্মা তোর কথা শোনবার জন্যে প্রাকারের উপরে ছুটে আসছে—যা—লেউহারা যা।

ছুটে চলে লেহারাবাই। ঝড়ের ঝাপটায় বাধা পায়। ঐযে বাঁকটা। ছুটে গেল। আকাশের বুকে এক বিদ্যুন্মালা পথ দেখিয়ে আবার নিভে যায়।

হঠাৎ লেহারাবাইএর ভয়াল তীব্র চীৎকারে ঝড়ের ঝাপটাও ডানা গুটিয়ে নেয়।

চেতলীবুড়ি হেসে উঠল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ঠিক প্রাকারের বাঁকে ছিল একটি বড় গর্ত। ভেঙ্গে গিয়েছিল বহুদিন আগে। লেহারাবাইএর দেহ উলটে পালটে পাথরে ঘা খেতে খেতে বহু নীচে খাদে পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। কেবল তার চীৎকার প্রাকার বেয়ে নীচে মিলিয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল লেহারাবাই। ফিরে গেল চেতলীবুড়ি তার কুঠরিতে।

ঝড় ঠিক তেমনি বয়ে চলেছে। চেতলীবুড়ি জানতেও পারল না সেই রাত্রে রাজমিস্ত্রী দেওয়াল গেঁথে দেবে তার কুঠরির চারিপাশে।

পরদিন করণকুমার এই মৃত্যুসংবাদ পেল। সারাদিন ঝড় বয়ে চলেছে। একটুও বিরাম নেই। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। লেহেরাবাই নেই। কে বা কারা নাকি প্রাকারে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। দোষের মধ্যে লছমিবাইকে মারবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল।

কম্পিত পদে উঠে দাঁড়ায়। সারাদিন ঝালরের আলো নিভেনি। দিনের বার্ণালী আলো কেউ দেখতে পায়নি। সময়ের ঘণ্টার আওয়াজে বোঝে সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

তারপর ধীরে চলে। মাত্র চারদিন আগে লেহারাবাই তাকে আদর করে কত সোহাগ করে কেঁদেছে। হতভাগিনী ভালবেসেই মরল!

কল্লীমহলে এসে দাঁড়াল করণকুমার। দোর খোলা। সিল্কের পর্দা শূন্যে উড়ছে। ঘর শূন্য। ঢুকতে গিয়ে পায়ে লেগে সুরার পাত্র ঝন ঝন শব্দ করে ছিটকে যায়। দূরে দোলনা খালি। কেউ এল না। লেহারাবাই নয়, দুলেমা নয়।

করণকুমার দোলনায় এসে বসল। দূরে জানালার কাঁচে জলের ঝাপটা লেগে জল গড়িয়ে পড়ছে। লেহেরাবাই যখন কেঁদেছিল ঠিক ঐ ভাবে তার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সারেঙ্গীর শব্দে চমকে ওঠে। না কিছু না।...বাবুজি! ঘুঙুর বেজে উঠল ঝুন ঝুন ধ্বনিতে। করণকুমার উঠে পড়ে চারদিকে তাকায়। কৈ কেউ তো নেই!

দোলনায় বসে পড়ে আর্তস্বরে বলে উঠল করণকুমার—আমাকে ক্ষমা কর। লেহারা, আমাকে ক্ষমা কর।

দূর থেকে কে যেন খিল খিল করে হেসে উঠল।

দোলনা ছেড়ে করণকুমার ঘরময় পায়চারি করে দুঃসহ উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে চেষ্টা করে। লেহারাবাইএর শত শত স্মৃতি হাত বাড়িয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। আর্তনাদ করে উঠল করণকুমার—হেসো না, হেসো না লেহারা! তোমার হাসিতে এই নন্দীবংশের সর্বনাশা ভিত নড়বে না। কেন তুমি এরকম করতে গেলে! আমি তোমাকে ভালবাসি না একথা জেনেও নিজেকে এভাবে শেষ করে দিয়ে আমাকে অপরাধী করলে কেন?

ঘুঙুরের ধ্বনি তুলে ঘর থেকে কে যেন ছুটে পালিয়ে গেল। ঐ তো সুরা। করণকুমার সুরার গোল বোতলটা তুলে নেয়। হঠাৎ কে যেন ডেকে ওঠে—বাবুজি!

—কে?

চমকে তাকায়। দরজায় চুমকি দাঁড়িয়ে। লছমিবাইএর দূতি। করণকুমার ছুটে গেল। চুমকি চারদিকে চোরাদৃষ্টি বুলিয়ে করণকুমারের হাতে একটি পত্র দিল। চাপাস্বরে বলল—আজ রাতে, মল্লাখালে। যাই বাবুজি।

চুমকি অদৃশ্য হয়ে গেল। পত্র খুলেই দেখে আজ রাত্রেই কেঁকা জলসাঘরে জলসা বসবে। বাকিটুকু যা রয়েছে তা তাকেই করতে হবে।

কেঁকা জলসাঘরে আজ জলসা বসবে। নয়ন সার্থক করার জন্য এই আসরে সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন প্রদ্যুৎনারায়ণ।

যথাসময়ে জলসাঘরে সারেঙ্গী বেজে উঠল।

জলসাঘরের সাজসজ্জায় আজ একটু নতুনত্ব আছে। সাদা ঝালরের বাতি বাদ পড়েছে। রঙিন ঝালরের বাতিতে আলো জ্বলছে। যেন হোলীর রঙের বিচিত্রতা—লাল, হলদে, সবুজ আর হরেক রকমের রঙে চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ আজ নিজে সাজছিলেন না। জগুই সাজিয়ে দিচ্ছিল। কর্তার যেন আজ কী হয়েছে। কোন উৎসাহ নেই। কোন প্রাণ নেই।

—আচ্ছা জগু, লছমিবাইএর মনের কথা বলতে পারিস?

—জানি না হুঁজুর। তবে মনটা খারাপ হবে বৈকি!

—কেন?

— কেন নয়। আজ আমি যে কাজ করি তা অন্য লোকে করলে অভিমান হবে না?

হো হো করে হেসে উঠলেন প্রদ্যুৎনারায়ণ।

—জগু, তোর কথা আমার বড় ভাল লাগে। তা এত বুদ্ধি থাকতে ব্যবসা করলি না কেন?

—করেছিলাম একবার যৌবনকালে।

—তারপর কি হলো?

—আগুন লাগল। বাড়ী গেল, ব্যবসা গেল, বৌটা পর্যন্ত মরল।

—তা আবার করলি না কেন?

—ইচ্ছে করে করিনি হুঁজুর। ও করলে একাজ করত কে?

—কেন রে, রাজা ছাড়া কি রাজ্য চলে না?

—তা চলে, কিন্তু আমাকে ছাড়া হুঁজুরের চলে না।

প্রদ্যুৎনারায়ণ আবার হাসলেন। জগুয়া চটি জুতো এগিয়ে দিলে পায়ে দিয়ে বললেন—এই ঝড়ের রাতে জলসার আলোগুলো বেশ জ্বলবে, কি বলিস? আচ্ছা, চলি।

প্রদ্যুৎনারায়ণ চলে যান। জগুয়া তাঁর যাওয়ার পথের দিকে তাকাতে কেন যেন এক নিঃশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে এল। জানালার কাঁচ দিয়ে দেখল বিদ্যুতের ঝলসানো আলো।

—কেঁকা জলসাঘরে ঢুকে প্রদ্যুৎনারায়ণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাকিয়া টেনে বসে পড়ে বললেন—ঝালর বাতির রঙিন আলোর ঝরনায় সুরার রঙ্‌ও যে হারিয়ে গেছে।

ঝড়ের হাওয়া কেটে ঘণ্টাফটকের সময়ের ধ্বনি ভেসে এল। গতরাত্রিতে ঠিক এই সময়ে সুখলাল লেহারাবাইএর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে গিয়েছিল।

প্রদ্যুৎনারায়ণ সুরাপাত্র মুখে তুলে ধরেন। সংগে সংগে অন্যান্য নন্দীপুরুষরাও তাই করে।

লছমিবাই গেল। রুক্মিণীবাইএর যৌবনে প্রদ্যুৎনারায়ণ এবার অবগাহন করবেন।

আশ্চর্য! যৌবন বয়সের সংগে ঝুলে পড়লেও কামনা কিন্তু ঝিমিয়ে পড়েনি। এও যেন প্রেম নামে বিলাসের অভিব্যক্তি। লছমিবাইকে চোখ বুজে প্রদ্যুৎনারায়ণকে ভালবাসতে হয়েছে। রুক্মিণীবাইকেও তাই করতে হবে। এ যেন এক দুষ্টনদী। জলোচ্ছ্বাসে দুকূল প্লাবিত করে আজ যেন নিঃশেষে শেষ হয়েছে। আজ সে অথর্ব। তবু তার ক্ষুধা আছে, কিন্তু প্রবাহ নেই। তাই নদীর মাঝে জায়গায় জায়গায় জমাজল তৃষ্ণার্তকে আহ্বান করে। তৃষ্ণার্ত ছুটে যায় সেখানে। কিন্তু জানে না জলের চারপাশে চোরাবালি মৃত্যুর ফাঁদ পেতে বসে আছে।

যথাসময়ে রুক্মিণীবাই এল। প্রদ্যুৎনারায়ণ সুরার পাত্র পাশে সরিয়ে রেখে আস্তে বললেন—এই কি সেই রুক্মিণীবাই!

কালো ঘাগরার মাঝে রূপালী জরি আর তাতে লাল পাথরের তারা। পীনোন্নত নীল কাঁচুলির উপর কালো ফুটকি। লম্বা বেণীর শেষ প্রান্তে সোনার ঝুমকো ঝোলান। দীর্ঘ সুঠাম দেহ। সোনালী চুমকি দেওয়া মসলিনের ওড়নায় মুখ ঢাকা। তসলিম করে ওড়না সরিয়ে প্রদ্যুৎনারায়ণকে আরও একবার তসলিম জানালো। সকলে বাহবা দিয়ে ওঠে। স্বপ্ন মাখা চোখের কোণে কিন্নরী হাসি।

অবশেষে ধরল গান। গুর্জরী। কণ্ঠের মাধুর্যে সুরাও তার নেশা দিতে ভুলে যায়। প্রদ্যুৎনারায়ণ সোজা হয়ে বসলেন। নাঃ, লছমিবাইকে হার মানাবে। তবু দুর্বল মনের কোণ থেকে কে যেন বলল—লছমিবাইএর সুন্দর হাসির সংগে দম্ভপদক্ষেপ রুক্মিণীবাই এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি।

সংগীত যখন থামল রাত গড়িয়ে গেছে অনেক দূর। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডবতা কমে এলেও বাতাসের পাগলামো এখনও কমেনি।

রুক্মিণীবাই এবার নাচবে। ঠিক হয়ে বসে সকলে। তার সেই নৃত্য। শুরু হলো। সুন্দর দেহখানি শূন্যে তুলে পায়ের ভাঁজে চপল নৃত্য। পেবলী নৃত্য। চরম ছন্দের চরম অভিব্যক্তি। লাল আলোতে কালোর

ঝট্‌কা। হাত দু'খানি লীলায়িত হতে থাকে বাদ্যের দ্রুত ঝংকারের তালে। নৃত্যরত রুক্মিণীর ঘাগরার ঝুমকো আলোর ঝলকানিতে নিরন্তর চুমকি খেলছিল।

হঠাৎ জলসাঘরে এসে উপস্থিত হলো নায়েব সুবন্ধনী পালিত। তর সইল না তার। তাকিয়া ডিঙ্গিয়ে সকলের পাশ কাটিয়ে সোজা প্রদ্যুৎনারায়ণের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন বলে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

সহসা প্রলয় শুরু হয়ে যায়। প্রদ্যুৎনারায়ণ সুরার পাত্র ছুঁড়ে দিলেন। ঝন ঝন শব্দে দূরে গিয়ে পড়ে। চীৎকার করে উঠলেন—থামাও।

বাইরের বিদ্যুৎ চমকে ঘর আলোকিত হয়ে ওঠে। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। নাচ থেমে যায়। সকলে তটস্থ হয়ে প্রদ্যুৎনারায়ণের দিকে চেয়ে থাকে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ উঠে দাঁড়ান। এক উত্তেজনায় তাঁর শরীর কাঁপতে থাকে। চীৎকার করে উঠলেন—লছমিবাই পালিয়েছে!

সারা জলসাঘরে হট্টগোল পড়ে যায়—লছমিবাই পালিয়েছে! লছমিবাই পালিয়েছে!

টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এলেন প্রদ্যুৎনারায়ণ।—সে একা যায়নি, সংগে রাজাকে নিয়ে পালিয়েছে!

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পাগলের মত চীৎকার করে নিজের মহলের দিকে ছুটে চললেন।—লছমিবাই পালিয়েছে! ভেন্দা, সুখলাল, কে আছিস্ কোথায়! যত ছিপ্ নৌকা আছে সব ভাসিয়ে দে। খালের পাড দিয়ে ঘোড়সওয়ার পাঠা। পালাতে ওদের আমি দেবো না।

ঝড় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ থেকে আবার যেন হাজার ডানা মেলে জেগে উঠেছে। দীর্ঘ বারান্দায় শূন্যে সারি সারি ঝালরের বাতি এক সংগে দুলতে থাকে। তাদের কাট্‌গ্লাসগুলি ঐক্যতানে টুনটান শব্দে প্রদ্যুৎনারায়ণকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। বৃদ্ধ মানুষটি সহসা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। প্রতিহিংসার সুরা পান করে মদোন্মত্ত হস্তীর মত তার চলন ভয়ংকর। হঠাৎ শূন্য থেকে একটি ঝালরের বাতি স্থানচ্যুত হয়ে নীচে সশব্দে পড়ে চুরমার হয়ে যায়। কাঁচের টুকরো হাজার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রদ্যুৎনারায়ণ মহলে ফিরে দেখে সুখলাল ভেন্দা আর ত্রিশজন সশস্ত্র লোক দাঁড়িয়ে। নায়েব উত্তেজিত হয়ে তাদের কী যেন বলছে।

—ঘোড়া পাঠিয়েছেন? প্রদ্যুৎনারায়ণ প্রশ্ন করেন।

নায়েব মাথা নেড়ে জানাল—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছিপ্‌নৌকাও ছুটেছে। যা ঝড় উঠেছে তারা বেশীদূর পালাতে পারবে না।

প্রদ্যুৎনারায়ণ মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বললেন—ধরে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তারপর আমার সামনে দু'নজকে মাটিতে পুঁতে ফেলব। নায়েব বাবু, আপনি এগিয়ে যান।

জগুয়া কেঁদে উঠে মাটিতে আছাড় খেয়ে চীৎকার করে উঠল—না বড় কর্তা। আপনি বসুন। রাগ করে কিছু করতে যাবেন না। একবার ভেবে দেখুন হুঁজুর, আজ আপনি কি করতে চলেছেন।

প্রদ্যুৎনারায়ণ থমকে দাঁড়ালেন।

জগুয়া উঠে বসে দু'হাত দিয়ে বুক চেপে বলে চলে—কাকে মারবেন হুঁজুর? ওযে আপনার রাজা, আপনারই রাজা।

—সরে যা জগুয়া। সরে যা। তাই বলে সে পালাবে? এত বড় সাহস? ভেন্দা ছাডা সকলে চলে যাও।

—ও দোষ করেনি হুঁজুর। অদৃষ্ট, এই অদৃষ্টই ওকে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে গেছে।

—সরে যা জগু। তোর সব কথা আমি শুনেছি। আজ আর শুনবো না। এই ভেন্দা, তুই যা। ধরা চাই। ধরা পডলে মহলে আর আনবি না। খালের মাঝখানেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আসবি।

ভেন্দার পথরোধ করে দাঁডাল জগুয়া। প্রদ্যুৎনারায়ণকে বলল—সামান্য এক বাইজী, দেহব্যবসায়ী নারীর জন্য আজ জ্যাঠা হয়ে ভাইপোকে মারতে চলেছেন?—ছিঃ—ছিঃ!

—জগুয়া—তোকে আমি খুন করব।

—মেরে ফেলুন কর্তা। এই তো আমি দাঁড়িয়ে। তবু আমাকে না মেরে আমার রাজার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। বুড়ো হতে পারি, এখনও পারব, বিশটা লোককে লাঠি দিয়ে আটকে রাখতে না পারলেও মরতে পারব হুঁজুর।

ভেন্দা জোর করে তাকে সরিয়ে চলতে শুরু করে।

জগু চীৎকার করে উঠল—যাও যাও মারোগে। আর হুঁজুর, আপনি এখানে বসে শুনবেন আপনার রাজা মরবার আগে ডাকছে আপনারই নাম ধরে। হুঁজুর, ভেবে দেখুন একবার।

—ভেন্দা! প্রদ্যুৎনারায়ণের ডাকে থেমে যায় ভেন্দা।

জগুয়া দৌড়ে প্রদ্যুৎনারায়ণের পা ধরে ফেলে করুণভাবে বলে উঠল—হুঁজুর, আমার হুজুর!

—তুই কে জগুয়া? প্রদ্যুৎনারায়ণের শান্ত কণ্ঠে একটা বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে।

—হুঁজুর আমি চাকর। আপনার চাকর। তারপর দু'হাত প্রসারিত করে বলল—এই দুই হাতে ওকে মানুষ করেছি। এই বুকটায় নিয়ে মহলে মহলে ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে পড়ে হুঁজুর। সেই ছোট্ট রাজা আপনার হাত ধরে বাইচ খেলা দেখতে গিয়েছিল—সেই-যে!

প্রদ্যুৎনারায়ণ চোখ বুজলেন। কোন কথা আর কানে আসে না। ঠিক বলেছে জগুয়া। যাক চলে। যতদূর—যতদূর ইচ্ছে। দরকার নেই, প্রতিহিংসা সে আর নেবে না। রাজা, তার রাজা চলে যাক।

চোখ খুলে লম্বা বারান্দার অন্য প্রান্তে তাকালেন। ভেন্দা দাঁড়িয়ে, প্রদ্যুৎনারায়ণ হাত দিয়ে ইশারা করে চীৎকার করে উঠলেন—ছেড়ে দে, যেতে দে ওদের।

ঠিক সেই মুহূর্তে মহলের বাগানে সশব্দে একটি বাজ পড়ল। জগুয়া দেখল লছমিবাইএর সুরভিকুঞ্জের একটি থাম ভেঙ্গে পড়েছে।

বাজের শব্দে প্রদ্যুৎনারায়ণের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। ভেন্দা হাতের ইঙ্গিতে বুঝল অন্য অর্থ। ভেন্দা বলল—যে আজ্ঞে হুঁজুর। যেতে ওদের আমি দেবো না।

ভেন্দা ভুলের বোঝা নিয়ে ছুটে চলে যায়।

প্রদ্যুৎনারায়ণ টলতে টলতে ঘরে এসে আরামকেদারায় বসে পড়েন। সারা দেহে নেমে এল চরম অবসন্নতা। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসে। নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। তবু অতিকষ্টে নিঃশ্বাস টেনে ডাকল—জগু, ওদের ছেড়ে দিলাম। ভালই হলো, কি বলিস?

জগুয়া শুধু কাঁদে।

—তামাক খাওয়াবি জগু? খুব ভাল করে। প্রাণভরে শেষ টান দিয়ে যাই।

জগুয়া দৌড়ে যায়। আলবোলা নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। প্রদ্যুৎনারায়ণ ক্লান্ত হয়ে নিথর হয়ে পড়ে।

আলবোলার নল প্রদ্যুৎনারায়ণের হাতে তুলে দিতে গিয়ে চীৎকার করে উঠল জগুয়া। পা জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—হুঁজুর, আমার হুঁজুর।

প্রদ্যুৎনারায়ণ ঘুমিয়ে পড়েছে। আর সে কাউকে ডাকবে না। জলসার হাজার ঝাড়বাতি আর জ্বলবে না। লছমিবাইএর পলায়নের অনেক আগেই প্রদ্যুৎনারায়ণ পরপারে যাত্রা করলেন।

বাইরে ঠিক তেমনি ঝড় বয়ে চলেছে। ঝড়ের রাত। নন্দীবংশের এক অধ্যায় শেষ হলো।

কতযুগ আগের ঘটনা। আজও করণকুমার লছমিবাইএর স্মৃতি কাহিনী হয়ে সকলের মুখে মুখে ফিরে বেড়ায়। মল্লাখালের নাম পালটে হলো লছমিখাল। সেই থেকে লছমিবাইএর মহল পরিত্যক্ত। নতুন আসর বসেনি। দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে চারদিকে। কেন ভাঙেনি তা কেউ জানে না। হয়তো এমন করুণ ঘটনা বহুদিন লোকের মনকে মুহ্যমান করে রেখেছিল। যখন খেয়াল হলো, তখন কেউ এগোতে সাহস পায়নি। কথিত আছে, সেখানে প্রদ্যুৎনারায়ণের অতৃপ্ত আত্মা মহলে ঘুরে বেড়ায়।

* * *

বহুদিন বাদে কৃষ্ণাকুমারী মন্দিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। দিন চার পাঁচ হলো ইন্দ্রজিৎ অন্দরমহলে আসেনি। অনেক সংবাদ তার কানে এসে পৌঁছেছে। প্রতিদিন প্রতি রাত্রে ইন্দ্রজিৎ ছাদে বসে থাকে। লছমিখালই কাল করেছে। চরিত এসেছিল তার কাছে। বুড়োটার জন্য তার মায়া হয়। কত ভালবাসে ইন্দ্রজিৎকে। সেই বলেছে। ইন্দ্রজিৎ নাকি ওকে বলেছে—জানিস চরিত, আমি সেই করণকুমার, আবার ফিরে এসেছি। চরিতও রেগে প্রশ্ন করেছিল—লছমিবাই তা হ'লে কে? উত্তর দেয়নি ইন্দ্রজিৎ। উত্তর আর কী দেবে! উত্তর তো অন্য বউরাণীদের কথায় পেয়েছে। তারা বলে জমা ঘরে পুরনো অনেক জিনিসের মধ্যে লছমিবাইএর একটি তৈলচিত্র আছে। তার সংগে কৃষ্ণাকুমারীর চেহারার হুবহু মিল আছে। প্রথম প্রথম কৃষ্ণাকুমারী এসব শুনে হেসেছে। কিন্তু ইদানীং কেন যেন বার বার মনে হয় লছমিবাইএর অতৃপ্ত আত্মা কৃষ্ণাকুমারীর হয়ে ইন্দ্রজিৎকে পেতে চায়।

মনকে শক্ত করে আপনমনে হেসে উঠল। যতসব আজগুবি। কিন্তু ঝড়ের রাতে একাঘরে আনমনে বসে থাকার সময় শুনতে পেয়েছে সেই গান। অত সুন্দর গান সে কখনো শোনেনি। বারান্দায় বেরিয়ে দেখেছে, কৈ কিছু নয় তো! সংগীতের সুরে অতীতের কত স্মৃতি হঠাৎ তাকে সজাগ করে

তুলেছে। মনে হয়েছে সেই যেন লছমিবাই। অতীত স্মৃতিকে বিস্মৃত হওয়ার জন্যই যেন ঐ আকুল সংগীত প্রতিবাদ করছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গরদের শাড়ী পরে সিঁথিতে সিঁদুর টেনে উঠে দাঁড়ায়। আজ তার নতুন বেশ। ভাল লাগে না তার এই বদ্ধ দেওয়ালের কড়া শাসন। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে গেল। এত রূপ, এত যৌবন তৈলহীন প্রদীপের মত নিভে যাবে? চোখদু'টি এক ব্যর্থ আক্রোশে জ্বলে উঠল। কী হবে এই সুনিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিক ঐশ্বর্যহীন জীবনযাত্রায়! কিন্তু চমকে গেছে। চোখের কোণে কালো রেখা আজ বড় স্পষ্ট। ছন্নছাড়া চিন্তায় ঘুমও যেন নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। হঠাৎ বাইরে থেকে মন্দিরে যাওয়ার ডাক ভেসে এল।

কৃষ্ণাকুমারী নূপুরের নিক্কণ তুলে ঘর ছেড়ে কানাড়ি পথে এসে পা বাড়াল। চিরাচরিত প্রথায় সব বউরাণীরা দল বেঁধে মন্দিরে এসে দাঁড়ায়। মন্দিরের দেউড়ি পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল তারা। চিক দিয়ে ঢাকা বারান্দা। পূজা হচ্ছে। নতুন নিয়ম হয়েছে। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বউরাণীদের ওখানে বসে থাকতে হবে। দেউড়িতে ভক্তেরা জড়ো হয়েছে। বাইরে থেকে চিকের ভিতরে তাদের দেখতে পাবে না কেউ।

চিকের আড়াল থেকে কৃষ্ণাকুমারী বিস্ময়ে দেখল নাটমন্দির সাজানো হয়েছে। বহুমূল্য চাঁদোয়া নাটমন্দির ছাড়িয়ে বাইরে এসে পড়েছে। ভিতরে ঝুলছে চল্লিশ বাতির ঝাড় লণ্ঠন। উত্তরদিকে শিবমন্দির। দক্ষিণে ঐ পাথরের দেওয়ালের আড়ালে পড়ে গেছে রাধাগোবিন্দের মন্দির। রঙ্‌বেরঙের সম্ভার দিয়ে সাজানো হয়েছে। রাস এসে গেছে।...

ব্রহ্মচারী বাইরে অপেক্ষমান ভক্তদের মধ্যে চরণামৃত বিতরণ করে বউরাণীদের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপ নিবু নিবু। চন্দন ও ধূপের মিষ্ট গন্ধে মন্দির আমোদিত।

ব্রাহ্মচারীর পরণে গরদের ধুতি ও গায়ে এক উত্তরীয়। রক্তচন্দনে কপাল লিপ্ত। বিশাল নয়নে ক্লান্তির আভাষ। তার শান্ত দৃষ্টি সহসা থমকে যায় কৃষ্ণাকুমারীর বিস্ময়াবিষ্ট চোখের তীব্র চাহনিতে। বউরাণীরা নিজেদের মাঝে গা টেপাটেপি করে হাসে।

ব্রহ্মচারী গম্ভীর হয়ে বলল—ঠাকুরকে প্রণাম করুণ। সকলে তাই করে। শিবলিঙ্গ ফুলে ও বিল্বপত্রে আচ্ছাদিত। কিষ্ণাকুমারী চোখ বুজল, কিন্তু হৃদয় থেকে কোন ভক্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল না।

চরণামৃত নিয়ে সকলে উঠে দাঁড়ায়। ব্রহ্মচারী এবার বিল্বপত্র ও প্রসাদ সকলের হাতে তুলে দেয়। কৃষ্ণাকুমারীর হাতে দিতে গিয়ে একবার কেঁপে যায় তার হাত। কৃষ্ণাকুমারীও চোখ তুলে তাকাতে পারে না। হাতের স্পর্শ সে পায়। শরীরটা হঠাৎ কেমনধারা করে উঠল। ঠোঁট কামড়ে কৃষ্ণাকুমারী তাকাল। সত্যি সুপুরুষ! এর চোখে কিসের যেন এক শক্তি। সে মেয়ে, পুরুষের ভাষা বোঝা তাদের অসাধ্য নয়।

কিন্তু একি সে করেছে! অন্দরমহলে কেচ্ছার অভাব নেই। বউরাণীরা পরপুরুষ নিয়ে স্ফূর্তি করে এরকম নজীরের অভাব নেই। কেনই বা করবে না? সবই আছে তবু তেষ্টা পেলে জল পাবে না। খাবার সাজানো, কিন্তু ইচ্ছে হলেই খেতে পারবে না। যৌবনে তরী ভাসবে কিন্তু উজানে বাইতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে সে একি করছে! ছিঃ ছিঃ! ব্রহ্মচারীকে নিয়ে এমনি অন্দরমহলে আলোচনার শেষ নেই। তাছাড়া ব্রহ্মচারী তান্ত্রিক। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে।

ওকি!

কৃষ্ণাকুমারীর হাত থেকে ফুল ও বিল্বপত্র পড়ে যায়। সকলে এ ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। মেজ বউরাণী বেশ জোরেই বলে উঠল—প্রথম পরশে এমনিই ঝরে যায়।

ধমক দেন বড় বউরাণী। ব্রহ্মচারী ততক্ষণে সকলের হাতে প্রসাদ দিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর কাছে গিয়ে চাপাস্বরে বলে—ব্রহ্মচারীর সশ্রদ্ধ নমস্কার নিন। সাহস থাকলে আমার সাহায্য পাবেন।

কৃষ্ণাকুমারী বিস্ময়ে তাকায়। ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিতে ওকি। উঃ! তার সব ভাবনা সব কল্পনা ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়ে যায়। হঠাৎ এক স্পর্শে কৃষ্ণাকুমারী চমকে উঠল। পাশে তাকিয়ে দেখে বড় বউরাণী। তিনি তার হাত ধরে স্নেহমাখা চোখে ইশারা করে ডাকলেন।

সকলে চলতে শুরু করে। মন্দিরের দুয়ারে গিয়ে আবার পিছনে তাকাল কৃষ্ণাকুমারী। ব্রহ্মচারী তখনো তার দিকে সেই দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে।

কৃষ্ণাকুমারী একরকম দৌড়ে অন্দরমহলে ফিরে এল। নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। আজ একি তার হলো! এক উত্তেজনায় দেহ বার বার কেঁপে ওঠে। চোখ বোজে। কানে ভেসে এল তার সেই কথা—সাহস থাকলে আমার সাহায্য পাবেন। কিসের সাহস? এ-ইঙ্গিতের অর্থ কি? আর সেই দৃষ্টি! উঃ, কী তীব্র চাহনি! ভয়ংকর জাদুকরী কুহক

দৃষ্টির মত। না, সে আর মন্দিরে যাবে না। শক্ত করতে চেষ্টা করে নিজেকে।

জানালায় এসে দাঁড়াল। আশে পাশে অন্য ঘর থেকে হাসির হুল্লোড় ঠাট্টা তামাসার সুর ভেসে এল। তাকে নিয়ে হয়ত সবাই আলোচনা করছে, হাসছে। হাসুক ওরা। বেশ করেছে সে। পালঙ্কে শয্যার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল। সত্যি কৃষ্ণাকুমারী আর পারছে না।

সেদিন অদৃষ্ট দেবতা আড়াল থেকে হাসলেন। নন্দীমহলে আজ এই মুহূর্তটুকু সত্যি করে এক অধ্যায় হয়ে উঠল। তার সন্ধান কেউ পেল না।

ব্রহ্মচারীর ঘরে জ্বলছিল এক পঞ্চপ্রদীপ। দড়িপাক দিয়ে সিঁড়ি তৈরী করতে হবে। ব্রহ্মচারী পায়চারি করে মতলবের সূত্রগুলি বাঁধতে চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে এগোতে হবে। তার মনস্কাম পূর্ণ করতেই হবে। এই তার শেষ খেলা। কিন্তু বিন্দা তো এল না! তার এই কামনা পূর্ণ করতে তার সাহায্যই যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

ব্রহ্মচারীর চোখের উপর অতীতের কত কথা কত দুঃস্বপ্ন একে একে ভেসে ওঠে। জীবনে সে অন্যায় অনেক করেছে। তার জন্য সে কতখানি দায়ী, সেটার বিচার আজ আর করবে না। তার সাধনায় কেবল একজন ছাড়া কেউ বাধা দেয়নি। এছাড়া আরও একটি বাধা এসেছিল। রংবালি মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত তারই পিতা বারবার সাবধান করেছেন। তাকে ফিরে আসতে বলেছেন সম্মোহনী মন্ত্রের পথ থেকে। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে তার কথাকে গভীর জঙ্গলে রংবালি মন্দিরের ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ পিতা বারাণসী চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাও সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই হলুদপুরমল্লায় সে কি করে এল? যদি না চারু ব্রহ্মচারিণী এমনিভাবে তাকে ত্যাগ করে যেতো তাহলে হয়তো ঘটনাচক্রে এতদূরে তাকে আসতে হতো না। কেন তার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে সে সরে গেল? এ অভিযোগ তার চিরকালের। তবে শিবশম্ভু দয়াময়। তাঁর ইচ্ছে তিনিই জানেন।

হঠাৎ এক পদশব্দে চমকে উঠল। ভেজানো দোর ঠেলে বিন্দা ঘরে এসে দাঁড়াল।

ব্রহ্মচারী হাসল। বিন্দা ঘরে ঢুকে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে উঠে বসল।

—তোমার মঙ্গল হোক। মনটা আজ বড় খারাপ বিন্দে।

বিন্দা প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে ধরে।

—তোমাদের ছোট বউরাণীকে দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। বড় দুঃখ তার, না?

—শুধু দুঃখ! ম্লান হাসি হাসল বিন্দা। শুধু ছোট বউরাণী কেন ঠাকুর, সকলের অদৃষ্টে ঐ একই দুঃখ।

—হ্যাঁ বিন্দে, সেই দুঃখই আমাকে দূর করতে হবে। ছোট বউরাণীকে আমি একটি কবচ দিতে চাই।

—কবচ! কি হবে ঠাকুর?

ব্রহ্মচারী আবার হাসল। বশীভূত করার এক শক্তির আধার। এ ধারণ করলে ছোটকর্তা অমনিভাবে আর বাইরে থাকতে পারবে না।

—এও কি সম্ভব! বিন্দা বলে উঠে। এক আনন্দে তার চোখ দু'টি জ্বল জ্বল করে উঠল।

—সবই সম্ভব, বিন্দে! কিন্তু এর জন্য চাই বিশ্বাস আর কৃচ্ছ্রসাধন। শুধু কবচ নয়। আমি ওনাকে আমার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র দিয়ে এখান থেকে বিদায় নিতে চাই।

—কিন্তু ঠাকুর। বলতে গিয়ে বিন্দা বলতে পারে না। নন্দীমহলের আইন কানুন বিন্দার অজানা নয়। তরুণ ব্রহ্মচারীর কাছে সুন্দরী তরুণী বউরাণী এলে শত্রুর মাথায় হাওয়া দিয়ে নিন্দে দশদিকে উড়বে। তবে— লুকিয়ে। হ্যাঁ, এ সম্ভব হলেও হতে পারে। ছোটকর্তা এদিকে মাথাও ঘামায় না।

ব্রহ্মচারী বলল—কথা শেষ করলে না যে?

—সত্যি যদি ঠাকুর এত বড় উপকার করতে পার তবে এর ঋণ শোধ হবার নয়। কিন্তু মহলের আইন কানুন তো তুমি জান না ঠাকুর।

—আমি জানি বিন্দে। তবে ভগবানের ইচ্ছে হলে তা হবেই। এটা ভুলে যেও না। মহলের বাধা অবশ্য অনেক। পুণ্যির সাহায্যও স্বল্প।

—না ঠাকুর। আমার দ্বারা যা হবার সবই আমি করব। দেখি, ছোট বউরাণীকে বলি গে। যা একগুঁয়ে মেয়ে।

—ছোটকুমারকে খুব ভালবাসে, না বিন্দে?

এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিন্দা।—ভালবেসে আর কী হলো! পোড়াকপালীর কপাল তো আর খুললো না।

—সত্যি বিন্দে, তুমি পুণ্যবতী। সত্যিই হলুদপুরমহলায় তোমার মত মঙ্গলাকাংক্ষিণী আর আমি দেখিনি। দাঁড়াও।

ব্রহ্মচারী বিছানার তলা থেকে একটি থলি বার করল। তারপর তার ভিতর থেকে একটি পাথর বিন্দার হাতে দিয়ে বলল—এই নাও। দুর্লভ পাথর। এর মূল্য কেউ দিতে পারে না। কাছে রেখো। কোন শত্রুই তোমার ছায়া স্পর্শ করতে পারবে না।

সত্যি চমৎকার পাথর। এক টুকরা রক্তের ডেলা। কপালে একবার ছুঁইয়ে আঁচলে গিঁট দিয়ে বেঁধে মাটিতে মাথা ছোঁয়াল। বলল—ছোটবউরাণীকে যেমন করে পারি মত করাবার চেষ্টা করব।

—শোন বিন্দে! জোর করো না। এটা মন্ত্রের, ঈশ্বরের কামনা। শনির চক্রে অবর্তিত হ'য়ে বুদ্ধির বিনাশ ঘটলে আমার করার কিছু নেই। তবে তুমি চেষ্টা করবে, এতে শিবশম্ভুর আশীর্বাদ পাবে।

বিন্দা আরও একবার প্রণাম করে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে গেল।

রাশ শেষ হয়ে গেছে। কৃষ্ণাকুমারী জানালায় এসে দাঁড়ায়। ভাবছিল অনেক কিছু। আজ চিন্তার যেন শেষ নেই। এই অশান্তির মধ্যে ব্রহ্মচারী তার জীবনে দেখা দিয়েছে। সন্দেহ প্রতি পদে। ব্রহ্মচারীকে সে সত্যিকারের খাঁটা সন্ন্যাসী হিসাবে এখানো গ্রহণ করতে পারেনি।

কৃষ্ণাকুমারীকে নিয়মিতভাবে দেবতাদর্শনে যেতে হয়। যতই সে প্রতিজ্ঞা করুক। সারাদিন নিজেকে শক্ত করে বসে থাকে। মন্দিরে আর যাবে না। কিন্তু সন্ধ্যার আরতিধ্বনি তার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিয়ে তাকে মন্দিরে টেনে নিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করে বসে—এই উদ্ভট ভীতির কারণ কি? তবে কি সে ব্রহ্মচারীর রূপে মজেছে? হয়তো বা তাই। হয়তো বা দুর্বল মনের আত্মাহুতি। তবে একটা সত্যি সে জেনেছে, যা সে অস্বীকার করতে পারে না, সে অনুভব করেছে, ব্রহ্মচারীর দেওয়া চরণামৃত পান করে মাথায় ছোঁয়ালেই দেহে একরকম অনুভূতির সঞ্চার হয়। শুনতে পায় যৌবনের কলকল ধ্বনি আর কামনার নিদারুণ নির্দেশ। গোপন পদক্ষেপে এসে কে যেন শোনায় সর্বনেশে কথা। শুধু বলে, সে চায় ভোগের অতল তলে তলিয়ে যেতে।

বিন্দা এসেছিল ব্রহ্মচারীর হয়ে কথা বলতে। ব্রহ্মচারী নাকি কবচ দেবে। যার শক্তিতে সে ইন্দ্রজিৎকে পুরোপুরি পাবে। বিন্দা তার মঙ্গল চায়, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবু সে তাড়িয়ে দিয়েছে। সাপের মাথায় মণি আছে। নিতে গিয়ে যদি তার নিঃশ্বাসে পুড়ে যায়!

ব্রহ্মচারী তাকে দীক্ষা দিতে চায়। কিন্তু সেই দীক্ষা কি তাকে মুক্তি দিতে পারবে! ভাঙতে পারবে কি নন্দী প্রাসাদের শত বছরের জঘন্য প্রথা! উদ্ধার করতে পারবে কি নন্দীবউরাণীদের তিলে তিলে আত্মহত্যা থেকে!

আপন মনে হেসে উঠল কৃষ্ণাকুমারী। প্রলাপের মত বলে উঠল—সব মিথ্যে, সব ভুল, সে মন্ত্র মুক্তির নয়। সেই দীক্ষা তার দেহের অধিকার নেওয়ার এক ষড়যন্ত্র মাত্র। সেই দৃষ্টি, সেই লোভাতুর সম্মোহনী দৃষ্টিই মন্ত্রের জপমালা। সেও পুরুষ মানুষ, সেই চিরন্তন পুরুষেরই একজন।

সারা দেহে নেমে এল এক ক্লান্তি। পালঙ্কের উপর মাথা রেখে বলে উঠল—মুক্তি নেই, কোথাও মুক্তি নেই।

ঘর অন্ধকার। আলো জ্বলেনি। হঠাৎ গম্ভীর ধ্বনিতে মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ ভেসে এল। দু'হাতে কান চেপে ধরল। সে শুনবে না—শুনবে না ব্রহ্মচারীর আহ্বান।

বাইরে দরজায় কে যেন করাঘাত করল। এক উত্তেজনায় কৃষ্ণাকুমারীর শরীর কাঁপতে থাকে। তার অজ্ঞাতে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল এক আর্তস্বর—না-না—আমি যাব না।

অন্ধকারও ব্যঙ্গ করে। নিশ্চল দেওয়াল থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে এল, না-না—আমি যাব না।

দোরে করাঘাত হয় এবার ঘন ঘন। কৃষ্ণাকুমারী টলতে টলতে দোরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দোর খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে। ঘরে ঢোকে দাসী। কৃষ্ণাকুমারীর দিকে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে চলে যায়।

কৃষ্ণাকুমারী হাসল। ভয় পেয়েছে। সত্যি কি সে উন্মাদ হয়ে গেল! স্থাণুর মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দূরে প্রদীপ জ্বলছে। ঝাড়ের আলো সহ্য করতে পারে না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রদীপের আলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে সে ভালবাসে। সে অনুভব করে কত অতৃপ্ত আত্মা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলতে চায় তাদের সুখ-দুঃখের কথা। বিশেষ করে লছমিবাইএর আত্মাকে সে গভীরভাবে অনুভব করে।

দূরে দেওয়ালে নৃত্যরত আলোতে চমকে উঠল। প্রদীপের কম্পিত শিখায় প্রচ্ছায়া। নানা ভঙ্গিতে নৃত্যের চপলতা। বেশ লাগে কৃষ্ণাকুমারীর। হঠাৎ কেন যেন এক আশা হৃদয়ে দোলা দিয়ে উঠল। না, সে ফুরিয়ে যায়নি।

সন্ধ্যা ক্রমশ ডানা গুটিয়ে ফেলে। মনের ঝড়ও কমে আসে ধীরে ধীরে। পালঙ্কের উঁচু কাঠের উপর থুতনি রেখে হাসল। সত্যি যদি এমন শক্তি থাকত যাতে ইন্দ্রজিৎকে সে পেতো, ঠিক চলে যেতো এখান থেকে। পালিয়ে যেত। বদ্ধ খাঁচা থেকে শূন্য আকাশ ঢের ভাল। তাতে যদি পাহাড়ে আছাড় খেয়ে মরে তাতেও আনন্দ থাকবে।

হঠাৎ এক পায়ের শব্দে চমকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। বড় বউরাণী ঘরে এসে দাঁড়ালেন। এই প্রথম। শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ায় কৃষ্ণাকুমারী।

—থাক। মন্দিরে যাওনি, তাই দেখতে এলাম। বললেন বড় বউরাণী।

কৃষ্ণাকুমারী তাড়াতাড়ি আরাম কেদারাটা দেখিয়ে আস্তে বলল—বসুন।

—থাক থাক, তা মন্দিরে গেলে না কেন?

বড় বউরাণীর চোখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণাকুমারী কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। তারপর মাথা নীচু করে বলল—শরীর ভাল নেই।

—তা আর ভাল থাকার কথা নয়। যাক, এখন আর বসব না। একটা কথা বলে যাই কৃষ্ণা। এখানকার নিয়মে চলতে চেষ্টা করো। কোন অভিযোগ করো না। কারণ, লাভ নেই। আমাদের কপালটা ভাঙাবাড়ী। কী সাজাবে তাতে? এই দেখ না। বলে কপালে হাত রাখেন। সত্যি কপালের বাঁ দিকে আগুনে পোড়া একটা কালো দাগ।

—মাঝে মাঝে ঠিক তোমারই মত আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি। তাই একদিন এই অদৃষ্টকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য প্রদীপের জ্বলন্ত শিখাকে কপালে চেপে ধরেছিলাম। ওমা, পুড়ে জ্বলেই ম'লাম, কিচ্ছু হলো না। তারপর হেসে ফেলে বললেন—তাই একদিন ভাং ধরলাম। মন্দ নয়। জীবনটা তো কেটে যাচ্ছে।

—কিন্তু দিদি, নদীতে বান যখন আসে তখন কি নদী সহজ পথে যায়?

—তা যায় না সত্যি। তাই বলে নদীর গতিপথও তো নতুন পথ পায় না। আচ্ছা, আমি যাই। এই দুর্ভাগা নন্দীমহলে শুধু দুর্ভাগ্যই নিয়ে এসেছি। এর হাত থেকে মুক্তি নেই। চলি কৃষ্ণা।

বড় বউরাণী বেরিয়ে গেলেন। কী বিশ্রী হাঁটা। মনে হয় পঙ্গু জীবনটাকে এমনি বিশ্রীভাবে টেনে নিয়ে চলেছেন।

চোখ বুজল কৃষ্ণাকুমারী। আশা যেন ছলনা হয়ে তার চোখের উপর হাত ঘুরিয়ে হাসছে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। ইন্দ্রজিৎকে তাহ'লে

সে পাবে না। এমনি করে জীবনের সংগে লুকোচুরি খেলে তার দেহটাও পঙ্গু হয়ে যাবে! সত্যি তো কতদিন ইন্দ্রজিৎ তার কাছে আসেনি।

গিয়ে দাঁড়াল আয়নার কাছে। মুগ্ধ হলো নিজের রূপে। যৌবনের কী দুর্বার আক্রোশ! কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কিন্তু কী লাভ! আশা, আনন্দ, সুখ, দুঃখ সব মিশেছে ঐ আবছা অন্ধকারে। সে নাকি ইন্দ্রজিতের জীবনসঙ্গিনী। নন্দীবংশের বউরাণী। হাসি পায়। তার রূপ নাকি আগুনের মত। সত্যি সত্যি যদি তাই হয় তবে সে কেন নিজের আগুনে পুড়ে মরবে? কেউ মরতে চাইলে কেন সে বাধা দেবে?

এক উত্তেজনায় চিন্তাও অসাড় হয়ে যায়। আর সে চিন্তা করবে না। চোখ বোজে। ডুবে গেল এক অসহনীয় বেদনার অকূল দরিয়ায়।

যখন উঠে দাঁড়াল রাত বেশ সজাগ হয়ে উঠেছে। রাত্রির অভিসারিকা গম্ভীরার অঞ্চলে মুখ ঢেকেছে।

কঠিন হয়ে উঠল কৃষ্ণাকুমারী। তার যৌবনের পারাবত মৈথুন সকাশে আকাশে উড়েছে কিন্তু ইন্দ্রজিতের নির্বাক অবহেলিত দৃষ্টিতে আহত হয়েছে বারবার। সে যাবে। দেখবে, রাত্রিতে ইন্দ্রজিৎ ছাদে বসে কি করে।

বাইরে এসে দাঁড়াল। কানে ভেসে এল বীণার দ্রুততালের মধুর ঝংকার। হয়তো কোন বউরাণী বেদনাকে ভুলে থাকবার জন্য ঝংকারের মাধ্যমে নিঃসঙ্গতাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে এল। সুবিস্তৃত ছাদের চারপাশ ঘিরে উঁচু কার্নিশ। সারা ছাদ স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। দূরে দু'টো গোল বড় গম্বুজ, অন্ধকারে গাল ফুলিয়ে বসে। ঘরদু'টি খালি। উৎসব-পার্বণে ওখানে নহবৎ বাজে। তারই পাশে উঁচু চওড়া পাথরের উপর একটি মূর্তি বসে।

শূন্যে অসীম আকাশে অগণ্য তারার মেলা। মহানিস্তব্ধতার তলে ঐ মূর্তিটি বিশাল ছাদের মাঝে যেন এক ফোঁটা কলঙ্ক। কৃষ্ণাকুমারী এক ম্লান হাসি হেসে মন্থর গতিতে মূর্তির পাশে এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল—বাঃ!

ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠল। মনুষ্যমূর্তি ইন্দ্রজিৎ। কৃষ্ণাকুমারীর অনুমান ঠিক।

ইন্দ্রজিৎ আশ্চর্য হয়ে যায়—তুমি এখানে?

—চমৎকার! কৃষ্ণাকুমারী বলে।

—কী চমৎকার?

—ঐ যে। আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বলে—চমৎকার নয় ?

ইন্দ্রজিৎ হাসল। আকাশের কোণে একফালি চাঁদ ফুটে উঠেছে। তাকে ঘিরে কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এক সার খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ পেঁজা তুলোর মত তারই লোভে অনন্ত পথে যাত্রা করেছে।

কৃষ্ণাকুমারী ইন্দ্রজিতের পাশে বসে পড়ে বলল—আমার নির্লজ্জতা দেখে আশ্চর্য হয়েছো, না ? জিজ্ঞেস করবে, একা ছাদে এলুম কেন, এই তো ?

চুপ করে থেকে আস্তে বলল ইন্দ্রজিৎ—তোমার ভয় করে না কৃষ্ণা ?

বিস্ময়ে তাকায় কৃষ্ণাকুমারী তারপর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—কিসের ভয় ?

—লোকভয়, ভূতের ভয়, আরও কত কি ?

—না। বিশেষ করে লোকভয় আমার নেই। কৈ আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না তো ?

ইন্দ্রজিৎ এবার মুখ তুলে বলল—একা আসা উচিত হয়নি তোমার তাছাড়া তুমি কি ক'রে জানলে আমি এখানে ?

—আজ নয়। বহুদিন থেকেই জানি। উচিতের কথাই যখন তুললে তখন জিজ্ঞেস করি, কেন—কেন এমন হলো তোমার ?

—আমার আবার কী হলো কৃষ্ণা ?

—আজ যে ছাদে এসেছি, কেন এলাম তুমি তা জান ?

হেসে ফেলে ইন্দ্রজিৎ--সেই পুরনো অভিযোগ।

—তাই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—কেন এমন হলো তোমার ?

ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল তার সুন্দর মুখে একটা কঠিন ছোপ। চোখে যেন কিসের এক বিদ্রোহের ইঙ্গিত। রাঙা ঠোঁটের ফাঁকে হিসাব নিকাশ করার প্রতিজ্ঞা।

আবার বলল কৃষ্ণাকুমারী—তুমি কিছু বলতে চাইছো না। বেশ, একটা কথার উত্তর দেবে ?

—কী কথা ?

—তোমাদের পূর্বপুরুষরা কোত্থেকে এসেছিলেন, জান ?

—ঠিক জানি না। হঠাৎ এ অবান্তর প্রশ্ন ?

—আমি জানি তোমাদের উৎস। শুনবে ?

—কৃষ্ণা! ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডেকে উঠে থেমে যায় ইন্দ্রজিৎ। তারপর হেসে ফেলে কৃষ্ণাকুমারীর হাতদু'টি ধরে বলল—চাঁদকে দেখে তুমি শুধু বাঃ-ই

বলেছিলে, আর আমি ? হাত ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর মুখখানি তুলে ধরে বলল—আমি আমার এই রূপময়ী চাঁদকে দেখে শুধু বাঃ-ই বলবো না, বলবো ঐ চাঁদ আকাশে একাকিনী বলে এত গরবিণী, আর তুমি হাজারের মাঝে থেকেও মুগ্ধ করেছ আমাদের সকলকে।

ইন্দ্রজিতের অযাচিত রূপবর্ণনা ও প্রশংসার পাশ কাটিয়ে কৃষ্ণাকুমারী দৃঢ় স্বরে বলল—শুনবে না তোমাদের বংশের উৎস ?

—আজ কি শুধু ঝগড়াই করবে ? তোমার কী হল কৃষ্ণা ? আমি জানি। কিন্তু কেন এ অন্যায় আবদার। কি দরকার আমাদের জেনে ?

—আমার আবদার অন্যায় নয়, যা অন্যায় সেটাই তো জানতে চাইছি তোমার মুখে।

—শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষেরা লুণ্ঠন করেছে, দস্যুবৃত্তি করে অর্থ সঞ্চয় করেছে, জঘন্য কাজও করেছে বহু, কিন্তু আজ একথা কেন ?

—উঁহুঃ, আরও আছে যা তুমি বলতে পারলে না। যারা নিজেদের জন্য হত্যা করেছে ন্যায়কে—স্বার্থের উপর ভিত্তি গড়েছে নিজেদের আভিজাত্যের —নারীর দেহকে দেহগত স্ফূর্তির জন্য শুধু ব্যবহারই করেছে। কোনদিন মনের কেনা-বেচা করেনি যারা তারা কি কখনো কাউকে ভালবেসেছে, না ভালবাসতে পারে ? এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে কৃষ্ণাকুমারী। পর মুহূর্তেই আবার বলে—তাই সব জেনেও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, কেন এমন ধারা হলো তোমার ?

—আমি জানি কৃষ্ণা, এ অভিযোগ তুমি করবে। তবুও আমার কথা শুনলে একথা বলতে না।

—সত্যি করে হয়তো কিছুই বলতে পারতুম না। কিন্তু জিজ্ঞেস না করেও থাকতে পাচ্ছি না, আমাকে কাঁদিয়ে একা ফেলে এখানে বসে থাকার কী অর্থ থাকতে পারে ?

—এ আমার ইচ্ছাকৃত নয়। কোন উপায় নেই। এ ছাড়া আমার কোন উপায় নেই।

কৃষ্ণাকুমারী ধমকের সুরে বলে উঠল—ছেলেমানুষের মত কথা বলো না। তবে কি আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হওনি ?

—একথাই বুঝি আমাকে শোনাতে এসেছ ? ধমক দেয় ইন্দ্রজিৎ। বলল—বিশ্বাস কর কৃষ্ণা, রাত্রির অন্ধকারে এখানে বসে থাকি, তবু তোমার কাছে যেতে পারি না। তুমি বলবে, কেন ? কি উত্তর দেবো ?

—চাই না তোমার উত্তর। উঠে দাঁড়ায় কৃষ্ণাকুমারী। চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালে ইন্দ্রজিৎ খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলে বুকের কাছে টেনে এনে বলল—এই, লক্ষ্মীটি, আমার মুখের দিকে তাকাও দিখিনি। শোন, আমাকে যে যাই ভাবুক, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না।

কৃষ্ণাকুমারী কোন উত্তর দিল না। ইন্দ্রজিতের বুকে মুখ গুঁজে নিথর হয়ে পড়ে রইল।

ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর কপালে মুখ চেপে আস্তে বলল—মনকে কতবার প্রশ্ন করেছি, এ আমি কি করছি? কোন উত্তর পাইনি। আমি চাই না এখানে আসতে তবু আসতে হয়। আমি যে বড় দুর্বল। জানি তুমি আমার—।

কৃষ্ণাকুমারী বলে উঠল—আমি যে তোমার স্ত্রী।

এক উদ্বেলিত অশ্রুকে সামলে নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। মুখ তুলে তাকায়। ইন্দ্রজিৎ ঐ করুণ দৃষ্টি সইতে পারে না। কৃষ্ণাকুমারী বলে উঠল—তোমাকে আর ওভাবে থাকতে দেবো না। বিন্দার কাছে সব শুনেছি। তুমি এখানে বসে লছমিবাইএর মৃত কণ্ঠের গান শোন আরও নাকি কোন্ এক নারীমূর্তি তোমাকে ইশারা করে ডাকে।

—তাহ'লে তুমি সব শুনেছ?

কৃষ্ণাকুমারী লছমিখালের দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ। আর এও জেনেছি, এ উন্মাদের লক্ষণ। যে মৃত সেই তোমার স্মৃতি। হঠাৎ ইন্দ্রজিতের চোখের উপর চোখ রেখে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—আমার দিকে তাকাও তো? কী নেই আমার? আমারও কি সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই? তবে কেন এই অবহেলা—এত অবজ্ঞা?

—কৃষ্ণা!

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলে উঠল কৃষ্ণাকুমারী—কি লজ্জা, কি লজ্জা! মেয়েছেলে হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে একবার থামলুম না, আর তুমি? বেশ নির্বাক, বেশ উদাসীন।

ইন্দ্রজিৎ এক অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ভেঙে পড়ে বলে উঠল—ছিঃ কৃষ্ণা, কেন বারবার ওকথা বলছো, কে বললে আমি তোমাকে ভালবাসি না?

—খু-উ-ব ভালবাস। সারাদিন বাইরে থাক, রাতে বসে ভূতের কথা ভাব। চমৎকার তোমার ভালবাসা! ইন্দ্রজিতের চোখে চোখ পড়তেই থমকে যায়।

তার চোখের কোণে একটুখানি জলের আভাস। মেঘের আনাগোনার মধ্যে চমকে ওঠা এক পশলা বৃষ্টি। পুরুষমানুষের চোখে জল। কিন্তু কি লাভ। এর চেয়ে সে ঢের—ঢের কেঁদেছে। ভুলবে না, ভুলবে না সে। নিষ্ঠুরের মত বলে চলে—তোমার কাছে মানুষ বড়, না ছায়া?

—বেশ, তুমি কি করতে চাও বল?

—আমি চাই মুক্তি। দেহে, মনে, কামনায়। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। কারো—কারো মানা শুনবো না।

—বহুদিন আগে এমনি একজন প্রশ্ন করেছিল, গিয়েছিলও পালিয়ে। তার ফল আবার কি হয়েছিল তাতো তুমি জান।

—আমি জানি, তুমি কার কথা বলছো। সে ছিল লছমিবাই আর আমি তোমার ধর্মপত্নী। তবু সে করণকুমারকে সংগে নিয়ে পালিয়ে যেতে সাহস পেয়েছিল, স্বাধীনতা পেয়েছিল। আর আমি?

—জানি কৃষ্ণা। আমি জানি, সব জানি। একদিকে চিরাচরিত মহলের নিষ্ঠুর নিয়ম, অন্যদিকে লছমিবাইএর আকুল আহ্বান। বলবে, এও উন্মাদের লক্ষণ। তার মাঝে তুমি। অনেক দেখেছি, অনেক ভেবেছি কিন্তু দু'এর মাঝে থেকে আমি একান্ত তোমার হ'তে পারছি না।

—চিরকালই এইভাবে চলবে? এর হাত থেকে মুক্তি চাও না তুমি?

—নন্দীপুরুষদের মুক্তির প্রয়োজন হয় না। তাদের জন্য তৈরী হয়েছে জলসাঘর। নটী এসেছে নানা দেশ থেকে।

—নন্দীপ্রাসাদের বউরাণীরা তবে কিসের জন্য?

—পাছে জীবনে একঘেঁয়েমি আসে।

—চমৎকার। এরা কি তোমাদের কাছে মাটির পুতুল?

—তাই বোধহয় কৃষ্ণা।

একটু থেমে ইন্দ্রজিৎ বলে চলে—আমার ভালবাসায় কোন খাদ নেই। সন্দেহ রেখো না। আমায় বিশ্বাস করো।

কৃষ্ণাকুমারীর কণ্ঠে এক ক্রোধের স্বর জেগে উঠল। ওঃ!—উত্তেজনার পর উত্তেজনা তাকে পাগল করে তোলে। সর্পিণী যেন বিষের জালায় কেবল ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

তার মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে ইন্দ্রজিৎ বলে—প্রবাহের মাঝে ভেসে যাও। থামতে চেও না। থামলেই দুঃখ, থামলেই ভাবনা। নিয়তির

সংগে পাল্লা দিতে চেও না। দেখছো না, তুমি আর আমি বারবার মাথা ঠুকেও কোন সমাধান করতে পারছি না।

—যে অবুঝ, দুর্বল, প্রেতাত্মা বিশ্বাস করে তার আর সমাধান হবে কি করে? কৃষ্ণাকুমারী সোজা মুখ তুলে ইন্দ্রজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে গর্জিয়ে বলে ওঠে—লোকে কি বলে জান?

—কি বলে?

—আমাকে বলে লছমিবাই আর—

—আর আমি করণকুমার।

—বিশ্বাস কর না?

—বিশ্বাসের কথা নয়, তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে তার সংগে আমার।

—না। শুধু মিল থাকতে পারে চেহারায়, আমাদের দু'জনের সংগে সেই দু'জনের। আর কোন মিল নেই। সত্যি যদি তাই হয়, তবে আমাকে লছমিবাই মনে করে আমার কাছে ধরা দিচ্ছ না কেন?

ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠে কৃষ্ণাকুমারীর দিকে তাকায়। রাত্রির আলো-আঁধারে চোখদু'টি কি সুন্দরই না লাগছে। অতীতের এক প্রশ্ন বর্তমানের ডানা মেলে তার মর্মর বক্ষ ভেদ করেছে। চিরন্তন মহাসত্যকে সত্যি হয়তো উদ্ধার করা অসাধ্য নয়। অদ্ভুত প্রশ্ন! সূক্ষ্ম ভুরুর বাঁকানো রেখায় সেই প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ ভাবে বলে—তা কখনো সম্ভব? তুমি লছমিবাই হ'তে যাবে কেন?

—হলে আপত্তি কি? দেহটার কথা বলছো? না হয় কামনার আগুনে পুড়িয়ে নতুন হয়ে তোমার কাছে ধরা দিই।

—কৃষ্ণা! গলা কেঁপে যায় ইন্দ্রজিতের।

— ভয় পেয়ে গেলে?

—না কৃষ্ণা! অবান্তর কথায় আমি ভয় পাই না।

—তা এখানে বসে থাকাকে যদি আমি বলি অবান্তর, অসহ্য?

—বলতে পার, প্রবাহে ভেসে যাওয়াতে বাধা দেবার শক্তি আমার ব তোমার নেই।

কৃষ্ণাকুমারী হাসল। মুখ ঘুরিয়ে ঘনান্ধকারে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলল—কিং যেদিন এই প্রবাহ থেমে যাবে, সেদিন কি করবে?

—ভয় নেই কৃষ্ণা, সেদিন আর আমরা থাকব না।

—ভরসাই বা কোথায় ?

হঠাৎ কথায় মাঝপথে যবনিকা নেমে এল। তর্কের ঝড় থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে ভেসে এল লছমিখালের আপন সুরের গান। একটা স্তব্ধতা পা পা করে তাদের মাঝে এসে দাঁড়াল।

কৃষ্ণাকুমারীর সব বাদানুবাদ, বিদ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদ শেষ হয়ে যায়। রঙিন স্বপ্ন যেন এক নিমেষে চুরমার হয়ে গেল।

তবু বিরসকণ্ঠে স্পষ্ট ভাবে বলল কৃষ্ণাকুমারী—আমি তোমার স্ত্রী। তোমার আমার ভালবাসা সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাক। কিন্তু দুর্ভাগ্য যদি তার বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে সকলের অজ্ঞাতে আমাকে কোথাও নিয়ে চলে যায় ?

ইন্দ্রজিৎ আশ্চর্য হয়ে মুখ তোলে। বিস্ময়ে কৃষ্ণাকুমারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল—তুমি কি যেতে চাও ?

—না।

—তবে নিশ্চিন্ত থাকো, আজ পর্যন্ত নন্দীপ্রাসাদ থেকে কেউ যেতে পারে 'ন—কেউ কাউকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

এক দুঃসহ ব্যথায় হাসল কৃষ্ণাকুমারী। কী স্থূল এই চিন্তাধারা। বলল —বিষ খেলেও কি বাধা দিতে পারবে ?

চমকে উঠে কৃষ্ণাকুমারীর হাত ধরে ফেলে ইন্দ্রজিৎ। অনুভব করে এক অব্যক্ত ক্রন্দনে তার দেহ থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

—আমি জানি না এর শেষ কোথায়। তবু, কেন মিছি মিছি দুঃখ পাচ্ছো কৃষ্ণা ? যা নিয়ম তা ভগবানের বিধান বলেই মেনে নাও না ?

চীৎকার করতে গিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর কণ্ঠ থেকে এক ক্ষুব্ধস্বর বেরিয়ে এল —এই বিধান আমি মানি না, না-না, এসব মিথ্যে।

কম্পিত কণ্ঠে বলে ইন্দ্রজিৎ—আচ্ছা, মেনে নিলাম। তুমি সত্যি যদি বিষ খাও তাহ'লে আমাকেও একটু দিও। এক সংগে মরব।

কৃষ্ণাকুমারী নিজেকে আর সামলাতে না পেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ইন্দ্রজিৎ দু'হাতে তার দেহ বুকে টেনে এনে বাহুপাশে আবদ্ধ করে। এই নিশীথ রাতে এক নারীর হৃদয়ের অসহনীয় অভিব্যক্তি কত বড় সত্যি হয়ে আজ ধরা দিল ইন্দ্রজিতের কাছে। অন্তঃপুরের কত দুঃখ কত অভিযোগ— কৃষ্ণাকুমারীর উন্মাদনায় আজ তারই একটুখানি প্রকাশ মাত্র। শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল একটুকরো সাদা মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেও যেন অভিযোগ জানাচ্ছে মহাশূন্যকে।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ কেটে যায়। কৃষ্ণাকুমারীর মাথায় হাত বুলিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকল ইন্দ্রজিৎ—কৃষ্ণা! কথা দিচ্ছি, তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না। চল নীচে যাই।

কৃষ্ণাকুমারী তেমনি নীরব হ'য়ে রইল।

পথ হারিয়ে যাওয়া কোন এক পাপিয়ার নিষ্ফল আহ্বান কৃষ্ণাকুমারীর রুদ্ধ হৃদয়ে আঘাত দিয়ে যায়। আজ তার কাছে সব শূন্য। জীবনের সবদিক এক অন্ধকার পর্দায় ঘেরা। সব ভাবনার দেনা চুকিয়ে সত্যি সত্যি সে যেন নিঃসঙ্গ—সর্বস্বান্ত। করবার কিছু নেই, ভাবনার পথও শেষ। কিন্তু এই জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কি কোন তাগিদ নেই? সেই বিয়ে হয়ে আসা অবধি শুধু দুভার্গ্যের তাড়নায় সে মুহ্যমান। স্বামীর অবহেলা, বিন্দা বড বউরাণীর দয়া আর সর্বোপরি এই অদৃষ্টের খামখেয়ালী পরিহাসই শুধু লাভ করলে। আজ সে বড় ক্লান্ত। এই ক্লান্তিই যদি তার জীবনে মৃত্যু এনে দিত, সানন্দে তা গ্রহণ করতো। এত সহজে তার মৃত্যু নেই। তবু শেষ চেষ্টা করবে। নয়তো কালদেবতার ভ্রূকুটিকে সে মাথায় পেতে নেবে।

বিন্দা ঘরে এসে দাঁড়ায়। প্রতিদিনের মত কৃষ্ণাকুমারী জানালায় দাঁড়িয়ে। শূন্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবনার সমুদ্রে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে।

—আমাকে ডেকেছিলে বউরাণী?

কৃষ্ণাকুমারী জানালা থেকে সরে এল। বিন্দার দিকে চোখ তুলে হেসে ফেলল—রঘুনাথের বিয়েতে খুব হৈ-চৈ হবে, নারে?

হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন বিন্দা মোটেই আশা করেনি। বলল—তা আর বলতে? নহবৎখানায় রঙ্ পড়ছে। সারা মহলের দেয়ালে কত কারুকার্য হচ্ছে। তাছাড়া আরও কত কী। কাড়ানাকাড়ার দল সাজানো হচ্ছে, হাজার শিঙা বাজবে একসংগে। অগুনতি পাল্কী এসেছে। তারপর—বিন্দা ফিক্ করে হেসে ফেলে। তারপর টুকটুকে বাইজীদের নাচন আর খেমটাওয়ালীদের খেউড় কেত্তন।

—বটে, বিরাট হৈ হুল্লোড় তাহ'লে। ছোটবাবুর তো নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই দেখছি।

—না-না, যোগাড়-যন্তর সবই তো হয়ে গেছে। ছোটবাবু একটু তদারক কচ্ছেন, এই যা।

—বাবুরা ভাল বাজার সরকার পেয়েছে, কি বলিস?

বিন্দা হেসেও হাসতে পারল না।

—শোন্, যার জন্যে তোকে ডেকেছি, তুই সেদিন কি বলেছিলি ?

—কী বলেছিলাম ?

—যত বয়েস হচ্ছে তত বোকা হচ্ছিস, সেই যো, তোর ব্রহ্মচারী কি যেন বলেছিল ?

—ওঃ, সেই কবচের কথা বলছো ?

—হ্যাঁরে পোড়ারমুখী বুড়ি। সেই কথা।

—তা তুমি তো সব জান। সেদিন তো বললে নেবে না। তাড়িয়েই তো দিলে।

—তা দিয়েছিলাম। হ্যাঁরে বিন্দা, ওতে কিছু হবে ?

বিন্দা মুখটা একটু গম্ভীর করে বলল—কিছু হবে না ? হবে বলেই তো এসেছিলাম। সাক্ষাৎ দেবতা ! হ্যাঁগো বউরাণী, আমার কথা শুনে একবার চল না।

—তোর বড্ড তাড়া। তাই তো ভাবছি। কি করতে হবে ?

বিন্দা যেন অকূলে কূল পায়। এই ক'দিন লজ্জায় ব্রহ্মচারীর সংগে ভালভাবে কথাই বলতে পারেনি। ব্রহ্মচারীর বড় সাধ ছোট বউরাণীকে দীক্ষা দেন। দয়ার প্রাণ। নবীন হলে হবে কি, সত্যিকারের সাধক। তার স্নেহ সেই পেয়েছে। সাধুর দয়া দুর্লভ বৈকি !

বিন্দা বলল—কি করতে হবে জানি না। গেলেই সব বুঝতে পারবে।

কৃষ্ণাকুমারী তারপর পালঙ্কের উপর বসে পড়ে হেসে বলল—বোস্, তোদের ব্রহ্মচারীর গল্প বল্ শুনি।

—কতটুকু জানি যে বলব ? কী তন্ময় ভাব ! বড় শান্ত। গণ্ডগোল, হৈ-চৈ তিনি সহ্য করতে পারেন না, একা থাকতে ভালবাসেন।

—সর্বনাশ ! সেও নিঃসঙ্গ নাকি ?

—নাগো, একা নিরিবিলিতে বসে ঠাকুরের কথা ভাবেন।

—নেশা করে না ?

—জানি না।

—আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই ?

—কি জানি বাপু ?

—এর আগে কোথায় ছিল ?

—সন্ন্যাসী লোক, কোথায় ছিল কে জানে ?

—দূর পোড়ারমুখি, কিচ্ছু জানিস না ? দূর হ'।

—সেই ভাল বউরাণী। হাতে এক রাজ্যি কাজ জমে, চললুম।

—যা, দূর হ'। হাসতে থাকে কৃষ্ণাকুমারী।

বিন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে কি মনে করে মহলে না গিয়ে মন্দিরের দিকে পা বাড়াল।

স্নান করে ব্রহ্মচারী গেরুয়া কাপড় সবে শরীরে জড়িয়েছে। বিন্দাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

—কি মনে করে বিন্দে ?

বিন্দা দাঁড়িয়ে পড়ল। আহা, অপূর্ব ! রূপ যেন ঝরে পড়ছে।

—একটা কথা বলতে এলাম ঠাকুর।

—মাত্র একটা কথা ?

—হ্যাঁগো ঠাকুর। বিয়েটা যে এগিয়ে এল, কাজের যেন শেষ নেই। ছোট বউরাণী আমাকে ডেকেছিল।

—তা আমি কি করব ?—ব্রহ্মচারী কি যেন খুঁজছিল।

—তোমার শরণাপন্ন হয়েছে। একটু দয়া না করলে আর নয়। ব্রহ্মচারী হঠাৎ স্থির হয়ে যায়। খুঁজছিল রুদ্রাক্ষের মালা। পেয়েও গেল চট্ করে। হারানো সংগীতের সুর কণ্ঠে ভেসে ওঠে। নতুন করে বাঁচতে হবে।

ব্রহ্মচারী এবার রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরে বলল—বড় শক্ত সাধনা, পারবে কি ?

—তুমি চেনো না ঠাকুর, শুধু বুদ্ধিমতী নয় বড একরোখো।

ব্রহ্মচারী স্থির হয়ে চোখ বুজে বসে থাকে কিছুক্ষণ। স্মৃতির পটে হারিয়ে যাওয়া এক ছবি আবার চোখের উপর ভেসে ওঠে। সেই মন্দির, তাকে ঘিরে জঙ্গলের নিবিড় ছায়া। পথ হারালে রক্ষে নেই। দিনরাত্রি বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ। সেইখানেই চলে যাবে। কেউ সন্ধান পাবে না। লোক পিছু নিলেও মন্দিরের গোপন কক্ষে দু'জনে আশ্রয় নিলে কারো সাধ্যি নেই খোঁজ পায়। হ্যাঁ, কৃষ্ণাকুমারীকে তার চাই।

চোখ খুলে গম্ভীর সুরে বলে—বেশ। সময় মতো ডেকে পাঠালে আমার কাছে আসতে পারবে তো ?

—হ্যাঁ, তা আসবে।

—তোমার মঙ্গল হোক বিন্দে। ভগবানের কি ইচ্ছে আমি জানি না।

—আমি চলি ঠাকুর।

—এসো।

বিন্দা প্রণাম করে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যা হ'তে আর বাকি নেই। বহুদিনের সুপ্ত রক্ত আজ হঠাৎ নতুন সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে তার দুর্বার চঞ্চলতা।

তবু অতীত জীবনের দুঃসহ ব্যথাকে সে ভুলতে পারে না। প্রকৃতির স্তব্ধতায় তার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে। মাঝে মাঝে দু'দশ জন ভক্ত মন্দিরে এসেছে পূজো দিতে। সাধক পিতার মুখে শুনেছে এক অদ্ভুত কাহিনী। ঠাকুর্দা ছিলেন তান্ত্রিক উপাসক। শোনা যায় প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ডাকাত দলের সর্দার। ক্রমে বৃদ্ধ হওয়ার জন্য সেই পথ থেকে সরে আসেন। কিন্তু স্বভাব ছাড়তে পারেননি। তাই তাঁরই নিযুক্ত দু'জন লোক তীর্থযাত্রীদের প্রলোভন দেখিয়ে ঐ মন্দিরে এনে তুলতো। ধনরত্নাদি দেখেই তীর্থযাত্রীদের বাছাই করা হতো। তারপর পূজোর পর রাত্রিতে আশ্রয় দিয়েছেন। পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। ঘুমন্ত অবস্থায় খড়্গের আঘাতে চিরকালের মত ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের। এই ব্যবসা চলছিল বেশ। কিন্তু লোকের কানে গেল। সতর্ক হয়ে উঠল চারদিক। ব্যবসা গেল, অবশেষে তার পিতার হাতে মন্দির তুলে দিয়ে একটি ঝিলের জলে ডুবে মরে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করলেন। পিতা সেই পথে যাননি। সন্ন্যাসী হয়েও সংসারী হয়েছিলেন। চন্দন বড় হয়ে উঠল। একদিন সিন্দুকে দেখল প্রচুর গহনা, অর্থ। লোভ হলো। কিন্তু পিতা জানতে পেরে সবগুলি নিয়ে ঝিলের জলে ফেলে দিলেন। সেদিন চন্দন পিতাকে বাধা দিয়েছিল। শোনেননি পিতা। বলেছিলেন পাপের রোজগার, দেবতার কাল-আক্রোশে তার অমঙ্গল হবে। চন্দন তখনো ব্রহ্মচারী হয়নি। বিদ্রোহী হয়ে উঠল তার মন। একদিন না বলে মন্দির ছেড়ে দূরদেশে পাড়ি দিল। তীর্থে তীর্থে সাধুর আড্ডায় আড্ডায় ঘুরে বেড়াল। সত্যি একদিন তান্ত্রিক হয়ে উঠল। নাম নিল চন্দন ব্রহ্মচারী। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে ঝড়ের ঝাপটায় শুকনো পাতার মত উড়ে এল চারু ব্রহ্মচারিণী। লম্বা ছিপ্‌ছিপে। চোখে আকর্ষণ আছে। হাসিটি পাগল করে। ভারি সুন্দর কথা বলতো।

আখড়ায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। চন্দন ব্রহ্মচারী কম্বলের উপর শুয়ে ক্লান্তি দূর করছিল। হঠাৎ নারী কণ্ঠের সুর ভেসে এল—

—ওমা, ভেতরে কে গো?

উত্তর ভারতের এক অগম্য স্থানে অখ্যাত এক আখড়ায় বাঙ্গালী মেয়ের কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য হলো সে। আখড়ার মালিক বারাণসী কবীর একজন তান্ত্রিক। অনেক আগে মানুষ বলি দিয়ে শবসাধনা করেছে। ইদানীং সে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। আজ তিন দিন হলো তার সাক্ষাৎ নেই।

উঠে বসে চন্দন ব্রহ্মচারী। সন্ধ্যার ম্লান আলো দরজায় এসে পড়েছে। কপাট ধরে দাঁড়িয়ে এক ব্রহ্মচারিণী। চুল খোলা, রুক্ষ চুল হাওয়ায় উড়ছে। কাঁধে ঝোলান কাজ করা কাঁথার থলি। হাসল সে। ঝকমকিয়ে উঠল মুক্তোর মত দাঁতের সারি। আবার বলল—কে গো তুমি?

চন্দন ব্রহ্মচারী বলল—এখানে আগেও এসেছি, কৈ, আপনাকে তো কখনো দেখিনি!

—এ-কথা তো আমিও বলতে পারি গো? কতবার এসেছি, কৈ মনে তো পড়ছে না। বুড়ো বারাণসী শাও বলেনি তো। যাক্, নাই বা হলো অতীত পরিচয়? বর্তমানে আমরা কৈলাসযাত্রী। এ-পথে কদ্দিন?

—এই তো সবে।

—রাঙা চেহারা দেখেই তা মনে হয়। বলে কাঁধের থলি আর লাঠিটা মাটিতে রেখে, কম্বল পাশে বিছিয়ে বসে পড়ে। আবার বলল—রাঙামুলো নয় তো?

—কি মনে হয় আপনার?

—রাত্রিতে একসংগে থাকতে হবে তাই বিশ্বাস করার কথা ভাবছি।

—এই কথা? চন্দন ব্রহ্মচারী শুয়ে পড়ে। আপনি না ব্রহ্মচারিণী?

—হ্যাঁ গো আনারস। বাইরে ধর্মের কাঁটা থাকলে হবে কি ভেতরটা সরেশ। আমি যে মেয়ে গো। তা রাঙামুলো, পেটে কি কিছু পড়েছে?

—না। সবই আছে, কিন্তু বড় ক্লান্ত।

—ঘোড়া দেখেই খোঁড়া? তা সন্ন্যাসী, কোথায় কি আছে বের কর, আমিই না হয় পিণ্ডিটা তৈরি করি।

—ঐ থলিতে আছে।

—তা তোমার নাম কি?

—ব্রহ্মচারী।

—কোন্ গাছের?

—দেবদারু।

—আহা, চিকন পাতার এত শখ? আমার নাম চারু ব্রহ্মচারিণী।

—আমার নাম চন্দন বহ্মচারী।

—ওমা, গন্ধ কৈ?

—আমার গন্ধ নেই, চন্দন গাছের পাশে থাকি।

—উহুঃ, ভাল না। তাই তো এত ভয়। নকল আমি ভালবাসি না।

তারপর চারু ব্রহ্মচারিণী উঠে পড়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে কাজে লেগে গেল পাকা এক গৃহিণীর মত। আটা মাখল, উনুন ধরাল, কাঠে আগুন ধরাতে গিয়ে ধোঁয়ায় চোখ লাল হল। জল পড়তে লাগল দরদর করে।

চন্দন ব্রহ্মচারী শুয়ে শুয়ে চারু ব্রহ্মচারিণীর কাজ করার ভঙ্গি দেখে মোহিত হয়ে যায়। বেশ লাগছে এ রূপ। ভুলে গেল সে সন্ন্যাসী। হঠাৎ ছোট্ট কুটীরে এক নারীর চপল হাতে সংসারের শত ফুল এক সংগে ফুটে উঠল। চন্দন ব্রহ্মচারী বলল—চোখ গেল পাখী।

উত্তর এল না। আপনমনে বিড় বিড় করে বলে চলে চারু ব্রহ্মচারিণী —যতই সন্ন্যাসিনী হও, এর হাত থেকে রেহাই নেই। সবই মরে, পেটটা মরে না কেন?

—কি বলছেন?

লাল চোখ তুলে বলল চারু—শিবের ভোগ তৈরি করছি।

—শিবটি কে?

উত্তর দিল না। শুধু আপন মনে বকেই চলে—মরণ আর কি। এতদূর হেঁটে এলাম, কোথায় জিরুব তা না, খাও খাও। যত শয়তান এই পেটটা।

হাসল ব্রহ্মচারী, নিদ্রার আবেশে চোখ বুজে আসে।

হঠাৎ এক ধাক্কায় তন্দ্রা কেটে যায়। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে ব্রহ্মচারী।

—নাও গো নাগর, এবার আমাকে উদ্ধার কর।

দূরে চাটাই-এর আসন পাতা। শালপাতায় রুটি আর তরকারি।

—আপনার কোথায়?

—খেয়ে নিয়েছি।

—আমাকে ফেলে।

—নাও, ঢং দেখাতে হবে না। বলে কম্বলে গিয়ে বসে পড়ে থলিটা টেনে কি যেন খোঁজে।

খেতে খেতে বলল ব্রহ্মচারী—তরকারিটা বড় সুন্দর হয়েছে।

—তাই নাকি? চুলটা টেনে মাথার উপর খোঁপা বাঁধল। কী সুন্দর একহারা চেহারা।

—আলু পেলেন কোথায় ?

—থলি খুঁজতে গিয়ে পেলাম। যেমনি তোমাকে পেলাম গো।

চন্দন ব্রহ্মচারী মাথা নোয়াল। খেতে থাকে নিঃশব্দে। ব্রহ্মচারিণী উঠে দাঁড়ায়। দোর খুলে বাইরে যাবার জন্য এগোলে চন্দন ব্রহ্মচারী বলে উঠল—এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছেন ?

—সেও কি তোমাকে বলতে হবে নাকি ?

—তা নয়। নির্জন জায়গা। রাত্তিরে একা যাবেন। তাই বলছিলুম।

—এই বিশ্ব সংসারে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি, সে কি তোমার হাত ধরে ? কি গো নাগর, কর্তাগিরি ফলাতে এসেছ ?

তেমনি খেতে লাগল চন্দন। কিছু বলল না।

—অমনি কথা বন্ধ হয়ে গেল। মেয়ে নাকি ? তান্ত্রিক হয়েছ না ? আজ যদি পুরুষ হ'তাম, বাইরে গেলে কিছু বলতে না, মেয়ে বলেই বলছ। বাইরের জানোয়ার খাবে, তা খাক না, তবু ওরা ফেলে খেলে খায় না। আর ঘরের ভীতরে দেহটার ওপর কতই ভিন্ন ভিন্ন রুচি।

—আপনি যান।

—কথাটা শেষ করেই যাই। দেহ আর রূপটাকে নিয়েই তো আমাদের যত জ্বালা। পেট ভর্তি দেহের পচা জিনিস বয়ে বলছি, আমি কী সুন্দর। বলবে, কামনায় সব পুড়ে যায়। আবার এই কামনাই তো মানুষকে নীচের শেষ সীমায় নিয়ে আসে। তাইতো বলছি, কামনা তো মনে। মনটাকে শাসালেই সব ঠিক। দেহটা যদি জিতে যায় তাহলেই হেরে গেলে। তুমি খাও। বলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অদ্ভুত এই চারু ব্রহ্মচারিণী। খাওয়া শেষ করে কি মনে করে বাইরে এসে দাঁড়াল চন্দন। কী সূচীভেদ্য অন্ধকার ! আকাশের তারাগুলি জ্বল জ্বল করছে। ঠাণ্ডা হাওয়া শোঁ শোঁ শব্দে বইছে। আরও এগিয়ে গেল। দূরে পাহাড়ের তলায় আগুন জ্বলছে। খুব সম্ভব চিতা। দু'টি মানুষের মূর্তি ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফিরে এল চন্দন ব্রহ্মচারী। হাওয়ার ধাক্কায় চালাঘর মড়মড় করতে থাকে। কাঠের ভাঙা দরজা। তবু খিলান তুলে দিল। হাসল। বাইরে থেকে অনায়াসে খোলা যায়। তবু শেয়াল ঢুকতে পারবে না। বিছানো কম্বলের উপর গিয়ে শুল। দূরে ছোট্ট কেরোসিনের ডিবায় আলো ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। চোখ জ্বালা করতে থাকে। ঘুম আর আসে না। মনে পড়ে

ায় রংবালি মন্দিরের কথা। পিতার স্নেহভরা কণ্ঠস্বর। সে তো বহুদিন হয়ে গল।

তন্দ্রাটা হঠাৎ কেটে যায়। খুঁট করে একটা শব্দ হোল। দরজা খুলে ায়। এসে ঢুকল চারু ব্রহ্মচারিণী। সে টলছে। তার দিকে একবার াকিয়ে আস্তে দোরে খিলান বন্ধ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে। আঁচল দিয়ে ুখ মুছল। পরিষ্কার দেশী মদের গন্ধ ভেসে এল। ব্রহ্মচারিণী তান্ত্রিক সুরা পান করেছে।

টলতে টলতে তার দিকে এগিয়ে এসে একটু দূরে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। পিছন দিকে হাত রেখে হেলান দিয়ে বসে চন্দনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘন নিঃশ্বাসে সুপুষ্ট বক্ষ ওঠানামা করছে—রক্তিম আয়ত লোচনের নীচে নিটোল গণ্ডদেশ মৃদু কম্পনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চন্দন চোখ ফেরাতে পারে না। রক্তে রক্তে কণিকার শুরু হোল উল্লাস ছুটোপুটি। নিঃসীম আকাশে ঘটে ঘন ঘন উল্কাপাত। উঠে বসে চন্দন ব্রহ্মচারী। এগিয়ে যায় তার দিকে। সবেগে তার বাহুদ্বয়ের উপরিভাগ চেপে ধরে। চমকে উঠল না চারু ব্রহ্ম-চারিণী। কোন কথা বলল না, শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে একটা করুণ হাসি হাসল। তারপর আস্তে আস্তে তার হাত দু'টোকে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ একটা অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে। পরক্ষণেই আবার গম্ভীর। চন্দন নির্বাক। হিংস্র ক্ষুধিত শার্দুল যেন জাদুকরের চাবুকে নিঃসাড় হয়ে পড়ে।

নীরবতা ভঙ্গ করে চারু ব্রহ্মচারিণী সহজ ভাবে বলে চলে—শ্মশানে গিয়েছিলাম। দেখলাম, কী সুন্দর একটি মেয়ে কেমন ধারা পুড়ে যাচ্ছে। কী সুন্দর! যখন বেঁচেছিল কতই না সোহাগিনী ছিল। যা দেখগে, মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়েছে। গায়ের টুকটুকে চামড়া কুঁচকে ফেঁপসে উঠেছে। কী বীভৎস, কী কুৎসীত। একটু থেমে আবার বলে চলে—দেহটা কিছু নয়রে। ঐ মেয়েটা, তার গাঁয়ের লোক আর তার স্বামীর কাছে কি রেখে এল বল দিকিনি? শুধু মনটা।

চন্দন তার প্রতি স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলে—তবে সৃষ্টির প্রয়োজন কি?

—ঠিক তোমার মত একদিন বারাণসী কবীরও বলেছিল। লোভও হয়েছিল আমার দেহটাকে। গুরুদেব। বুঝিয়ে বললাম, এ নদীর এপারে আমরা নেই। সাঁতারে ওপারে গিয়েছি। সেখানে দেহ, সৃষ্টি কিছু নেই। কৈলাসধাম। থাকার মধ্যে আছে সুরা। শুধু খাও আর সমস্ত রিপুকে ঘুম পাড়িয়ে আত্মদান কর। শুনলে না। দিলাম দেহটাকে। ভোগ করেই বারাণসী

কবীর ঘেন্নায় ছেঃ ছেঃ করে উঠল। বলল—কী নেংরা—কী নোংরা। যেন একথালা পচা মাংস খেয়ে উঠেছে।

—তবে কেন ঐ রকম পাগল করা রূপ? দেহের কূলে এত যৌবনের স্রোত কেন?

—ওঃ, এই দেহটার কথা বলছিস্! পাগল। যৌবনটাকে পারাপারের তরী বলে ধর না? তাই তো একশো দু'শো মাইল অম্লানে হেঁটে চলে যাই। যৌবন না থাকলে কী হতো রে? দূর তুই বড্ড খারাপ। সন্ন্যাসী হবি না ছাই হবি। বলে চারুব্রহ্মচারিণী উঠে পড়ে নিজের কম্বলের উপর গিয়ে বসে পড়ে।

চন্দন ব্রহ্মচারী চোখ বুজল। দেহের রক্তে চঞ্চলতা কমে আসে। এক ক্লান্তিতে শরীর অবশ হয়ে এল। ভাবতে সে পারে না। তারপর কখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল।

ভোরে উঠে চারু ব্রহ্মচারিণীকে আর খুঁজে পায়নি। কিন্তু, সে ভুলতে পারে না। তার কালো রূপ যে জীবনটাকে ঝড়ের মত বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে।

তারপর বহুদিন বহুদেশে ঘুরেছে এক অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে। মন্ত্র নিয়েছে, কিন্তু সে শুধু একটা অছিলা মাত্র। চারু ব্রহ্মচারিণীর দেখা পায়নি। আরও কত ব্রহ্মচারিণীকে দেখেছে, সম্পর্কও দানা বেঁধে উঠেছে কিন্তু কেউ তার মনে দাগ কাটতে পারেনি।

একদিন ক্লান্ত শরীর নিয়ে বড় এক আখড়ায় এসে উঠল। সাধুদের ভীড়। ছোট্ট ছোট্ট কুটীর। ক্ষিধেও পেয়েছিল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। শুনল, সাধুরা সবে খেতে বসেছে। সেও তাদের পাশে গিয়ে থালা রেখে বসে পড়ল। রুটির ঝুড়ি নিয়ে অন্নপূর্ণা এল। চমকে উঠল। চারুব্রহ্মচারিণী! গেরুয়ার পাত্‌লা কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা। ঐ সেই ডাগর চোখ। মিষ্টি হাসি লেগে ঠোঁটের কোণে। উন্মাদ হয়ে গেল চন্দন ব্রহ্মচারী। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। রুটি দিতে দিতে তার কাছে এসে দাঁড়াল চারু। বলল—কিগো নাগর, এখনও এই পথে রয়েছে? অবজ্ঞায় কথাগুলো যেন ঠোঁট থেকে ছুঁড়ে দিল।

রুটি দিয়ে চলে গেল। তরকারি, রুটি তেমনি পড়ে থাকে। সকলে খেতে শুরু করে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সাধুরা 'মাইজী' বলে বার বার ডাকে। ব্রহ্মচারিণী হাসে। ঠিক যেন জননী, তার সব ছেলে এক সংগে খেতে বসেছে।

সকলে খেয়ে উঠে চলে যায়। চন্দন ব্রহ্মচারী তেমনি বসে রইল। হঠাৎ খেয়াল হলে উঠে দাঁড়ায়। সোজা দূরে একটি কুটীরের দোরে এসে দাঁড়াল। মাথায় বাঁশে বাঁধা এক টুকরো লাল কাপড়। লক্ষ্য তার ভুল হয় নি। দোর ঠেলে ভিতরে গিয়ে দোর ভেজাতে গেলে চারু ব্রহ্মচারিণী বলল —একেবারে বন্ধ করে দাও।

—কেন ?

—দেখে ফেললে নিন্দে করবে। বলবে, কেমন ধারা সন্ন্যাসী ?

—তোমার ভয় করে না ?

—কী বোকা রে ! মায়ের কাছে ছেলে এলে ভয় করবে কেন ?

—আমি তোমার মাতৃরূপ দেখতে চাই না চারু !

—কী রূপ ? প্রেমরূপ ? হ্যাঁগো সন্ন্যাসী, তোমার নামটা কী যেন—ভুলে গেলাম।

—চন্দন ব্রহ্মচারী।

—ব্রহ্মচারী ! হেসে ওঠে চারু ব্রহ্মচারিণী। আবার সেই ব্যঙ্গোক্তি।

চন্দন ব্রহ্মচারী এগিয়ে এসে হঠাৎ তার আঁচলটা ধরে ফেলে দৃঢ় স্বরে বলে উঠল—আমার সংগে তোমাকে যেতে হবে।

—কোথায় ?

—যেখানে ইচ্ছে।

—কাপড়টা ছাড। সহসা মুখটা গম্ভীর হয়ে যায় চারু ব্রহ্মচারিণীর।

চন্দন ব্রহ্মচারী কাপড ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার ভয়ংকর মূর্তি দেখে চারু ব্রহ্মচারিণী বলল—পাগলামো করো না। এই আমার পাশটিতে এসে বসো। আমি বড় দুর্বল।

থমকে দাঁড়ায় চন্দন।—শরীর অসুস্থ ?

—সারাদিন একটিবার খাই, তাও খেতে দিলে না।

—আমি তোমাকে খেতে দিইনি ?

—হ্যাঁ তো। তুমি খেলে না কেন ?

—শোন চারু ! শেষ কথা আমি তোমার মুখে শুনতে চাই। তুমি আমার সংগে যাবে কি না ?

—নিয়ে গিয়ে কি করবে ?

—কেন তুমি তা বোঝ না ?

—বুঝি আমি সব, তবু—

—স্ত্রী হিসেবে আমার পাশে থাকবে।

—দূর বোকা। দু'জনেই কৈলাসযাত্রী। এতদূর এগিয়ে এসে আবার পিছন ফিরবি?

—কোন কথা আমি শুনবো না। আমি তোমাকে চাই। দেশদেশান্তর তোমাকেই খুঁজে বেড়িয়েছি।

—ওমা তাই নাকি? এখন তাহ'লে আমাকে কি করতে হবে?

—এখুনি আমার সংগে চল।

—কী হবে গিয়ে? তার চেয়ে এখানেই থাকি। এই পাশাপাশি। হাত বাড়ালেই আমাকে পাবে। তারপর হঠাৎ একটা অট্টহাসি তুলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে চারুব্রহ্মচারিণী। একটু থেমে, সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—এসো আমার সংগে। শেষে তুমিও পথ ভুল করলে!

তার পিছু পিছু চন্দন ব্রহ্মচারী চলে। আখড়া ফেলে ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে ক্রমে তরাই দিকে নেমে যায়। চারদিকে পাথরের স্তূপ। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে জলের কলকল ধ্বনি। হোঁচট খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে দু'জনে এগিয়ে চলে সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে। পিছনে তাকাল। বহুদূরে সেই লাল নিশানা, ফিরে যাবার নিশানা দেয়। থামে না। পাথরের দেওয়াল ধরে ধরে দুজনে চলতে থাকে।

চন্দন ব্রহ্মচারী থমকে দাঁড়ায়। বলে—কোথায় চললে?

—দেখলে নাগর, সাধনার পথ কত কঠিন। একটু আসতেই হাঁপিয়ে পড়লে! কত শংকা মনে উঁকি মারছে। এই, আমার হাত ধর।

চন্দন ব্রহ্মচারী তার হাত ধরে এক হ্যাঁচ্‌কায় বুকের কাছে টেনে আনলে চারু ব্রহ্মচারিণী মুখের উপর হাত রাখে একটা শব্দ করে—হিসস্‌! তারপর চুপি চুপি বলে—ধর্মের হাওয়া এখানে খেলছে। কামনায় সর্পের জন্ম। প্রাণ পেয়ে জেগে উঠলে এখুনি ছোবল মারবে।

ছেড়ে দেয় চন্দন। আবার দু'জনে চলতে শুরু করে।

অবশেষে এসে দাঁড়াল একটু খোলা জায়গায়। দূরে পাহাড়ের ফাটল থেকে লক্ষ ফনা মেলে শূন্যে তাতডালি দিয়ে জল নীচে নেমে আসছে। ঝর্ণা। বিকট শব্দে জল আছড়ে পড়ছে। ফেনায় ফেনায় জলের উর্ধ্বশ্বাস।

—বল, কী চাও? কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে চারু ব্রহ্মচারিণী।

—আমি তোমাকে চাই।

—তাহ'লেই খুশি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এতে তোমার ক্ষুধার্ত আত্মা শান্ত হবে?

—হবে।

—যদি আরো চায়, আরও, অনেক?

—তুমি থাকবে আমার পাশে।

—কিন্তু যদি আমি বলি সারা জীবনের ক্ষুধা এক রাত্রিতে সব মিটিয়ে নিতে চাই, পারবে দিতে?

—ক্ষুধা একবারে মেটে না।

—তবে আমার দেহটাকে পেয়েও একদিন বলবে, ঐ আকাশ চাই, বাতাস চাই, তন্ত্র চাই, সাধনা চাই।

—সেদিনও তুমি আমার পাশে থাকবে।

—তখন যদি যৌবন না থাকে? সত্যিকারের মাতৃরূপের বাঁধনে পড়ি? তুমি পুরুষ। মুক্ত। পালিয়ে আসবে আমাকে ফেলে। তার চেয়ে দেহটাকে ছেড়ে এই মনটাকে নাওনা, যেভাবে ইচ্ছে?

—তা হয় না। আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পেতে চাই।

—বেশ, তাই হবে। ভালবাসাও তুমি চাও না। সাধনার পথ থেকে তুমি সরে আসতে চাইলেও আমি তোমাকে সরিয়ে আনি কি করে? তবে অপেক্ষা কর। আমি চান করে আসি।

—ঐ সাংঘাতিক ঘূর্ণি জলে!

—আমি রোজই ওখানে চান করি।

চারু ব্রহ্মচারিণী ধীরে ধীরে জলে গিয়ে নামল। জলের লক্ষ কণার কুজ্ঝটিকায় সে আড়াল হয়ে যায়।

বেলা শেষ হয়ে আসে। সন্ধ্যাও পায়ে পা ফেলে নেমে এল, চারু ব্রহ্মচারিণীকে আর দেখা গেল না।

চন্দন ব্রহ্মচারী সেদিন পাগলের মত জলের চারধারে চীৎকার করে খুঁজেছিল—ফিরে এস চারু—ফিরে এস। হঠাৎ দেখে, দূরে গেরুয়া বসন পড়ে। তুলতে গেল কিন্তু এক দমকা হাওয়ায় উড়ে গিয়ে সেটা পড়ল জলে। ঘূর্ণি জলের টানে তলিয়ে গেল তার গেরুয়া কাপড়।

চারু ব্রহ্মচারিণী আর উঠে এল না।

অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে চন্দন ব্রহ্মচারী সেদিন সকলের অলক্ষ্যে ঐ স্থান ত্যাগ করে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করল। মন্ত্র রইল মন্ত্রের জন্য। তন্ত্রের সাধনা

শুরু হলো নারী নিয়ে। জীবনে অনেক নারী এল কিন্তু শুধু অতৃপ্তির বোঝা আরও ভারি করে দিয়ে সরে গেল। শান্তি নেই কোথাও। ফিরে এল রংবালি মন্দিরে। পিতা মন্দিরের ভার তার হাতে দিয়ে তীর্থে যেতে চাইলেন, কিন্তু তা সে নিতে পারল না।

অবশেষে এসে হাজির হোল এই হলুদপুরমল্লায়। সোজা গিয়ে দেখা করল বড়কর্তা সূর্যজিতের সংগে। মন্দিরের ভার এককথায় তাকে দিয়ে দিলেন। ভাবল, আর নয়, মনেপ্রাণে এবার ঠাকুরকে ডাকবে। কিন্তু তা আর হোল না।...

অতীত স্মৃতির তন্দ্রা এক ডাকে কেটে যায়। দোরে দাঁড়িয়ে মন্দিরের এক সেবক। আরতির সময় হয়ে গেছে।

সত্যি তো সন্ধ্যা হতে বাকি নেই। তাড়াতাড়ি খড়ম পায়ে দিয়ে মন্দিরের দিকে চলল।

আজ পূজো করতে গিয়ে বারবার কেবল ভুল হচ্ছে। শিবের মাথায় জল দিতে গিয়ে দিল ফুল আর ফুল দিতে গিয়ে জল। অতীতের স্মৃতি শত হাত মেলে তাকে বিভ্রান্ত করে তোলে।

পূজো শেষ হলো। ফুল আর চরণামৃত নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভক্তদের চরণামৃত বিতরণ করে চিকের ভিতরে এসে দাঁড়াল। বউরাণীরা সব গহনার শব্দ করে উঠে দাঁড়ায়।

আজ কৃষ্ণাকুমারী চোখ মেলে নিঃসংকোচে ব্রহ্মচারীর দিকে তাকাল। সত্যিই রূপবান! সুন্দর তার দু'টি বাহু। হায়রে, কেন সন্ন্যাসী হলো। ঐ বাহুর বন্ধনে কোন্ নারী নিজেকে ছেড়ে দিতে চাইবে না? আলাপ থাকলে বলতো বিয়ে করতে। ইন্দ্রজিৎকে পেয়ে সেও তো নিজেকে কম সৌভাগ্যবতী মনে করেনি। কিন্তু কী হলো! আজ মনে হচ্ছে সত্যি ব্রহ্মচারী তাকে উদ্ধার করতে পারবে। ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে সে চলে যাবে দূরে—বহুদূরে। জানে, এটা নারীর পক্ষে কতখানি লজ্জাকর। মনে যাকে পেল না, তাকে শেষে কি না মন্ত্রের জোরে কাছে টেনে আনবে! নাঃ, যাই ঘটুক, তা সে করবে।

ব্রহ্মচারী এগিয়ে এসে হাতে দিল একটি বিল্বপত্র আর একগুচ্ছ তাজা রজনীগন্ধা। কপালে ছুঁইয়ে খোঁপায় গুঁজল ছোট্ট স্তবকটি। বড়বউ ফিস্ ফিস্ করে বললেন—ঠাকুরের ফুল খোঁপায় রাখতে নেই।

এক লজ্জায় কৃষ্ণাকুমারী চোখ মেলতে ব্রহ্মচারীর সংগে চোখাচোখি হয়ে যায়। ফুলগুচ্ছটি তাড়াতাড়ি চুল থেকে খুলে পিছিয়ে পিছিয়ে চলতে শুরু

করে। নূপুরের নিক্কণও আজ যেন রসিকতা করে, পায়ের তালে খিল খিল করে হেসে ওঠে। রাঙা ঠোঁট কামড়ে নূপুরের দিকে তাকিয়ে বলল—যাও, বেশ করেছি ফুল খোঁপায় গুঁজেছি। ওরকম করলে কাল থেকে পায়ে আর ঠাই দেবো না।

নন্দীমহল এক উৎসবে মেতে উঠেছে। আলো, বাজনা আর লোকের হৈ-হুল্লোড়ে মহলে মহলে উল্লাসের তুফান ছুটছে। রঘুনাথের বিয়ে। দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসছে। লছমিখালে নৌকার ভীড় জমেছে। কারো নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। নহবৎ খানায় সেই সাত দিন ধরে কত বিচিত্র রাগে সানাই বেজে চলেছে। সিংহদ্বার দামামার ঝংকারে মুখর।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ বউ নিয়ে আসবে, ত্রিশ মাইল দূর থেকে একশো পাল্কীর বেয়ারার হুম হুম আওয়াজ যেন ভেসে আসছে।

ক্লান্ত ইন্দ্রজিৎ উৎসব-মুখর প্রাসাদ পিছনে ফেলে পড়ো জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল। তুল্‌ভি এই মাত্র বলে গেল নটবর ঠাকুরের অবস্থা ভাল নয়। বিকেলে কৈলাস চৌধুরী হঠাৎ ওখানে গিয়ে ঝগড়া করে আসার পরই নটবর ঠাকুরের অবস্থা খারাপের দিকে গেছে। সে ওখানে কেন গিয়েছিল তা তুল্‌ভি বলতে পারল না।

একবার থামল। দূরে উৎসব-মুখর মহল। কী অদ্ভুত আভিজাত্যের প্রকাশ! জমিদারের আদুরে কন্যা আসছে নন্দীমহলের বউরাণী হয়ে। এই আসছে আর কোনদিন সে বাপের কাছে ফিরে যেতে পারবে না। তা জেনেও এই দেবী বিসর্জন কেন? শুধু মোহ, শুধু ঐশ্বর্যের প্রলোভন।

নটবর ঠাকুরের কুটীরে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। মাত্র একমাস পরে এলো। এরি মধ্যে কয়েকবার তার আসা উচিত ছিল, কিন্তু পারেনি। কাছারি বাড়ীতে কাজের চাপ, তারপর মানসিক অস্বস্তি।

দোর ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল। আঁৎকে উঠল নটবর ঠাকুরের চেহারা দেখে। একটি চামড়ায় ঢাকা কঙ্কাল শুয়ে। মাথার কাছে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। বেড়ায় ঝুলছে একটা রুদ্রাক্ষের মালা। বহুদিন ব্যবহৃত হয়নি, ধূলি-ধূসরিত। দূরে বসে একটি শীর্ণকায়া কিশোরী। এর আগে দেখেনি। ইন্দ্রজিৎকে দেখে সে উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি চাটাইটা এগিয়ে দিল।

—বসো ইন্দ্রজিৎ। ক্ষীণকণ্ঠে নটবর ঠাকুর বলে।

ইন্দ্রজিৎ চাটাইএর উপর বসল। নাকে ভক্ করে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ঢুকে মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে।

—বড় কষ্ট হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ।

—কিসের কষ্ট ঠাকুর?

—বড় বিশ্রী গন্ধ। এই দেহটা পচতে শুরু করেছে বোধহয়।

—আপনি ওষুধ খাননি কেন?

—খেয়েছি। কিন্তু লাভ নেই। কালরোগের ওষুধ কোথায়! অসুখটা কোথায় জান ইন্দ্র? এই মনে, এই বুকের ভেতরটায়।

কাশতে থাকে নটবর ঠকুর। তারপর কোটরগত চোখ তুলে মেয়েটির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—ঐ যে মেয়েটাকে দেখছ, সর্বনেশে, যত রাগ আমার ওটার ওপর।

ইন্দ্রজিৎ আশ্চর্য হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। আধময়লা কাপড় পরে জড়ো সড়ো ছোট্ট একটি মেয়ে। অধোমুখে পায়ের নোখ দিয়ে মাটি খুঁটছে।

আশ্চর্য হয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল—ও আবার কি করলে?

—জান ইন্দ্র, ওর ঘেন্না নেই, অভিমান নেই। শুধু হাসি আর হাসি, আর দু'হাতে ময়লা পরিষ্কার করতে ওস্তাদ। কত ছোট্ট বয়সে ভগবান লাভের সব কলাকৌশল আয়ত্ত করেছে। তাইতো এত রাগ ওর উপর। কলী—! একটু জল দেতো মা।

মেয়েটি উঠে যায়। তারপর নটবর ঠাকুরের মুখে জল দিয়ে ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বাইরে চলে গেল।

—কৈলাস এখানে এসেছিল? মাথাটা নীচু করে প্রশ্ন করে ইন্দ্রজিৎ।

নটবর ঠাকুর চোখ বুজে থাকে।

—আপনার সংগে কী নিয়ে ঝগড়া করে গেছে?

নটবর ঠাকুর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর বলে—এখানে এক মহল তৈরী হবে, তোমাদের নাচন ঘর, তাই এখান থেকে সরে যেতে বলছিল।

—তা ওকে এত সাহস কে দিয়েছে?

—ভাগ্য দিয়েছে। আজ আমার এই অবস্থা কেন জানো ইন্দ্রজিৎ? জানো না। বড় স্বার্থপর, বড় হিংসুটে ছিলাম আমি। ঠাকুরকে এমনিভাবে আগলে রাখতুম যেন ঠাকুর একমাত্র আমার বাপের সম্পত্তি। ঐ যে কলী, বয়সে ছোট্ট হলে হবে কী, ভগবান পেয়ে গেছে। হাঁপিয়ে পড়ে নটবর ঠাকুর।

—আপনি বেশী কথা বলবেন না।

—না ইন্দ্র, শেষ কথা, সব বলে যাই।

—না ঠাকুর, এ আপনার ভুল ধারনা। অস্থির হবেন না। আপনি ভাল হয়ে উঠবেন। ভগবান শিবশম্ভু আছেন।

—ভালবাসত! সত্যি শিবশম্ভু ভালবাসত! নটবর ঠাকুরের কথা থেমে যায়। এক উত্তেজনায় তার কণ্ঠস্বর মাঝপথে রুদ্ধ হলো।

—কলিকে ডাকব? ইন্দ্রজিৎ ভয়ে শিউরে উঠে।

হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে নটবর ঠাকুর—সত্যি যদি শিবশম্ভু আমাকে ভালবাসত তবে ওভাবে মন্দির থেকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে কেন? কেন আজ এই কালরোগে কষ্ট পাচ্ছি? কেন তোমাদের কৈলাস এক গাদা গালি-গালাজ করে গেল? কেন—কেন? ওর কি বাবারটা খাই? বলে, চলে যাও। আরও বলে, দেহটাকে শেয়াল কুকুরকে দাও গে কিছুটা রস পাবে। এরপরে শুকনো হাড় ছাড়া কিছু জুটবে না। ওর এত সাহস!

ইন্দ্রজিতের মুখে মুহূর্তে নেমে এল তুফানের কর্কশরূপ। ঠোঁট কামড়ে উঠে দাঁড়াল।

নটবর ঠাকুর আবার বলে—আরও কি বলে জান ইন্দ্র, পাপে নাকি আমাকে ধরেছে।

ইন্দ্রজিৎ চাপাস্বরে বলে—শয়তানটার পিঠে চাবুক না মারলে শিক্ষা হবে না। অসহ্য! লোকটার অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

একটু থেমে আবার জোর গলায় বলে উঠল—ঠাকুর, কিচ্ছু ভাববেন না, ওকে কেমন করে শাস্তি দিতে হয় আমি জানি। ওর গায়ের চামড়া তুলে না নেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। চলি ঠাকুর! কাল আসব।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে নটবর ঠাকুরের দিকে তাকাতে আস্তে বলল সে—একটু বসো ইন্দ্র। ওকে কিছু বলো না।

চোখ বুজল নটবর ঠাকুর। উত্তেজিত নটবর ঠাকুরের দেহটা হঠাৎ নিথর হয়ে যায়। কী ভেবে ইন্দ্রজিৎ আবার চাটাইএর উপরে গিয়ে বসল।

চোখ খোলে নটবর ঠাকুর। তারপর মুখটি তার দিকে হেলিয়ে আস্তে বলল—ইন্দ্রজিৎ, সময় হয়ে এসেছে। সাবধান!

ইন্দ্রজিৎ বিস্ময়ে তাকায়।

—মন্দিরে পড়ে থাকলেও হলুদপুরমল্লাকে আমি ভালবেসেছিলাম। এখানে অত্যাচার আছে, উচ্ছৃংখলতা আছে, তাছাড়া একটা ভাল জিনিস

আছে সেটা তোমাদের মন। মাঝে একবার ঘেন্না হয়েছিল। তোমাকে দেখে সেই ভুলও ভেঙ্গে গিয়েছে। তাই বলছি, সাবধান!

—আমি জানি ঠাকুর, আপনি কি বলতে চান।

—হ্যাঁ। তোমার দেহে তাদেরই রক্ত আছে। সাবধান! কৈলাস নতুন মহল করতে চায়। হায়রে, ও জানে না বেশীদিন আর নয়। এই মহলে একদিন শেয়াল বাসা বাঁধবে। কথা বন্ধ হয়ে যায়। কাশতে থাকে নটবর ঠাকুর। হাত দিয়ে ইশারা করে ইন্দ্রজিৎকে চলে যেতে বলে।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠল—কলী! কলী ঘরে দৌড়ে আসে। নটবর ঠাকুরের কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। দেখতে পারে না সে এই দৃশ্য। দোরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ এক আতংকে তার দেহ শিউরে ওঠে। ক্ষয় রোগ। এই ছোট্ট মেয়েটি কার! কে দিলে এমনিভাবে মরণের মুখে ঠেলে! সব শ্রদ্ধা-করুণা ঠেলে এক ভীতির ছায়া এসে দাঁড়ায়। কি মনে করে পিছনে তাকায়। নটবর ঠাকুর তার দিকে তাকিয়ে। চোখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। যেন বলছে—তুমি দাঁড়াও ইন্দ্র, আমি তোমাকে শেষ দেখা দেখেনি।

ইন্দ্রজিৎ মন্থর পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। একরাশ মুক্ত হাওয়া তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শূন্যে নিঃসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো। লক্ষ নক্ষত্র খচিত আকাশ যেন নতুন সাজে সেজেছে। এক টুকরো মেঘ নেই। তারি নীচে ঝোপঝাড়ে ঢাকা সরু পথ এঁকে বেঁকে দূরে চলে গেছে। মহল থেকে ভেসে এল সানাইএর সুরমূর্ছনা। ঠাকুরের কথা কানের ভেতর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—'বেশী দিন আর নয়'। একটা দীর্ঘশ্বাস ইন্দ্রজিতের বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। হঠাৎ চমকে উঠল ভুল্‌ভিকে দেখে।—তুই এখানে?

—কলীকে দেখতে এসেছিলাম।

ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।—মেয়েটি কে?

—আজ্ঞে, আমার মেয়ে।

—তোর মেয়ে! ঠাকুরের কি হয়েছে তুই জানিস?

—জানি হুঁজুর।

—তা জেনে শুনে—

—কিছু হবে না। ঠাকুরের সেবা করছে। ভয় কি?

—বড্ড ছোঁয়াচে রোগ। আর লোক পেলি না?

—কলী ছাড়া আর কেউ নেই হুঁজুর।

—আশ্চর্য !

—আশ্চর্য নয় হুজুর। আপনারও কিছু হলে আমি কি ছেড়ে চলে যেতাম ? কখনও না।

অশ্চর্য হয়ে ইন্দ্রজিৎ দেখল দুল্‌ভির মুখে এক তৃপ্তির হাসি ।

ইন্দ্রজিৎ চলতে শুরু করে। এতক্ষণে বুঝতে পারে বিরাট বিরাট জমিদারির মাটিতে এত জোর কিসের। এমনিধারা সহিষ্ণু অনুগত লোকের দয়ায় তাদের এত প্রতাপ। রুক্ষ পাহাড়ে ঝর্ণার শীতল জলধারা। অদ্ভুত আত্মত্যাগ। দুল্‌ভি তার ছায়া। কী নির্ভীক তার সত্যনিষ্ঠা।

বড় বড় দামামার প্রচণ্ড শব্দে তার চিন্তাধারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

আলোতে সাজানো হয়েছে মহল। সিংহদ্বারে পাল্কীর মেলা। নতুন রঙ-বেরঙের সাজে পাইক বরকন্দাজ ভীড় ঠেলে মহলের চারপাশ বাঁচাচ্ছে। রঘুনাথ ফিরে এসেছে। বধূবরণ এতক্ষণে হয়তো হয়ে গেছে। ইন্দ্রজিৎ হাসল। তারপর দুল্‌ভিকে চলে যেতে বলে মহলের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু যাওয়া আর হলো না। এক অশ্বারোহী তার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোড়ার পিঠ থেকে লোকটা নামল। ঝলমলে পোশাক পরায় প্রথমটা চিনতে পারেনি। হাঁপাচ্ছে কৈলাস চৌধুরী। সাদা মুখ লাল হয়ে গেছে।

—আপনাকেই খুঁজছিলাম।

—তা ঘোড়া নিয়ে কি দেশান্তরে গিয়েছিলেন ?

—রঘুনাথকে নিতে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

—আমাকে কেন খুঁজছিলেন ?

—নটবর ঠাকুরের সংগে একটু ঝগড়া হয়ে গেল। কথা শুনলে না। বললাম ওখানে একটা মহল তৈরী হবে, তাই—

কথা শেষ হবার আগেই ইন্দ্রজিৎ গর্জে উঠল—এমনিভাবে নিজের শক্তির অপচয় করেন কেন ?

—বড়কর্তা বলেছিলেন—

—কী বলেছিলেন ?

—বলেছিলেন, ওখানে রঘুনাথের জন্য একটা মহল তৈরি করতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ চীৎকার করে উঠল—তাই বলে এখুনি ? নটবর ঠাকুরের অসুখ, আপনি তা জানেন না ?

কৈলাস চৌধুরী মাথা নোয়াল। ইন্দ্রজিতের এমন ভয়ংকর রূপ এতদিন দেখেনি বা আশাও করেনি।

—নটবর ঠাকুরকে দেখে পাষণ্ডেরও মায়া হয়, আর আপনি এত নীচ—এত—যান। আপনার ব্যবহারে আমি খুবই অসন্তুষ্ট।

কৈলাস চৌধুরী অপমানে মুহ্যমান হয়ে চলতে শুরু করে আবার একডাকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—শুনুন ! ঝালরের বাতি দেখবেন তাই বলে তলায় নামিয়ে মোমবাতিতে হাত দেবেন না। যদি দেন তাহলে এই পায়ের তলায় গলা টিপে সেই শখ একেবারে মিটিয়ে দেবো !

ক্রোধে ইন্দ্রজিৎ থরথর করে কাঁপতে থাকে। তার দিকে একবার তাকিয়ে মন্থর গতিতে মহলের দিকে চলে গেল। কৈলাস চৌধুরী তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। রক্তের উত্তাপে জ্ঞান হারা হবার উপক্রম হলো। কিন্তু তা সামলে নিয়ে ইন্দ্র-জিতের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বকতে লাগল—আমারও নাম কৈলাস চৌধুরী। শয়তানিতে তুমি ছেলেমানুষ। এক লাফে ঘোড়ায় চেপে একরাশ ধুলো উড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

কৃষ্ণাকুমারী তাড়াতাড়ি চলে আসে। ভাল লাগল না তার বধুবরণ। বেশ মিষ্টি নাম—প্রবালী, পদ্ম-পলাশের মত ঢলঢলে মুখখানিতে কী অদ্ভুত এক জ্যোতি। হায়, সে তো জানে না তার কপালে কতখানি দুর্ভাগ্য জমা হলো। রাঙা মুখখানিতে নেমে আসবে আষাঢ়ে মেঘ। বড় বউরাণী ভাং খেয়ে অসলগ্ন কথায় অযথা হাসির দমকায় ভেঙ্গে পড়ছেন। অন্যান্য বউরাণীদের কুৎসীত ইঙ্গিত আর রঘুনাথের কটা চোখের লোভাতুর নির্লজ্য চাহনি সে সহ্য করতে পারছিল না। শয়তানের গুরু। এতটুকু বয়সে বাপ-কাকাদের ছাড়িয়ে গেছে।

দোর ভেজিয়ে পালঙ্কে এসে বসল। রাত অনেক হয়েছে। দামামার আওয়াজ থেমে এসেছে। সানাই এখনও বাজছে। মহলের পুরুষরা উৎসবের আলোতে সুরা মুখে তুলে এতক্ষণে বাইজীদের ওড়নায় মুখ ঢেকেছে। হঠাৎ এক শব্দে জানালার দিকে তাকাল। বাজি ফুটছে। আকাশে খেলছে কত রঙ্‌বেরঙের উড়ন্ত বাজি। উঠে গিয়ে জানালায় টেনে দিল পর্দা। সে সইতে পারে না। একি মিলন ? না, আর সে ভাববে না। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। দোর খোলা। পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের ঝালরের আলোকচ্ছটা ঘরে এসে পড়েছে। হাওয়ায় পর্দা কাঁপছে। সংগে আলোও ভেঙে পড়ছে হাজার টুকরোয়। কৃষ্ণাকুমারী তাকিয়ে থাকে—।

এই ঘরটার প্রতি তার একটা মায়া পড়ে গেছে। সে যাই ভাবুক, যাই করুক, কোন প্রতিবাদ করে না। গভীর নীরবতার মাঝেই নিগূঢ় সহানুভূতির আত্মপ্রকাশ। এই নিশ্চল দেয়ালগুলো তার সত্যিকারের বন্ধু।

হঠাৎ পর্দা সরে যায়। একরাশ আলো ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘরে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। আধবোঝা চোখ মেলে ধরে কৃষ্ণাকুমারী উঠতে গিয়েও উঠল না। ইন্দ্রজিৎ আসুক—কানে মুখ দিয়ে ডেকে তাকে কাছে টেনে নিক। ভাল করে চোখ বুজল। কৈ সে তো এল না! কপালে নিঃশ্বাস পড়ে না, দেহেও কোন স্পর্শ অনুভব করল না। আবার চোখ মেলে। ইন্দ্রজিতের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। হাসল কৃষ্ণাকুমারী। ইন্দ্রজিৎ কিন্তু হাসল না।

উঠে বসল কৃষ্ণাকুমারী। শিবনেত্রের দীর্ঘ ঘন পল্লবে এক সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

ইন্দ্রজিৎ এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নির্বাক, গম্ভীর।

কৃষ্ণাকুমারী পালঙ্ক থেকে নেমে ইন্দ্রজিতের কাছে এসে দাঁড়াল। আলুলায়িত কেশরাশি সারা পিঠ ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্দ্রজিৎ কেন যেন চমকে উঠল কৃষ্ণাকুমারীর পাগল করা রূপে। এক বহুদিনের চাপা পড়া সুর আজকে ছাড়া পেয়ে আবার বেজে উঠেছে। অনুভব করল এক নতুন কামনা। কৃষ্ণাকুমারী তো চায় তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হতে। কিন্তু তার কি উপায় আছে? সবই আছে, তবু কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক। কোন উত্তর নেই—সমাধান নেই। আছে শুধু ভাবনা আর ক্রন্দন।

কৃষ্ণাকুমারী হেসে বলল—আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছ?

ইন্দ্রজিতের সম্বিৎ ফিরে এল। বলল—রঘুনাথের বউ কেমন হয়েছে?

—এই কথা। তার জন্য এত ভাবনা? ছোট্ট একটি কচি বেলপাতা। হাওয়ায় নড়ে। দেখতেও সরেস আর মনেও রাঙামাটি। পূজোয় লাগবে।

ইন্দ্রজিৎ হেসে বলে—এত কথা শিখলে কার কাছে?

—শিখতে হয়নি। নন্দীমহলের নীরবতা মানুষকে পাগল করে তুলতে পারে আবার হৃদয়ের ঘুমন্ত তন্ত্রীগুলোকে বাজাতেও পারে। প্রচুর অবসর যে। মাটির ঢেলা, যেমনি ইচ্ছে তেমনি ভাঙছি—তেমনি গড়ছি।

—বড় বউরাণীর প্রসাদ পেয়েছ নাকি?

—না-না। হেসে উঠল কৃষ্ণাকুমারী। মাতাল হয়েছি মনে। বলেই ইন্দ্রজিতের গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো—তোমার কি হয়েছে বলতো?

—কেন যেন কিছু ভাল লাগছে না।

—আমার কাছে এসেও না।

ইন্দ্রজিৎ বলল—তোমার কাছে এসে ভাল লাগলে একথা বলতাম না।

—ইস্—এই নাও। এই আদর করলাম। বলে মাথার উপর মুখ রাখল। বল্, এবার ভাল লাগছে না?

—কত রাত, জান কৃষ্ণা?

—হবে অনেক রাত। সময় তো আমাদের অফুরন্ত। দিনরাতের হিসাব করে আর কি হবে?

—তুমি ঘুমুবে না?

—ঘুম পায়নি।

—আমি যদি না আসতুম কী করতে?

—নির্জীব হয়ে পড়ে থেকে তোমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

—আমার কথা তুমি ভাবো?

—তবে কার কথা ভাবব।

ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর একটি হাত ধরে বলল—কৈলাসদার সংগে ঝগড়া করলাম।

—কেন? ইন্দ্রজিতের গা ঘেঁসে বসল কৃষ্ণাকুমারী।

—নটবর ঠাকুর মৃত্যু শয্যায়। তাঁকে গিয়ে বলে, চলে যেতে হবে।

—কেন?

—ওখানে জলসাঘরের জন্য মহল তৈরী হবে।

—ছিঃ ছিঃ। ঘেন্নায় কৃষ্ণাকুমারীর দেহ সংকুচিত হয়ে ওঠে। তুমি ওনাকে কি বলেছ?

—মুখে যা এসেছে তাই বলেছি।

—লোকটা ভাল নয়। এমন কোন কাজ নেই যে ও করতে না পারে।

—তাই তো ওকে এখান থেকে দূর করব।

—পারবে না। মেজদিদির মুখে যা প্রশংসা শুনি। যাক্, নটবর ঠাকুর কেমন আছেন?

—ভাল না। আমাদেরও আর বেশী দিন নয়। ফস্ করে বলে ফেলে ইন্দ্রজিৎ।

কৃষ্ণাকুমারী বিস্ময়ে তাকায়।

—জানো, ঠাকুর বলেছে নন্দীবংশের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।

—তুমি তা বিশ্বাস কর ?

—করি।

কৃষ্ণাকুমারী হাসল। বলল—এতবড় সংবাদ তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

বাইরে তখন আকাশ জুড়ে বাজির খেলা চলেছে। ইন্দ্রজিৎ একটি বালিশ টেনে পালঙ্কের উপর শুয়ে পড়ে বলল—আমি সব সময়ে প্রস্তুত।

কৃষ্ণাকুমারী আরও একটু নিবিড় হয়ে বসে ইন্দ্রজিতের মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল—মানুষের আয়ু ক্ষণিকের। তাই তো বলি, নিজেকে হারিয়ে ফেলো না, তার সংগে আমাকেও হারাতে দিও না।

—এই তো তোমার কাছে কৃষ্ণা।

—নাগো। ওভাবে চাই না। আমি চাই সম্পূর্ণভাবে। চল না, এখান থেকে চলে যাই, দূরে—বহুদূরে। মহলে আর নয়। ছোট্ট এক কুটীরে আমাদের বাসা বাঁধব।

—কল্পনায় আনন্দ আছে। কিন্তু ঝড়ে তোমার কুটীর যদি ভেঙ্গে যায় ?

—আবার বাঁধব—আবার—অনেকবার। কৃষ্ণাকুমারী ইন্দ্রজিতের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে উঠল—চল না, এখান থেকে চলে যাই। বেড়াবার নাম করে, নৌকা করে চলে যাব।

—তারপর এখানে কি হবে জান ?

—জানি। লোকে কত মস্করা করবে, তা করুক। ভয়ংকর ঝড় পিছনে কি রেখে যায় তা ফিরেও দেখে না।

—সেই ঝড়কে মানুষ ভুলতে পারে না।

—না পারলেও, ঝড়ের কিন্তু পুনরাগমনে কোন দ্বিধা নেই।

এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ বলল—মুক্তি যেখানে নেই, সেখানে মুক্তির কথা বলো না। মল্লা ছেড়ে আমি যে কোথাও যেতে পারব না কৃষ্ণা।

কৃষ্ণাকুমারী উঠে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আজ আর সে তর্ক করল না। নির্লিপ্ততা তাকে এক নতুন রূপ এনে দিয়েছে। এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—তা যেও না।

—জানো কৃষ্ণা, আজ লছমিখালে রঙ-বেরঙের বজরা ভেসে বেড়াচ্ছে।

—হুঁ।

—উৎসবের একটু আঁচ পেলে তো রক্ষে নেই। বজরায় বজরায় চলেছে বাইজীদের কুৎসীত নৃত্য আর হৈ-হল্লোড়।

—নন্দীবংশে তোমার জন্মানোই বৃথা হয়েছে। এত স্ফূর্তি ছেড়ে শেষ পর্যন্ত চলে এলে আমার কাছে।

ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর দিকে তাকাল। সে হাসছে। ইন্দ্রজিৎ বলে—ঠাকুর ঠিকই বলেছে। নন্দীবংশের ফাটলে বান ঢুকেছে। সব ধুয়ে নিয়ে যাবে। তোমারও তাই মনে হয়, না কৃষ্ণা?

হঠাৎ শেষ রাতে মন্দিরের ঘণ্টার মধুর ধ্বনি ভেসে এল। চমকে ওঠে কৃষ্ণাকুমারী। চোখের উপর ভেসে ওঠে সেই দৃষ্টি। ইন্দ্রজিতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—আজ নয়, বান এসেছে কিছুদিন হলো। আর বানের চেয়েও এক সাংঘাতিক ঘূর্ণি উঠেছে সারা নন্দীপ্রসাদ ঘিরে। তাই ভয় হয় এই ঘূর্ণির আবর্তে পড়ে আমিই না তলিয়ে যাই।

চমকে উঠল ইন্দ্রজিৎ। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠল এক নির্জীব কৌতূহল। বলল—এই জীবন সংসারে সব কিছুই আবর্তিত হচ্ছে, একেই কী ঘূর্ণি বলছো কৃষ্ণা?

কৃষ্ণাকুমারীর ঠোঁট কয়েকবার কেঁপে উঠল। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

শূন্যে ঝালরের বাতি জ্বলছে না দেখে ইন্দ্রজিৎ বলল—আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়নি?

আমি বারণ করেছি। ভাল লাগে না আলো।

কৃষ্ণাকুমারী পালঙ্ক থেকে নেমে দূরে প্রদীপের কাছে এসে দাঁড়াল; তারপর এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে ফিরে এল। অন্ধকারে দু'জনে মূক হয়ে যায়। ইন্দ্রজিৎ হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণাকুমারীকে কাছে টেনে আনলে হঠাৎ পালঙ্কে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে এক উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কৃষ্ণা।

আশ্চর্য হয়ে যায় ইন্দ্রজিৎ। তাড়াতাড়ি উঠে বসে ডাকল—কৃষ্ণা, এই, শোন। কাঁদছ কেন?

কিন্তু কৃষ্ণাকুমারী তেমনি শক্ত হয়ে পড়ে রইল। নড়ল না, কথাও বলল না। আকাশ জুড়ে ঠিক তেমনি বাজির ভেল্কী চলেছে।

সেদিন অন্দরমহলে খুবই হৈ-চৈ। লছমিখালে বাইচ খেলা হবে। শুধু কি বাইচ খেলা? ফুল, লতা-পাতা ও নানাধরনের রঙিন কাগজের পাতাকায় সজ্জিত ডাউলে, পান্‌সী, ডিঙ্গি আর ছিপ ভেসে যাবে শিঙার তালে তালে। পাড় থেকে অভ্যর্থনা জানাবে সিংহদ্বারের কড়ানাকড়ার দামামা।

নন্দী রাজপুরুষরা আনন্দে গলায় ঢেলে দেবে সুরা। গোপন পথ দিয়ে বউরাণীরা এসে দাঁড়াবে সুর্ধ অলিন্দে। ওখানে দাঁড়িয়ে থালে ছুঁড়ে দেবে কলা আর নারকেল। বাইচ খেলোয়াড়রা হাত তুলে মুহুর্মুহু উল্লাসধ্বনি করে চাইবে বউরাণীদের একান্ত অভিনন্দন। যুবকদের সুন্দর পেশী দাঁড়ের ওঠানামার সংগে বউরাণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

অন্দরমহলে আজ কারো নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। বউরাণীরা সকাল থেকে সাজতে বসেছে। সাজারও যেন শেষ নেই। দাসীরাও হাঁপিয়ে উঠেছে। কেবল কৃষ্ণাকুমারী চুপ করে বসেছিল। কোন তাড়া নেই। বাইরের উৎসব, লোকের উল্লাসধ্বনি তার মোটেই ভাল লাগে না।

হঠাৎ বিন্দা এসে ঘরে ঢুকল। অসময়ে ওকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল কৃষ্ণাকুমারী। বিন্দা একেবারে কাছে এসে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গলা নীচু করে বলল—বাইচ খেলা দেখতে যাবে না বউরাণী?

কৃষ্ণাকুমারী মাথা নেড়ে জানাল—না।

—একটা শুভ সংবাদ দিতে এলাম।

কৃষ্ণাকুমারী সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে ধরল।

বিন্দা তার হাতে একটা বেল পাতা দিয়ে বলল—আজ দুপুরে নিরিবিলি দেখা করো।

—কোথায়? কার সংগে? বিস্ময়ে বলল কৃষ্ণাকুমারী।

—মন্দিরে গো, মন্দিরে। ব্রহ্মচারী স্বয়ং তোমার দর্শনপ্রার্থী আজ। সেই যে দীক্ষার কথা বলেছিলেন।

—দীক্ষা! কৃষ্ণাকুমারীর কণ্ঠস্বর সংকুচিত হলো।

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। বলেছিলাম না বৌরাণী, তোমার ভাগ্যি আর দশজনের মত নয়।

কৃষ্ণাকুমারী উঠে দাঁড়ায়। আপনমনে বলে উঠল—কিন্তু সে কি সত্যি!

—সত্যি নয়তো মিথ্যা বলছি? যেও বৌরাণী। ঠাকুর দেবতার আদেশ অমান্যি করতে নেই। ঠিক দুপুরে। ভুলো না যেন।

বলে বিন্দা চলে যেতে উদ্যত হলো। কৃষ্ণাকুমারী তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ফেলে কম্পিত কণ্ঠে বলল—তুই আমার সংগে যাবি নে?

—ওমা কথা শোন। সন্ন্যাসী আর দেবতা দুই-ই এক। ওঁদের কাছে যেতে হ'লে সংগে লোক নিতে নেই।

—তোদের ছোটকর্তা কি বাইচ খেলা দেখতে গেছেন?

বিন্দা এবার হেসে ফেলে। বলল—তুমি হাসালে বৌরাণী। তোমার তো ঐ একটি কর্তা। আমার হাজার কর্তার খোঁজ রাখতে হয়। ঠিক জানি নে। আমি যাই।

বিন্দা চলে যায়। কৃষ্ণাকুমারী বেলপাতা হাতে নিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। এক রাশ চিন্তা তাকে ছেয়ে ফেলে। দীক্ষা তো সে চায়নি। কবচই তার প্রয়োজন। যা ধারণ করলে ইন্দ্রজিৎকে সম্পূর্ণভাবে সে তার কাছে নিয়ে আসতে পারবে। দীক্ষা নিতে তো তার মন প্রস্তুত নয়। ভক্তি সুন্দর হৃদয়ের ফল্গুধারা গিয়ে মিশেছে দীক্ষার দুয়ারে। কিন্তু তাঁর দেহ, মন এক কামনার আগুনে পুড়ে মরছে অহরহ। দীক্ষা সে চায় না। তবু এক কৌতূহলী বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে মন্দিরে যাবে।

মহল একরকম ফাঁকা। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। প্রায় সকলেই বাইচ খেলা দেখতে গেছে। সন্দেহাকুল মন নিয়ে ধীর পদক্ষেপে মন্দিরের দোরে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণাকুমারী।

হৃদয়ের স্পন্দন সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। বাতাসে জাগল নতুন চঞ্চলতা। প্রথম পদক্ষেপ। পুরোহিত হলেও সে পরপুরুষ। এই একাকিনী নিভৃত-দর্শন মহলের আইনে অন্যায় ও অশোভন। নিঃশ্বাস নেয় কৃষ্ণাকুমারী। জলে ডুবে যাওয়া মানুষের মত একবার ভেসে ওঠার শেষ চেষ্টা। তিলে তিলে সে মরতে পারবে না।

আজ তার সাজা হয়নি। কবরী যেন আলগা হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। কাজল অবহেলায় প্রলিপ্ত হয়ে সুন্দর আঁখি দু'টিকে স্বপ্নময় করে তুলেছে। উদ্যত ঠোঁটের পাশে এক চিন্তার রেখা।

মন্দিরের দোর খোলা। কেউ কোথাও নেই। এক সার ঘণ্টার রূপোর শিকল শুধু শূন্যে হাওয়ায় হেলছে দুলছে।

মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। ধূপ-ধূনোর গন্ধে চারিদিক আমোদিত। দূরেই শিবলিঙ্গ। বিল্বপত্রে আচ্ছাদিত। হঠাৎ বাইরের ঘণ্টা মধুর ধ্বনিতে বেজে উঠল। কৃষ্ণাকুমারী চমকে ওঠে। পিছনে তাকিয়ে দেখে ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে। গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। যেন একটি সাপ গলা জড়িয়ে ফনা তুলে রয়েছে।

—বসুন ওখানে। মধুর অথচ গম্ভীর নির্দেশ বেরিয়ে আসে ব্রহ্মচারীর কণ্ঠে।

কৃষ্ণাকুমারী মন্ত্রমুগ্ধের মতই বসে পড়ে।

ব্রহ্মচারী মন্দিরের দোর বন্ধ করে কৃষ্ণাকুমারীর সামনে এসে দাঁড়াল। কৃষ্ণাকুমারী বদ্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়।

—দেবতার আদেশেই আপনাকে ডেকেছি। বলে কাছে গিয়ে বসল ব্রহ্মচারী।

কৃষ্ণাকুমারী একটু জড়সড় হয়ে সরে বসে। চোখ তোলে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মাথা নোয়াল।

ব্রহ্মচারী এবার সহজকণ্ঠে বলল—আপনি এতটা লজ্জিত হবেন না। আপনি যদি আমার কাছে সহজ আর দেবতার কাছে নিঃসংকোচে ধরা না দেন তাহলে সব ব্যর্থ হবে।

কৃষ্ণাকুমারী দেবতার দিকে তাকাল। মনে মনে বলল—ঠাকুর, এ আমি কি করছি জানি না। যদি অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা করো। আভিজাত্য, রীতিনীতি, লোকনিন্দা, ভয় সব ভেঙ্গে এই নিরালায় অন্য এক পুরুষের সংগে মিলিত হয়েছি, কিন্তু কেন তা তুমি জান। শুধু একজনকে আমার আপন করে নিতে চাই।

ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে কৃষ্ণাকুমারীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—আমাকে ভুল বুঝবেন না।

চমকে ওঠে কৃষ্ণাকুমারী

ব্রহ্মচারী বলে চলে—লজ্জা যেখানে, সেখানে মুক্তি আবদ্ধ। আমি একজন সাধক মাত্র। একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না?

কৃষ্ণাকুমারী চোখ তোলে। হাজার রূপের জোয়ার সাগরের তীরে ভেঙ্গে পড়ে।

ব্রহ্মচারী বলে—আপনার সব দুঃখ, ভাবনা আমি জানি। তাই একটা শক্তি আপনাকে দেবো।

—শক্তি! বিস্ময়ে কৃষ্ণাকুমারী বলে।

—হ্যাঁ, শক্তি। সে শক্তির বলে আপনি আপনার স্বামীকে পাবেন—মনে শান্তি পাবেন। কিন্তু এর আগে একটা প্রশ্ন আছে আমার।

—বলুন।

—শুধু স্বামীকে পেলেই খুশী?

—হ্যাঁ।

—বড় ছোট গণ্ডী আপনার। বাপের বাড়ী থেকে এসেছেন এই হলুদপুর-মল্লায়। এই বিরাট দেশের বিচিত্র রূপ ও সৌন্দর্য কখনো উপভোগ

করেছেন? আকাশ দেখেছেন। কিন্তু পাহাড়, নদী, মরু আরও শত রাজ্যের ঐশ্বর্য—বিচিত্র মানুষের জীবনধারায় কি কখনো মুগ্ধ হয়েছেন?

—শুনেছি, কিন্তু আগ্রহ নেই দেখায়।

—কৌতূহলও নেই আপনার?

কৃষ্ণাকুমারী হাসল। বড় ম্লান হাসি। নন্দীবংশে প্রতি পদে পদে শত প্রশ্ন, কৌতূহল প্রকাশ হলেও তার কোন মূল্য নেই। কৌতূহলই প্রশ্ন। প্রশ্ন মানে সমাধান দরকার। যা কখনো এখানে সম্ভব নয়।

—আমি শীগ্‌গিরই এখান থেকে চলে যাব, তাই আমার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র একজনকে দিয়ে যেতে চাই। আমার মনে হয় আপনিই একমাত্র দীক্ষা নেওয়ার উপযুক্তা।

কুণ্ঠিতস্বরে কৃষ্ণাকুমারী বলে ওঠে—এ আপনার একটা মিথ্যে ধারণা।

—না। আমার ধারণা অকাট্য—নির্ভুল।

কৃষ্ণাকুমারী আবার হাসল। কি করে ভাবলেন আমি দীক্ষা পাবার উপযুক্তা?

—আমার মন্ত্রে, আমার দেবতার আদেশে।

—কিন্তু—। মাথা নোয়াল, তারপর দেবতার দিকে মুখ ফিরিয়ে কৃষ্ণাকুমারী বলল—দীক্ষা আমার কাছে নিষ্ফল। কারণ দেবতার আগমন বড গোপনে অথচ আমার আকাংক্ষা দিবালোকের মত স্পষ্ট ও মুক্ত।

—কে বল্লে ছোটরাণী? দেবতা সর্বত্র। ভালভাবে চোখ মেললেই তাঁকে দেখতে পাবেন।

—তাহলে দোর বন্ধ করলেন কেন? মুক্ত যেখানে নিরুদ্ধ, দীক্ষা যেখানে মহাসত্য সেখানে বদ্ধ হয়ে অসত্য হবো কেন?

হাসল ব্রহ্মচারী। সত্যি বুদ্ধিমতী নারী। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল—সত্যের পথে যেখানে নিন্দা প্রতিবন্ধক, সেখানে গোপন হতে আপত্তি কি? আমাদের দীক্ষার সাধনা হবে গোপনে, নিঃশব্দে। কেউ টের পাবে না। দেখবেন এক মহাশক্তি আপনার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

কৃষ্ণাকুমারী আকুল হয়ে বলে উঠল—তারপর আমার কি হবে?

—কেন, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

—এও কি সত্য?

—সত্য বলেই আপনাকে আমি বিপদের মধ্যে ডেকে এনেছি। আমাকে বিশ্বাস করুন—দেবতাকে বিশ্বাস করুন।

—কিন্তু সন্ন্যাসী, দেবতার চরণে নিজেকে আমি কি করে দিই? দেহ, মন ও কামনা এক অভিশাপে মৃত। তার কঙ্কাল দেবতার চরণে উৎসর্গ করে আপনাকে মহাপাপে ফেলতে চাই নে।

হেসে উঠল ব্রহ্মচারী—না-না, ছোটরাণী! এ সত্যি নয়। বিকারগ্রস্ত মন নিয়ে সব বিচার করবেন না। 'আপনি কে' এই প্রশ্নই করুন আগে। সব উত্তর পেয়ে যাবেন তাহ'লে।

—বেশ, আমাকে কি করতে হবে? কৃষ্ণাকুমারী এবার সহজ হয়ে প্রশ্ন করে।

ব্রহ্মচারী তাকাল। বাইরে বদ্ধ বাতাস মুক্ত কণ্ঠে হেসে উঠল। কানে ভেসে এল সাগরের গম্ভীর আওয়াজ। মৌমাছি উড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে। মৌচাকে লেগেছে আগুনের পরশ। ব্রহ্মচারীর স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জেগে উঠল উদ্দাম উল্লাস।

—আমার একটা কথা আছে ছোটরাণী। মন্ত্র নেওয়ার আগে কয়েকটা কথা আমার জানা দরকার।

—বলুন।

—আমাকে বিশ্বাস হয় আপনার?

কৃষ্ণাকুমারীর চোখের কালো তারা চঞ্চল হয়ে কি যেন খোঁজে। বলল—আপনি সন্ন্যাসী।

—বেশ। দীক্ষা পেতে যতরকম কষ্ট হোক তা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে সইবেন?

—আমি মেয়ে—। সমাজের সমস্ত বাঁধন আমাদের ঘিরে থাকে। তবু যতটা সম্ভব আমি করব।

—দীক্ষার জন্য আমার কাছে অনেকবার আসতে হ'তে পারে। আসবেন?

—আসব।

—যতদিন না মন্ত্রের সাধনা শেষ হয় ততদিন কেউ যেন জানতে না পারে।

—আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

—আচ্ছা আজকে এটুকুই থাক। আপনি এখন যেতে পারেন। ব্রহ্মচারী উঠে দাঁড়িয়ে দোর খুলে দেয়। কৃষ্ণাকুমারী ব্রহ্মচারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। ব্রহ্মচারীর অন্তর হতে আশীর্বাদের পরিবর্তে সম্মোহন গড়া

দু'টো হাত কৃষ্ণাকুমারীকে অতৃপ্ত বুকে চেপে ধরতে চাইল। কিন্তু তা সামলে নেয়।

কৃষ্ণাকুমারী চলে গেল। ব্রহ্মচারী সেখানে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। কানে ভেসে এল চারু ব্রহ্মচারিণীর কথা—"কিগো নাগর, এখনো এই পথে রয়েছ?" সত্যি ধর্মপথ চন্দন ব্রহ্মচারীর নয়। শুধু আত্মগ্লানির বেদনায়, কামনার অসহ্য জ্বালায়। বেশ করবে। কেন করবে না। কেন এল না চারু তার জীবনে? তবে কি আবার এক পাপ কাজে সে মেতে উঠতো। জানে না এর শেষ কোথায়। ভেবে চিন্তে কাজ করা সে ছেড়ে দিয়েছে। পাপ যদি অদৃষ্টে থাকে তা খণ্ডাবে কে!

কৃষ্ণাকুমারী অন্দরমহলে এসে দাঁড়াল। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। সকলে বাইচ খেলা দেখতে গেছে। জানালায় এসে দাঁড়াল। দূর থেকে ভেসে এল বাইচ খেলার জন উল্লাসের সংগে দামামার কান ফাটা আওয়াজ। আজ তার মনে কোন সংশয় নেই। বরং এক আশায় তার মনে মুক্তোর মালা দুলতে থাকে। সে বাঁচবে। ইন্দ্রজিৎ তার হবে।

চন্দন ব্রহ্মচারী একা ঘরে বসে অনেক কিছু ভাবছিল। সারাদিন আজ যেন তার কি হয়েছে। এক অলসতা, এক অসহনীয় চিন্তা তাকে ঘিরে ধরেছে। গতকাল মন্দিরে পুজোর পর সকলের অলক্ষ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। প্রথম চলাতেই বাধা পেয়েছিল। সেদিনই প্রথম ইন্দ্রজিৎকে দেখল। দীর্ঘকায় সুপুরুষ, সংগে চার পাঁচ জন লোক। আরও শুনলো নটবর ঠাকুর মারা গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে মহল ছাড়িয়ে এক পড়ো ঝিলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল। জলে পচন ধরেছে। ঘাট ভেঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। পাশে একটি সুদৃশ্য মহল, তবে ভগ্ন। স্থানটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। দূরে নন্দীমহল আলোতে ঝলমল করছে। তার পাশে এই ধ্বংসস্তূপ। পাশাপাশি বর্তমান আর অতীত।

তবু সেখানে বসেছিল চন্দন ব্রহ্মচারী। জলের তরঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছিল আলোর চুমকি। নটবর ঠাকুর মারা গেল। একদিন দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে কক্ষচ্যুত তারকার মত সে এই হলুদপুরমল্লায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল একটি লোক। নায়েবের সংগে দেখা করিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। আর তাকে কোনদিন দেখেনি। লুফে নিল নন্দীপুরুষরা। ভারও নিল সে মন্দিরের। নটবর ঠাকুরের অভিসম্পাত এখনো সে ভুলতে পারে না।

হঠাৎ কানে ভেসে এল ক্ষীণ নারীকণ্ঠের সুর। ব্রহ্মচারী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। শূন্যে নীল আকাশে নক্ষত্র, নীচে ঝিল, আর নিস্তব্ধতা ছেয়ে তার চারপাশে। বেশ লেগেছিল গানটি। বোধ হয় কারো ফরমায়েসীতে বাইজীর নজরানা। অদ্ভুত এই হলুদপুরমল্লা। উচ্ছৃংখলতার পাশাপাশি এক আভিজাত্যের প্রকাশ। সবই আছে তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক। সেই ফাঁকের চরম ব্যর্থতা সে অনুভব করে মর্মে মর্মে। সেও তো সন্ন্যাসী হয়েও হতে পারেনি।

দীক্ষার জন্য তার কাছে কৃষ্ণাকুমারীর গোপন পদক্ষেপ ঘটেছে। অসাধারণ নারী। যতবার সম্মোহন করতে গিয়েছে ততবারই ব্যর্থ হয়েছে। চরম ইচ্ছা শক্তির কাছে কোন মন্ত্রই টেকে না। তবু তার মন্ত্রের জয় হবেই। তারপর তাকে নিয়ে চলে যাবে নিরুদ্দেশের পথে। তবে কৃষ্ণাকুমারী তার জীবনের এতবড় ব্যর্থতাকে স্বীকার করে তাকে কি গ্রহণ করবে? কড়া শাসনে, নজরবন্দী করে ক'দিন রাখবে? যখনই সুযোগ পাবে সেও তো চারুব্রহ্মচারিণীর মত দেহ বিসর্জন দেবে। দু'জনেই সমান। চারুব্রহ্মচারিণী ভক্তিময়ী নারী, লক্ষ্য ছিল দেবতা। আর কৃষ্ণাকুমারী বুদ্ধিমতী, লক্ষ্য স্থূল প্রেম—ইন্দ্রজিৎ।

হঠাৎ কালপেঁচার কর্কশ চীৎকারে চন্দন ব্রহ্মচারী চমকে উঠেছিল। কানে ভেসে এসেছিল কৃষ্ণাকুমারীর মিষ্টি হাসির শব্দ। না, সে যা ভেবেছে তা সে করবে। উঠে এসেছিল সেখান থেকে।

হঠাৎ সন্ধ্যার আমেজে তার খেয়াল হয় মন্দিরে যেতে হবে। তার মন এই পুজোর অভিনয় করতে সায় দেয় না। তবু তাকে করতে হবে। বেশী দিন আর নয়। সময় হয়ে এসেছে তার। সুযোগ বুঝে সে কৃষ্ণাকুমারীকে নিয়ে এই হলুদপুরমল্লা ছেড়ে চলে যাবে। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে হঠাৎ ভাবল একি তার ভালবাসা, না কামনার ক্ষুধা? জানে না সে। ব্রহ্মচারী হয়েও সে অদৃষ্টকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই অদৃষ্টকে সে বাঁধতে পারেনি। সে যাকে চেয়েছে সেই-ই আলেয়া হয়ে সরে গেছে। অদৃষ্ট তার মনবাঞ্ছা পূরণ করলে—সেও তো ভাল হতে পারত—ভক্তিমান হয়ে উঠতে পারত। তাইতো অদৃষ্টের ছলনাকে সে মাথা পেতে নিয়েছে। তারই হাত ধরে সেও ছলনা শিখেছে। তাই ছলা-কৌশলে সেও তার ইপ্সিত বস্তুকে দখল করবে।

উত্তরীয় জড়িয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল।

কৃষ্ণাকুমারীর এখন নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। সকলের অজ্ঞাতে সেও একটি রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে একটি একটি গুটিকে সরিয়ে তার ঈশ্বরকে খুঁজছে। মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে তার। একদিকে ভালই হয়েছে। কিছু সময়ের জন্য সব ভুলে থাকতে পারে। তারপর শোবার সময় চোখবুজে ব্রহ্মচারীর রূপকে কল্পনা করতে হয়। প্রথম প্রথম তার বড্ড ভয় হতো। এখন বেশ লাগে। কী সুন্দর এক পুরুষ বার বার তার দৃষ্টির মাঝে ঘুরে বেড়ায়! ব্রহ্মচারী যে তার গুরুদেব। সে বলেছে আর বেশীদিন নয়। সত্যি সত্যি ইন্দ্রজিৎকে সে পাবে।

জানালায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণাকুমারী ভাবছিল ভবিষ্যতের আশার কথা। ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে সে চলে যাবে। নন্দীবংশের নিয়ম সে ভেঙ্গে ফেলবে।

মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ ভেসে এল। সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। ঠাকুরের উদ্দ্যেশে দূর থেকে প্রণাম জানাল। চোখ বুজল। হঠাৎ এক স্পর্শে চমকে পিছনে তাকাল। আশ্চর্য হলো। প্রথমে কথা স্ফুরিত হয় না। ইন্দ্রজিৎ তার পাশে দাঁড়িয়ে।

কৃষ্ণাকুমারী আবার চোখ বুজল। আজ কেন যেন ইন্দ্রজিৎকে সেই আগের মত গ্রহণ করতে পারছে না সে। এখুনি তাকে জপে বসতে হবে। ইন্দ্রজিৎ নিবিড় হয়ে দাঁড়ালে কৃষ্ণাকুমারী বলে উঠল—আঃ, সর।

ইন্দ্রজিৎ সরে যায়। অল্প আঘাত পায়। আস্তে বলে—তোমার কি শরীর ভাল নেই?

কৃষ্ণাকুমারী জানালার পর্দা সরিয়ে বলল—তুমি একটু বসবে?

ইন্দ্রজিৎ আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

—আমি একটু মন্দিরে যাব। আরতি শুরু হয়েছে।

—সকলে তো চলে গেছে।

—আমি একা যাই, আগে গিয়ে কি হবে? চরণামৃত নিয়েই আমি চলে আসব।

—যাও তাহ'লে।

—রাগ করলে?

—না।

ইন্দ্রজিতের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেন যেন মনে এক ব্যথা পায় কৃষ্ণাকুমারী। তবু সে যাবে।

—আজকে না গেলে কি হতো না? মিষ্টি সুরে বলে ইন্দ্রজিৎ।

কৃষ্ণাকুমারী মাথা নেড়ে জানালো—ছিঃ, ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি, মানা করতে নেই। যাই, হ্যাঁগো, বল না ?

ইন্দ্রজিৎ পালঙ্কের উপর বসে পড়ে ক্লান্ত স্বরে বলল—যাও। পারতো কাউকে দিয়ে তামাক পাঠিয়ে দিও।

কৃষ্ণাকুমারী বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বেশ তো ছিল। হঠাৎ এ বুদ্ধি মাথায় চাপল কেন ? এও একটা উগ্র ভাবুকতার চরম রূপ নাকি ? আজ মন্দিরে যাওয়ার কোন আকর্ষণই ছিল না। ইন্দ্রজিৎ এসেছে, এর চেয়ে বড আর কি থাকতে পারে ? তার চেয়ে প্রিয় আর কে ? যাক, যা হবার তা হয়েছে। মন্দিরের দিকে চলল। কানাডি পথে এসে হঠাৎ মনে হলো সে তো কাপড় ছেড়ে আসেনি। লজ্জা হলো, কি দরকার ছিল আসার, তাছাডা এসময়ে মন্দিরে গেলে লোকে কি বলবে ! ফিরল কৃষ্ণাকুমারী। অন্দরমহলে নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল। ঘর শূন্য, তামাক তেমনি পড়ে। ইন্দ্রজিৎ নেই। সে একরকম দৌডেই এসেছে। ইন্দ্রজিৎকে সে চেনে। ছিঃ-ছিঃ, ভারি অন্যায় হয়েছে। হয়তো কত ক্লান্ত হয়ে তার কাছে এসেছিল। তার চেয়েও বড কথা, সে ছাডা তার তো কেউ নেই। কাছারিবাডী, ছাদ ছাড়া সেই একমাত্র সম্বল। নন্দীবংশের নিয়মের বিরুদ্ধে সে যেতে সাহস পায় না। সে বড দুর্বল। আরও সকলে নানা কথা বলে তাকে পাগল করে তুলেছে। কৃষ্ণাকুমারী পালঙ্কে গিয়ে বসল। ভাবতে সে পারে না। বারান্দা থেকে নূপুরের নিক্কণ ভেসে এল, মন্দির থেকে বউরাণীরা সব ফিরল।

কৃষ্ণাকুমারী চলে গেল। ইন্দ্রজিৎ ভাবে—কৃষ্ণাকুমারী হঠাৎ এভাবে চলে গেল কেন ? সে তাকে এডিয়ে থাকতে চায় ? কিন্তু কেন ? হয় তো বিরক্তি নয়তো অবহেলায় নিরাসক্ত। কিন্তু সে কেন তাকে বুঝল না। তাকে ছাড়া সে তো কোনদিন কাউকে ভাবেনি। লছমিবাইএর গান শোনে তার ইশারা পায় দূর থেকে। তবু তো তার কাছে সে ছুটে যায় না। হঠাৎ এই অবহেলা কেন ? হয়তো বা এটাই তার দুর্ভাগ্য। ঝি এল তামাক নিয়ে। ছুঁলোও না।

ঘর ছেড়ে ছাদের সিঁডিতে এসে দাঁডাল। ছাদে ওঠার চিলে দরজায় চরিত বসে ঢুলছে। এই সন্ধ্যে বেলাতেই নিদ্রালসে অবসন্ন। বুড়ো হয়েছে চরিত।

সিঁড়ি দিয়ে ঘরের দোরে এসে দাঁড়াল। ভিতরে আলো জলছে। শয্যা পরিপাটি ভাবে সাজানো। ডাকল—চরিত !

চমকে উঠে তাকায় চরিত।

—তুই ঘরে গিয়ে শো'গে।

—না-না, এই তো, বসে একটু ঢুলছিলাম।

—না, তুই যা, ছাদে আমি যাব না। ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দেয় ইন্দ্রজিৎ।

চরিত উঠে দাঁড়াল। ওমনি ভাবে সে কখনো দোর বন্ধ করে না। আশ্চর্য হলো। তবে কি কারো সংগে ঝগড়া হয়েছে! হতেও পারে। কিন্তু সে তো বড় একটা কারো সংগে ঝগড়া করে না। তবে বৌরাণীর সংগে কিছু হয়েছে! হতেও পারে। চরিত আবার বসে পড়ে। দমকা হাওয়া আসছে। উঠে পড়ে আবার। ছাদে গিয়ে দাঁড়াল। দূরে আকাশের কোলে লাঠিয়ালের মত ঝাঁকড়া চুল ছেড়ে একসার মেঘ আকাশ ধরে উঠে আসছে। তাই দমকা হাওয়ার আবির্ভাব।

ইন্দ্রজিৎ জানালায় এসে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। তার অবুঝ মন হেরে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে মেঘে ঢাকা শূন্য আকাশে। কেউ তাকে ভালবাসে না—কেউ না। কেউ বুঝল না তাকে। কৃষ্ণাকুমারী পর্যন্ত নিজের প্রতি সজাগ হয়ে উঠেছে। বেশ, যাক, সকলে চলে যাক। চোখ বুজল। মুখে লাগে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। ঝড় উঠবে হয়তো।

দেখতে দেখতে মেঘ ছড়িয়ে পড়ে সারা আকাশ জুড়ে। শূন্যে ঝালরের বাতি দুলছে। পর্দায় লেগেছে হুটোপুটি। প্রদীপের শিখায় বাতাসের টান ধরেছে। নিভে যাবে এখুনি।

সত্যি প্রদীপের আলো নিভে গেল।

হঠাৎ ঘটনা ঘটল চকিতে। দেওয়ালে টাঙানো করণকুমারের তৈলচিত্র সশব্দে মেঝেয় আছড়ে পড়ল। ইন্দ্রজিৎ তুলতে গিয়ে চমকে উঠল। পাশ থেকে কে যেন খিল খিল করে হেসে উঠে। পাশে তাকাল। নাঃ, কেউ নেই। ছবিটা তুলে দেওয়ালে টাঙাতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লছমিখাল বেয়ে এক আর্তনাদ বাতাসে ভর করে তার জানালায় এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। পরিষ্কার শুনলো, একটি নারী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে শেষে আর্তনাদ করে উঠল—'মুঝকো না মার ডালো।'

দূরে বিদ্যুৎ চমকালো। ইন্দ্রজিৎ দেওয়ালে ছবিটা টাঙিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। গান ভেসে আসছে, নেচে নেচে গাইছে। ঘুঙুরের ঝমকে সংগীতের সুরমূর্ছনা। লছমিবাই গাইছে।

চোখ বুজল ইন্দ্রজিৎ। তার ব্যথা তার কল্পনাকে ছাপিয়ে অতীতের হারিয়ে যাওয়া এক ঘটনা মূর্ত হয়ে ওঠে—

সেদিনও ছিল এমনি আকাশে মেঘের ঘনঘটা। প্রকৃতির হয়েছে রোষ। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘন ঘন।

দুটি মূর্তি খালের ধারে এসে দাঁড়াল। একটা বজরা বাঁধা। এই বজরায় আজ পাড়ি দেবে সুদূরে। খাল বেয়ে গিয়ে পড়বে কুন্তী নদীতে, তারপর দূরে—আরও দূরে। গঙ্গা ছেড়ে যমুনায়। থামবে গিয়ে আগ্রার কোলে—লছমিবাইএর আবাসভূমিতে।

লছমিবাই তার মুখ থেকে কালো মখমলের ওডনা সরিয়ে করণকুমারের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শূন্যে মেঘের কী দাপাদাপি! কী ভয়ংকর আড়ম্বর। লছমিবাই বলল—এবার তোমার বুকে আমি মরতে পারি।

—লছমিবাই!

করণকুমারের আবেগভরা ডাকে লছমিবাই বলে উঠল—উঁহুঃ, বাই বলে ডেকো না, এই অন্ধকারে লছমিবাইএর বাই মরে গেছে।

করণকুমার লছমিবাইএর মুখখানা বুকে চেপে ধরে।—বেশ, আর বাই বলব না। হঠাৎ এক চিন্তা তাকে সজাগ করে তোলে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল—কিন্তু লছমি, অদৃষ্টের পরিহাস আমাদের পিছু ধাওয়া করেনি তো?

বুঝতে পারে না লছমিবাই। সরল চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

করণকুমার বলল—কেউ আমাদের পিছু নেয়নি তো?

—ওঃ এই কথা। কেন নেবে? তুমি যে তার আদরের রাজা।

করণকুমার হাসল। লছমিবাইএর জগৎটা বড্ড ছোট, তাই ব্যর্থ ভালবাসা আর আভিজাত্যের পরাজয় কতখানি নিষ্ঠুরতা টেনে আনতে পারে তার খোঁজ সে রাখে না।

হঠাৎ আকাশ চিরে বিকট শব্দে বজ্রপাত হলো। চমকে উঠল করণকুমার। মনে পড়ে যায় প্রদ্যুৎনারায়ণের কথা। তার স্নেহাতুর হৃদয়ে হয়তো হাজার চিতার মত দাউ দাউ করে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, নয়তো নিশ্চিন্তে রুক্মিণীবাইএর গান শুনছে।

লছমিবাইএর ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ল। করণকুমার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—চল লছমি, অদৃষ্টের কথা আর ভাবব না।

—আমি জানি।

—কী জান লছমি?

—এতদিনের আভিজাত্যে ভাঙন ধরল, তারপর সুখের নীড় ভেঙে আমার সংগে অজানা পথে নেমেছো। কিন্তু আমি আজ চিন্তাশূন্য। বলবে, কী আছে আমার। সত্যি কোথা থেকে ভেসে এসেছি জানি না। কোথায় চলেছি তুমি জান। তাই তো পাওয়ার আনন্দে ঐ মেঘের মত আমি মুক্ত।

—যদি এখন আমি না যাই?

লছমিবাই যেন চমকে ওঠে। করণকুমারের চোখের দিকে তাকিয়ে সঞ্চারী দৃষ্টি ফেলে এক সন্দেহ খোঁজে। আরও নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—যাও না চলে। তাই বলে মনে করো না যে নতুন সাজে চোখে সুর্মা মেখে আবার সকলকে ভোলাব।

—তবে কী করবে?

—আমি ফিরে যাব না। তোমার সামনে ঐ জলে ডুবে মরব।

—না লছমি, তোমাকে ডুবে মরতে হবে না। কিন্তু আগ্রায় গিয়ে কি করবে?

দূরে সশব্দে আবার বজ্রপাত হলো। দু'জনে তাড়াতাড়ি বজরায় গিয়ে উঠল। বজরা ভাসল জলে।

সিঁড়ি দিয়ে বজরার নীচে ঘরে এসে ঢুকল তারা। লছমিবাই করণকুমারের হাত ধরে বলল—আগ্রায় কি করব, জিজ্ঞেস করছিলে না? চোখের জল লুকিয়ে ফেলে ভারি গলায় বলল—এই বুকে হাত দিয়ে দেখ, আগের লছমিবাই মরে গেছে। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

করণকুমার গদিতে বসে পড়ে বলল—এতদিনের অভ্যাস তুমি ছাড়তে পারবে?

জলভর্তি চোখে করণকুমারের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হেসে বলল—কেন পারব না? আমি বাইজী। আমি জানি, আমাদের ভালবাসা প্রহসন, অন্যায়ও বটে।

—লছমি!

—আমি যে তোমাকে ভালবাসি এও তো মিথ্যা নয়। আর আমি কিছু জানতে চাই না—বুঝতে চাই না।

নৌকার উপরে মাঝিদের আনন্দ-হুল্লোড় ভেসে এল। খাল বেয়ে কুন্তী নদীর মুখে এসে বজরা পৌছেছে। করণকুমার তাড়াতাড়ি কাঠের জানালা

খুলে ফেলে। বিস্ময়ে দেখল, প্রসন্না সলীলা কুন্তী নদী মেঘের আড়ম্বরে আত্মহারা—তাণ্ডব নৃত্যে প্রলয়ংকরী।

করণকুমার মুক্তির আনন্দে লছমিবাইকে দু'বাহুর মাঝে আবদ্ধ করল। লছমিবাই তার উন্মাদনার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে, সরে গিয়ে নাচের সংগে গাইতে শুরু করল সে। ছন্দ ছিল না। মনে হলো এইমাত্র নাচ শিখে গানের সংগে সমতা রাখতে চেষ্টা করছে।

দুর্যোগের তাণ্ডবতায় উচ্ছ্বসিত কুন্তীর জলরাশি বজরাকে অভর্থনা জানাল।

মুক্তির আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। তাদের অজ্ঞাতে পিছনে নিঃশব্দে আসা একটি ছিপ নৌকা হঠাৎ বজরার পথরোধ করে দাঁড়াল। অদৃষ্টের পরিহাস সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেনি। আক্রান্ত হলো বজরা। গানের পরিবর্তে বজরার ভিতরে জেগে উঠল এক ভয়াল করুণ আর্তনাদ।

সেদিন মনোহারিণী লছমিবাই আর্তনাদ করে করণকুমারের বিশাল বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। করণকুমার লছমিবাইকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। যেন বাজপাখীর হিংস্র চঞ্চু তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে না পারে। কিন্তু আক্রমণকারীর তরোয়ালের আঘাতে দু'জনেই লুটিয়ে পড়ল।

আকাশ চিরে বাজ পড়ার গুরুগম্ভীর আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। যেন ব্যর্থ প্রেমের সংবাদ বয়ে নিয়ে গেল প্রদ্যুৎনারায়ণের কাছে। রক্তাক্ত বজরা ফিরে চলল যথাস্থানে। অবশেষে এসে থামল খালের এক নির্জন কূলে। সেখানে নামানো হলো দু'টি মৃতদেহ। উঁচু এক মাটির ঢিপির আড়ালে চাপা দেওয়া হলো ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকাকে।

আগ্রার একটি গান মল্লার ভিজে মাটিতে আছাড় খেয়ে এমনিভাবে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে গোপন বাতাসে ঝড় উঠেছে। কাছারিবাড়ীর নিম্ন কর্মচারীদের মাঝে নানা গুজব উড়ে চলেছে। সকলের মুখে একই কথা। মন্দিরে কৃষ্ণাকুমারীর নূপুরধ্বনি প্রায়ই শোনা যায়। আরও কত কথা।

ইদানীং ইন্দ্রজিৎ অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবে। কাজে আগের মত মন নেই। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে ঘরময় পায়চারী করে, আপন মনে কত কি বলে। সুন্দর মুখখানিতে নেমে এসেছে চিন্তার কালিমা।

সেদিন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর কথা ভাবছিল। কত টুকরো টুকরো হারিয়ে যাওয়া কথাই না মনে পড়ছে। হঠাৎ মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক

খেয়ে জেগে উঠল। তবে কি কৃষ্ণা ঘুর্ণির আবর্তে পড়েছে? কে তবে সেই ঘূর্ণি? ব্রহ্মচারী? কিন্তু কৃষ্ণাকে তো সে চেনে। তার মনও দেহের মত সুন্দর কিন্তু নরম নয়। অত সহজে ভেঙ্গে পড়ে না সে। তবু কেন এক সন্দেহের দোলা তুলে যায় তার মনে! লোকের কথা সে বিশ্বাস করে না। হলুদপুরমল্লায় গুজবের উৎপত্তি বহুদিনের। সুযোগ ঘটলেই বাতাসে ডানা মেলে। পঙ্গপালের মত জন্ম এদের।

কি মনে করে ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়াল। কাউকে কিছু না বলে অন্দরমহলে পা বাড়াল। কৃষ্ণাকুমারীর কাছে গেল না। এক অভিমান তার বুক রাঙ্গিয়ে দিয়ে গেল। হয়তো ঠাকুর দর্শনে গেছে। সোজা ছাদে গিয়ে দাঁড়াল।

এক দমকা হওয়া তার দেহে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল। আকাশ কলঙ্কহীন। লক্ষ নক্ষত্রের মেলা। কিছুদিন আগে ঐ আকাশ ছিল কত গম্ভীর, কত ভয়ংকর ছিল তার মূর্তি।

পাথরের উপর এসে বসল। চিরাচরিত আসন। লছমিখালের দিকে চোখ পড়লা। জল বেশ ফুলে উঠেছে। হয়তো জোয়ার এসেছে। নৌকাগুলি কেমন সুন্দর তর তর করে বয়ে চলেছে।

দূরে সেই ঢিপি। কথিত, ওরি আড়ালে লছমিবাই আর করণকুমার ঘুমিয়ে। তাই তো সে ইশারা পায়। লছমিবাই তাকে ডাকে। কানে ভেসে এল ঝাউ গাছের কান্না। বাদুড়ের ঝাঁক চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে লছমিমহলে নেমে আসছে।

আজ এখানে বসে থাকলেও মন কিন্তু পড়ে অন্দরমহলে। চিন্তা এতদিন সে করেনি। কিন্তু আজ তার চিন্তার শেষ নেই। কৃষ্ণাকুমারীর পরিবর্তন তার চোখে বড্ড বেশী লেগেছে। নারী চরিত্র বড়ই দুর্জ্ঞেয়। তবে যা শুনছে, তা কি সত্যি! তার অবহেলায় আবার নতুন পথে বাঁচতে চলেছে! ব্রহ্মচারীকে সে দেখেছে দূর থেকে। এক রকম আড়াল থেকে। মন ভোলান রূপ বটে। তবে কি কৃষ্ণাকুমারী—না-না, এ সে ভাবতে পারে না। উঠে দাঁড়াল। এক উত্তেজনায় মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। ছাদ থেকে নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল।

চরিত বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দ্রজিৎকে দেখে সরে যায়। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আজ তার কি হয়েছে! লোকে দেখলে ভাববে পাগল হয়ে গেছে। এত চঞ্চলতা কেন? আগের সেই মনের স্থিরতা কোথায়? হঠাৎ কেন সে এমন হয়ে উঠল!

আগেও কৃষ্ণাকুমারী কতবার তার সংগে ঝগড়া করেছে, কেঁদেছে, অভিমান করেছে কিন্তু আজকাল কিসের জন্য তার কোন অভিযোগ নেই—অভিমান নেই। এক বিরাট সূক্ষ্ম সন্দেহের হৃদয় জুড়ে আস্ফালন। কী অদ্ভুত শক্তি এই সন্দেহের। বিচরণ লঘু কিন্তু প্রভাব কী প্রচণ্ড!

ঘরে ঢুকে ইন্দ্রজিৎ আশ্চর্য হয়ে যায়। পালঙ্কের একটি পাশে উঁচু হাতলের উপর থুত্‌নি রেখে কৃষ্ণাকুমারী বসে। এ ভঙ্গিমায় এক নব রূপ ভেসে ওঠে। ভুরুর পাশে কেশগুচ্ছ কাঁপছে বাতাসে। ইন্দ্রজিতের পায়ের শব্দে কৃষ্ণাকুমারী মুখ ফেরাল।

ইন্দ্রজিৎ আস্তে বলল—কখন এলে?

—এইমাত্র। আবার ছাদে গিয়েছিলে?

—কি করব, তুমি তো আমাকে চাও না?

—তবে কাকে চাই? হেসে ফেলে কৃষ্ণাকুমারী। ইন্দ্রজিতের কাছে এমন ছেলেমানুষী কথা সে আশা করেনি।

—তুমিই জান।

—না আমি জানি না। সেদিন মন্দিরে গিয়েছিলাম, মনে হলো রাগ করেছ।

—রাগ? না-না, রাগ করতে যাব কেন?

—হ্যাঁ, রাগ করেছিলে। তামাক খাওনি কেন? তাছাড়া তখুনি আমি ফিরে এসেছিলাম।

—ফিরে এসেছিলে! বিস্ময়ে বলে ইন্দ্রজিৎ।

—হ্যাঁ, ভাল লাগল না।

ইন্দ্রজিৎ নিজের দুর্বলতাকে আড়াল করার জন্য জানালায় এসে দাঁড়াল। একটা বিরাট পাথর বুক থেকে নেমে যায়। না, সে যা ভেবেছে তা সত্যি নয়। ইস্, কী ভুলটাই না করছিল। হলুদপুরমল্লার গুজব কী সাংঘাতিক।

কৃষ্ণাকুমারীর দিকে মুখ ফিরিয়ে মিষ্টি সুরে বলে—আজ মন্দিরে যাওনি?

—গেলাম আর কোথায়? সকলে মন্দিরে গেল, আর আমি এলাম তোমার কাছে।

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে।

কৃষ্ণাকুমারী উঠে ইন্দ্রজিতের কাছে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে গা ঘেঁসে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে প্রশ্ন করে—কী ভাবছ অতো?

ইন্দ্রজিৎ এবার কৃষ্ণাকুমারীর চোখের উপর চোখ রাখল। একদৃষ্টে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে। কৈ মুখে তো সেই কলঙ্ক নেই!

লজ্জা পায় কৃষ্ণাকুমারী। রসিকতার সুরে বলে—যাও, কী দেখছো অমন করে। নতুন দেখছ নাকি?

এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ নামিয়ে বলে ইন্দ্রজিৎ—আমার কিছু ভাল লাগছে না কৃষ্ণা।

—আমাকেও না?

চুপ করে থাকে ইন্দ্রজিৎ।

—আমি এখানে এসেছি বলে রাগ করেছ?

কোন উত্তর এল না।

কৃষ্ণাকুমারী অভিমান ভরে বলে উঠল—বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।

ইন্দ্রজিৎ তেমনি তাকিয়ে রইল।

কৃষ্ণাকুমারী ইন্দ্রজিতের হাত দু'টো ধরে ঝাঁকুনি দিলে হঠাৎ ইন্দ্রজিৎ পাগলের মত তাকে বুকে টেনে এনে বলে উঠল—চল কৃষ্ণা, এখান থেকে পালিয়ে যাই—চল।

কৃষ্ণাকুমারী আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ কী শুনল সে! প্রথমে যেন বিশ্বাস করতে চায় না। তবু কথাটা পরিষ্কার করার জন্য বলল—কোথায় যাবে?

—বেরিয়ে তো পড়ব। হ্যাঁ, নৌকা করে বারাণসীতে। সেই ভাল, চল কৃষ্ণা, সেখানে গিয়ে নতুনভাবে সংসার পাতব।

—যখন এখানে খবর আসবে যে আমরা বারাণসীতে আছি, কী হবে তখন?

—কী আর হবে? ত্যাজ্য হবো। চিরকালের জন্য ত্যাগ করবে আমাদের সকলে।

—পারবে তুমি হলুদপুরমল্লা ছেড়ে থাকতে?

—তোমার চেয়ে আমার কাছে আর কেউ বড় নয় কৃষ্ণা।

—না না—ও-কথা বলো না। কৃষ্ণাকুমারী আত্মহারা হয়ে ইন্দ্রজিতের বুকে মাথা রাখে।

—তুমি যাবে না কৃষ্ণা?

ইন্দ্রজিতের বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল কৃষ্ণাকুমারী—এ তুমি কি বলছ?

—ঠিকই বলছি। আমি তোমাকে নিয়ে চলে যাব। আমার ইচ্ছে যত তাড়াতাড়ি পারি। তুমি যাবে না?

কৃষ্ণাকুমারী তেমনি চুপ করে পড়ে রইল।

—তোমার যেতে ইচ্ছে নেই?

—তুমি গেলে জমিদারির হিসাব রাখবে কে?

—রাজা ছাড়া কি রাজ্য চলে না?

—রক্তে মাংসে মেশানো হলুদপুরমল্লাকে তুমি ভুলে থাকতে পারবে?

—তুমিও তো তোমার বাপের বাড়ীকে ভুলে গেছ।

—আমি যে মেয়ে। আমার জন্য সব ছেড়ে যাবে?

কৃষ্ণাকুমারী সরে এসে জানালা ধরে ফেলে হাঁপাতে থাকে। এ আজ সে কী শুনলো!

ইন্দ্রজিৎ কি একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেল। কৃষ্ণাকুমারীর চোখে জল দেখে হঠাৎ মনে জেগে ওঠা এক প্রশ্ন থমকে যায়। তবু বলল—তুমি এখান থেকে যেতে চাও না—না?

ব্রহ্মচারীর কথাগুলি বার বার কৃষ্ণাকুমারীর মনে পড়ে। দীক্ষা নেবার আগেই ইন্দ্রজিতের মনের পরিবর্তন হয়েছে। এ কি মন্ত্রের শক্তি! ইন্দ্রজিৎ তাকে নিয়ে চলে যেতে চায়। এ যে কতবড় আনন্দের কথা! সে চলে যাবে। দরকার নেই তার দীক্ষা। পর মুহূর্তে এক আশংকা আবার তাকে পেয়ে বসে। সত্যি সত্যি চলে গিয়ে আবার যদি মনের পরিবর্তন হয়! আবার যদি বলে হলুদপুরমল্লায় ফিরে আসবে। তখন! ছিঃ, এতো সন্দেহ করা অন্যায়। ইন্দ্রজিৎ যে তাকে কত ভালবাসে।

ইন্দ্রজিৎ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল—অতো ভাবতে হবে না কৃষ্ণা। আমি যাব না।

—যাবে না? চমকে উঠে কৃষ্ণাকুমারী।

—না। এ একটু রসিকতা মাত্র।

কৃষ্ণাকুমারীর সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত চিন্তার বাঁধন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তবু হাসি টেনে বলল—না-না, আমি যাব। চল দু'চার দিনের মধ্যে এখান থেকে চলে যাই।

ইন্দ্রজিৎ এবার উত্তেজিত হয়ে বলল—যদি বলি এখুনি।

—যাও, কী যে বল। বললেই বুঝি যাওয়া যায়। আমাদের তো কেউ পিছু তাড়া করছে না যে এখুনি যেতে হবে। সব গুছিয়ে নিতে হবে না বুঝি?

—সময় নেওয়ার অজুহাতে কত ছলনাই তোমরা জান।

ইন্দ্রজিতের ইঙ্গিত ধরতে না পেরে কৃষ্ণাকুমারী শুধু হাসল।

ইন্দ্রজিৎ একটু ভ্রূকুটি হেনে বলে—অন্য কারোর মত নিতে হবে বুঝি ?

কৃষ্ণাকুমারী দুষ্টুমির হাসিতে জবাব দেয়—মত নিতে হবে না ?

—কার মত ?

ইন্দ্রজিতের কর্কশ স্বরে কৃষ্ণাকুমারী চমকে উঠল। নিমেষে রাঙা মুখখানি মশিপ্রলিপ্ত হয়ে যায়। রুক্ষ কঠিন সুরে বলে—কী বলতে চাইছো ?

—বলছি কার মত নিতে হবে ?

—তোমার মনে হয় কার ?

—আমার অনেক কিছু মনে হয়। কী মনে হয় জান ?— না থাক্, বলব না।

কৃষ্ণাকুমারী এবার তীক্ষ্মস্বরে বলল—তুমি কি ভাবছ জানি না, কিন্তু খারাপ কোন ইঙ্গিত করে থাকলে—তোমার কাছে এ আমি আশা করিনি।

—তবে যেতে চাইছো না কেন ?

—ভয় হয়।

—কিসের ভয় ?

—এ তোমার সুস্থ বুদ্ধির কথা নয়। মনে হচ্ছে এও এক ভাবুকতার—

কথা শেষ হবার আগেই ইন্দ্রজিৎ চীৎকার করে উঠল—আমার সব কথাই ভাবুকতা, না ? যেতে হবে না তোমাকে। কিছুদিন আগে বললে হয়তো যেতে পারতে।

—এখন না যাওয়ার একটা কারণ আছে, সে কথাই বলতে চাইছো তো ?

—যাক্ কৃষ্ণা, ঝগড়া করলেই কথা বাড়বে। তুমি যা করছ তাই কর।

—আমি কী করি ? কৃষ্ণাকুমারী এবার রুখে দাঁড়ায়।

—মনকে প্রশ্ন কর।

—হেঁয়ালি রেখে সোজা বল, আমাকে কি সন্দেহ করছ ?

—লোকে নানা কথা বলে। ইন্দ্রজিৎ ফস্ করে বলে ফেলে।

রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় কৃষ্ণাকুমারীর চোখে জল এসে পড়ে। কোন প্রশ্ন করতে আর ইচ্ছে হলো না। বলল—আমি যাই। লোকের কথা যখন বিশ্বাস করেছ তখন কি বলেছে আর শুনতে চাই না। তবে এটা শুনে রাখ—আমি যা করি তা শুধু তোমার জন্যই করি—আর কারোর জন্য নয়।

কৃষ্ণাকুমারী দ্রুতগতিতে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নূপুর পিছনে রেখে গেল দ্রুত ছন্দহীন ঝংকার।

কিছুক্ষণ চুপ করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পালঙ্কে এসে বসল ইন্দ্রজিৎ। শুধু ভাবে। ভাবনার যেন অন্ত নেই। কৃষ্ণাকুমারী অভিমান করে চলে গেল। শুধু অভিমান নয় এক বিশ্রী ঘৃণায় সংকুচিত হয়েছে তার মন। লোকের কথা বিশ্বাস করে এভাবে সন্দেহের জাল বোনা উচিত হয়নি তার। কৃষ্ণাকুমারীর তো মন্দিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। একটু ঠাকুর ঠাকুর করলেই বা, তাতে দোষ কি। ছিঃ, সে অন্যায় করেছে। ব্রহ্মচারীর যত রূপই থাকুক, কৃষ্ণাকুমারী রূপের কাঙাল নয়। ইন্দ্রজিৎ পালঙ্ক থেকে নেমে ঘরের বাইরে ছাদে এসে দাঁড়াল। চরিত বেঁহুশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। চারদিকে অন্ধকার আর শূন্যে নিঃসীম আকাশ। বাতাসে ভর করে এক টুকরো গান ভেসে এল। কোন এক বাউল নৌকায় দেশান্তরে চলেছে। একতারার মধুর ঝংকার স্পষ্টভাবে কানে এসে ধরা দিল। বিশ্বসংসারে সবই আছে কেবল নেই মানুষের মনে শান্তি। তাই সে চলেছে উজানে নতুন মনের খোঁজে।

ইন্দ্রজিৎ ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে অন্দরমহলের দিকে চলল। কেন যেন এক দ্বিধা পায়ে পায়ে বাধা দিচ্ছে। তবু সব অভিমান ফেলে কৃষ্ণাকুমারীর ঘরের দোরে এসে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে দেখে ঘর শূন্য। ভয়ে বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। ভিতরে ঢুকে আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল—কৃষ্ণা—।

দরজার পাশ থেকে কৃষ্ণাকুমারী একরকম দৌড়ে ইন্দ্রজিতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠল। ইন্দ্রজিৎও আর নিজেকে সামলাতে পারল না সেদিন।

কিছুদিন পরের কথা। পূর্ণিমা আর বাকী নেই। পূর্ণিমা রাত্রি নন্দীমহলের উৎসবের দিন। লক্ষ্মীপুজো, নাচগান আর হাসিঠাট্টা করে নন্দীমহলের মেয়েরা রাত্রি কাটিয়ে দেয়। ঝালরের বাতিগুলো সে রাত্রে সব জ্বলে ওঠে। ফুটফুটে জোছনায় গোলাপবাগ আর নট্টবাগে মেয়েদের ভীড় জমে। সেখানে সব তারা লুকোচুরি খেলে বা যে যার ইচ্ছে তাই করে। প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে অঘটনও যে মাঝে মাঝে দু' একটা না ঘটে তাও নয়। তবে সেই কেচ্ছা নন্দীপুরুষদের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। নন্দীপুরুষরা সেদিন নতুন আমদানী সুন্দরীদের সান্নিধ্যে মশগুল হয়ে পড়েন জলসাঘরে।

সামনের পূর্ণিমায় কৃষ্ণাকুমারীর দীক্ষা হবে। বিন্দার জ্বালাতনে তাই আজ একবার মন্দিরে যেতে হচ্ছে। ব্রহ্মচারী ডেকেছে। কিন্তু আজকাল

মন্দিরে অসময়ে যেতে ভয় লাগে। তবুও উঠতে হলো। অন্দরমহল খাঁ খাঁ করছে। কানাড়ি পথ দিয়ে গেলে প্রহরীদের চোখে পড়তে হবে। কী ভাববে ওরা। ওরাই সত্যি মিথ্যে কত গুজব রটায়। নৈবিদ্যির থালা হাতেই যাবে। ভাববে ভক্তির এও এক উগ্ররূপ।

কৃষ্ণাকুমারী চলে। আজ যেন চলার মধ্যে সেই উৎসাহ নেই। ইন্দ্রজিৎ তাকে সন্দেহ করে। হায়রে, সে জানতেও পারল না কার জন্য এই কৃচ্ছ্রসাধন! যত বাধাই আসুক, সে যাবে। দীক্ষা, মন্ত্র তার চাই। তাকে পেতে হবে দেবতার আশীর্বাদ।

মন্দিরের দোরে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ এক ভয়ে বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। যদি ইন্দ্রজিৎ অন্দরমহলে যায়! না, এসময়ে সে যায় না। অন্তর থেকে বলল—ঠাকুর, তুমি আমাকে রক্ষা করো।

চারিদিকে এক সন্দেহের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মন্দিরের চত্বরে উঠে পড়ল। নাটমন্দিরের থামের আড়াল থেকে স্যুৎ করে কে যেন সরে যায়। কৃষ্ণাকুমারী দ্রুতগতিতে মন্দিরে গিয়ে ঢুকল। ভয়ে দোরটা আস্তে ভেজিয়ে সরে দাঁড়ায়। চমকে তাকিয়ে দেখে দূরে ব্রহ্মচারী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন।

ব্রহ্মচারীর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। চোখ খুলে এক অপূর্ব দৃষ্টি মেলে ধরল। কৃষ্ণাকুমারী মেঝেতে বসে পড়ে এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ব্রহ্মচারী এবার উঠে পড়ে মন্দিরের দোরে এসে দাঁড়াল। তারপর অর্গল তুলে সম্পূর্ণভাবে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হেসে বলল—সন্ন্যাসীরা সাধনায় দেবতাকে পায়—সেও গোপনে। লোকের চীৎকার, হৈ-হুল্লোড়ে দীক্ষার মূলমন্ত্র আসে না। হ্যাঁ, যার জন্য আপনাকে ডেকেছি, পূর্ণিমা মাত্র সাতদিন বাকী। সেই শুভদিনে হবে আপনার দীক্ষা।

কৃষ্ণাকুমারী চোখ বুজল। মনে মনে ভোলানাথকে একবার স্মরণ করে।

ব্রহ্মচারী কৃষ্ণাকুমারীর একবারে কাছে গিয়ে বসল, স্পর্শ না হলেও উত্তাপ পায় কৃষ্ণাকুমারীর রূপ ও যৌবনের। তার তীব্র লোলুপ দৃষ্টি কৃষ্ণাকুমারীর সারা অঙ্গে বিচরণ করতে থাকে।

কৃষ্ণাকুমারীর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ব্রহ্মচারীর এ আবার কী রূপ! তার চোখে ও কিসের ইঙ্গিত! এ তো সন্ন্যাসীর ভাব নয়। এ যে পুরুষের এক আদিম প্রবৃত্তির প্রকাশ!

ব্রহ্মচারী গলার স্বর নীচু করে বলল—শোন রাণী, তুমি কী পেয়েছ? পদাবলী পড়োনি? রাধাও কুলত্যাগ করেছিল, ছেড়েছিল আয়ান ঘোষকে।

এই হলুদপুরমহল্লায় শুধু আভিজাত্য আছে, আর আছে ভালবাসার নামে বিলাস। কোন সুখই তুমি পাওনি।

কৃষ্ণাকুমারী বিস্ময়ে তাকাল। চোখের সামনে সব দুলতে থাকে, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। ব্রহ্মচারী কি বলতে চায়?

ব্রহ্মচারী এবার কৃষ্ণাকুমারীর হাতটা খপ করে ধরে ফেলে বলে উঠল—আমাকে বাঁচাও ছোটরাণী। এই ভবঘুরে জীবনের বিরাট অতৃপ্ত আত্মাকে তুমি শান্ত কর। পিছনে যা থাকবে তা থাকতে দাও। আমি তোমাকে সুখী করব ছোটরাণী।

চকিতে কৃষ্ণাকুমারী উঠে দাঁড়ায়। টলছে তার শরীর। ভীতাকণ্ঠে চীৎকার করতে গিয়ে ভাঙা স্বরে বেরিয়ে এল—এই আপনার আসল রূপ!

—না-না, ছোটরাণী। আমার রূপ অনেক—অনেক সুন্দর। কিন্তু হতে পারল না। এখনও সময় আছে। আমাকে বাঁচাও।

—পথ ছাড়ুন। ছিঃ! আমাকে যেতে দিন।

—তুমি দীক্ষা নেবে না?

—আরও দীক্ষা? ভণ্ড, কামুক সন্ন্যাসী! আমি তো আপনার কোন অনিষ্ট করিনি। তবে এত বড় সর্বনাশ—

কথা শেষ হবার আগেই ব্রহ্মচারী বলে উঠল—ছোটরাণী, আমাকে যা ইচ্ছে বল, বাধা দেবো না, কিন্তু মনে রেখো তোমার ইচ্ছায় দেবতার ভোগ হবে না। ইন্দ্রজিতের স্ত্রী হতে পার, কিন্তু তুমি এখন পার্বতী অংশের মত পুণ্যবতী। তাই তোমাতে রয়েছে সকলের অধিকার।

—ছিঃ ছিঃ, এ আবার কোন ধর্মের নিয়ম? এই কি আপনার দীক্ষা? কৃষ্ণাকুমারী হাত বাড়িয়ে দেওয়াল ধরে ফেলে।

ব্রহ্মচারী ক্রমে ভয়ংকর রূপ নেয়। হাত বাড়িয়ে পথ আগলে বলে উঠল—আমাকে কি তুমি বিশ্বাস কর না?

—ভক্তি করতুম, শ্রদ্ধাও করেছি কিন্তু বিচারবুদ্ধি কোনদিন হারাইনি। কী চান আমার কাছে? আপনি ভুল করছেন। বউরাণীদের বিষয় যা শুনে এসেছেন তা সব সত্যি নয়। কিসেরই বা মোহ? আপনি না সন্ন্যাসী?

—না-না, ছোটরাণী, ও-কথা বলো না। সকলে বলেছে—চারুব্রহ্মচারিণীও এ-কথা বলে গেছে। না, আর ও-কথা বলো না। এই শপথ করে বলছি, সত্যি সত্যি—না থাক।

থমকে দাঁড়ায় ব্রহ্মচারী। না, সে যে পথে গিয়েছিল সে পন্থায় হবে না। ভাবুকতার স্রোতে সে ভেসে যাবে কিন্তু কৃষ্ণাকুমারীর হৃদয় গলবে না। মোলায়েম স্বরে বলল—তুমি বুদ্ধিভ্রষ্টা হয়েছো। মহাদেব তোমার সহায়। আবার বলছি, সন্দেহ-সংকুল মন নিয়ে দেবতার বিচার করো না।

—চাইনা—আমি চাই না আপনার দীক্ষা। আমাকে মুক্তি দিন।

—আমি তো তোমাকে ধরে রাখিনি। মুক্তি দেবো বলেই তোমাকে ডেকেছিলাম। বেশ, তুমি যাও। বাধা দেবো না। যাওয়ার আগে দেবতাকে প্রণাম কর। মন শান্ত হবে।

সভয়ে কৃষ্ণাকুমারী তাকাল। পা'দুটো কাঁপছে তার। গলা শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মচারীর দিকে একবার তাকিয়ে নতজানু হয়ে শিবলিঙ্গের উদ্দেশে মাথা নোয়াল। ব্রহ্মচারী তৎপর হয়ে উঠল। শেষ সুযোগ সে হারাতে চাইলো না। গলা থেকে রুদ্রাক্ষের মালা খুলে কৃষ্ণাকুমারীর মাথায় ছুঁইয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বিড বিড করে এক মন্ত্র আওড়ে সরে দাঁড়াল।

কৃষ্ণাকুমারীর দেহে এক শিহরণ বয়ে গেল। দেহে জাগল রক্তের চঞ্চলতা। মাথায় সব ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। নেশার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে। মাথা তুলে উঠে বসল। ফিকে হয়ে আসে তার স্মৃতি। আর বিচারবুদ্ধি সব জট পাকিয়ে কুণ্ডলি বেঁধে কোথায় যেন উবে চলে যায়।

ব্রহ্মচারীর ডাকে কৃষ্ণাকুমারী উঠে দাঁড়াল। এক ক্লান্তিতে তার দেহটাকে ব্রহ্মচারীর বুকে এলিয়ে দেয়। চমকে উঠল ব্রহ্মচারী। সার্থক তার রুদ্রাক্ষের মালা। সম্মোহনী শক্তিতে ভরা। কিন্তু দূর থেকে কে যেন কেঁদে উঠল। একটি মেয়ে কাঁদছে। কান পাতল—নাঃ, মনের ঝড়ের ঝাপটা। আবার চমকে উঠল। পরিষ্কার শুনল চারুব্রহ্মচারিণীর কণ্ঠস্বর। সে যেন বলছে— "আবার তুই পথ ভুল করলি ?"

ঝেড়ে ফেলে সব শঙ্কা, সন্দেহ, পাপ। কৃষ্ণাকুমারীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—আজ থেকে আমি ডাকব তোমার নাম ধরে। আমার যা আছে স-ব তোমাকে দেবো। বল কৃষ্ণা, তুমিও আমার হবে।

কৃষ্ণাকুমারী আবিষ্ট হয়ে বলল—হবো।

—মহলে যাবে কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণাকুমারা একরকম টলতে টলতে দোরের দিকে এগিয়ে গেল। ব্রহ্মচারী এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর একটি হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল—কথা দাও, যখনি তোমাকে ডাকব তুমি আসবে ?

—আসব।

অর্গল মুক্ত করে দোর খুলে সরে দাঁড়াল ব্রহ্মচারী—যাও কৃষ্ণা।

কৃষ্ণাকুমারী এক রকম টলতে টলতে কানাড়ি পথে ফিরে গেল।

ব্রহ্মচারী দূরে তাকে লক্ষ্য করে বিড বিড করে বলে চলল—আমাদের সুন্দর মিলন অভিসারে আমার শক্তি শেষ হবে। তুমিই আমার সাধনার পূর্ণাহুতি।

বাইরে বেরিয়ে ঘণ্টার শিকলে টান দিল। একসার ঘণ্টা পর পর বেজে উঠল নানা ধ্বনিতে। শব্দে জেগে উঠল হলুদপুরমল্লার এক নতুন সুর। কেউ শুনল না সেই সর্বনেশে ধ্বনি। ব্রহ্মচারীর দগ্ধ হৃদয় বলে উঠল—চারু, তুমি ফাঁকি দিয়ে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছ, সেই আগুনে আাম পুড়ে মরব না।

সব কাজ ফেলে বিন্দা আজ নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল। কেন যেন এক অশুভ ছায়া তার পিছু নিয়েছে। দিন কয়েক হলো ছোটকর্তা অন্দরমহলে আসে না। ছোট বউরাণী পরিষ্কার না বললেও সে বুঝতে পারে, এক সন্দেহের দোলায় ইন্দ্রজিৎ দুলছে।

ছোটকর্তার খোঁজে বিন্দাকে কৃষ্ণাকুমারীই পাঠিয়েছে। কিন্তু দুলভির মুখে যা শুনলো তাতে ডাকার ইচ্ছে তার আর নেই। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রজিৎ কত নীচে নেমে গেছে, সে খবর কৃষ্ণাকুমারী রাখে না। সন্দেহের রোগে লোকটা কেমন যেন হয়ে গেল। ভালোয় ভালোয় দীক্ষাটা হয়ে গেলেই তার ছুটি। অথচ সেও যে সহজে হবে তাতো মনে হয় না।

ইন্দ্রজিৎ দুলভিকে মন্দিরের উপর লক্ষ্য রাখতে বলেছে। লক্ষ্য রাখতে গিয়ে ছোট বউরাণীকে দু'একবার যে সে দেখেনি তাও নয়। তবু সে-কথা ইন্দ্রজিৎকে বলতে পারেনি। দুলভির চরিত্রে এ সয় না।

বিন্দা আবার তাকে সব বলেছে—ব্রহ্মচারীর আলাপ থেকে দীক্ষার কথা পর্যন্ত। দুলভিকে সে বিশ্বাস করে। দুলভি বলেছে—"এ ভাল করিসনি বিন্দা। ছোট কর্তার কানে গেলে তোর রক্ষে নেই। এটা যে ওনাদের ভিতরের ব্যাপার, তা তুই মাথা গলালি কেন?"

কৃষ্ণাকুমারী প্রথমে মন্দিরে গিয়ে ব্রহ্মচারীর সংগে আলাপ করতে চায়নি বটে। কিন্তু দু'জনের ইচ্ছাকে সে শুধু সংযোগ করে দিয়েছে। অন্যায়টাই বা কি করেছে সে? তবু মনটা কেন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। একবার

মন্দিরে গেলে কেমন হয়। ব্রহ্মচারীর সংগে একবার দেখা হওয়া তার বিশেষ প্রয়োজন।

মহল ফেলে বিন্দা মন্দিরের দিকে চলে। কৃষ্ণাকুমারী ইন্দ্রজিতের খবর নিয়ে তার সংগে দেখা করতে বলেছে। কী বলবে? ফেরার পথে যা হোক একটা ভেবে বলা যাবে'খন।

মন্দির ছাড়িয়ে ব্রহ্মচারীর বাড়ীর কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিন্দা। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সেই দিকে চলেছেন। এর আগে এঁকে কখনো দেখেনি সে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। অত্যন্ত বৃদ্ধ। শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে। লাঠি হাতে হাঁটছেন অতি কষ্টে। কে এই সন্ন্যাসী! কৌতূহল হয় বিন্দার। গাছের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে। সন্ন্যাসী অবশেষে ব্রহ্মচারীর বাড়ীর দোরে এসে দাঁড়াল। বিন্দাও মন্থর পদে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। এমনি স্বাভাবিক কৌতূহল তার। অনেক আগে এমনিভাবে কান পেতে কথা শোনা তার দৈনন্দিন নেশা ছিল।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চারিদিকে একবার তাকিয়ে দোরের সামনে বসে পড়লেন। আস্তে ডাকলেন—চন্দন!

চন্দন ব্রহ্মচারী পালঙ্কে বসে তন্ময়ভাবে ভাবছিল। পূর্ণিমা মাত্র ছয়দিন বাকী। পূর্ণিমা রাতে তার নিজের জন্য কাছারিবাড়ী থেকে একটা পাল্কী চেয়ে পাঠিয়েছে। সেই পাল্কীতে সোজা যাবে ত্রিবেণী, তারপর ওখান থেকে নৌকা করে গিয়ে নঙ্গর করবে তেবিলেতে। জলযাত্রা শেষ করে গো শকটে আট ক্রোশ গিয়ে থামবে চৌলাতে। সেখান থেকে শুরু গভীর অরণ্য। বনানী পথ তার নখদর্পণে। গভীর অরণ্যের মাঝে রংবালিমন্দির। সেখানে একবার পৌছাতে পারলে কার সাধ্যি তাদের ধরে। বিশেষ অসুবিধে হলে সেখান থেকে সুদূর কামাখ্যায় পালাবে। তারপর—না, এখন আর ভেবে লাভ নেই। উঠে দাঁড়াল। যা ভেবেছে তা সে করবেই। ধর্ম? সে চায় না। বিবেক? মৃত্যু হয়েছে তার। পুণ্যি? সে তো তার কাছে আকাশের রামধনু। দেওয়ালে ঝুলছে ত্রিশূল। হাতে থাকবে। অভয় মনে থাকবে দুর্জয় শক্তি, আর পাশে থাকবে কৃষ্ণাকুমারী।

হঠাৎ এক ডাকে চমকে উঠল। পরিচিত কণ্ঠস্বর। বহুদিন—বহুদিন পরে কে ডাকে অতো মধুর নামে! পরমুহূর্তে এক আংশকা হাজার হাত দিয়ে তাকে ঘিরে ধরে। পূর্ণিমা রাত্রি শুধু তার আর কৃষ্ণাকুমারীর—সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির ছায়াও থাকবে না। কিন্তু তাও মিলিয়ে যায় বহুদিনের

আকাংক্ষিত স্নেহের সম্বোধনে তাকে ডাকছে। তার অজান্তে কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে এল—বাবা!

দৌড়ে গিয়ে দোর খুলে চমকে ওঠে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়। দু'জনেই সন্ন্যাসী তবু কেন চন্দন তার পিতার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না? বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হাসলেন। কী মধুর স্নেহের হাসি। বললেন—কেমন আছিস্ চন্দন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে চন্দন বলল—আমি এখানে, তুমি জানলে কি করে?

—অনেক কষ্টে জেনেছি। কত খুঁজে তবে তো তোকে পেলাম। পাঁচদিন ধরে হেঁটে আসছি। আসতে আসতে মনে হয়েছে আর বুঝি—।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চুপ করে যান। চোখ দু'টি তার ছলছল করে ওঠে। চন্দনের পিছু পিছু লাঠিতে ভর করে ঘরের ভিতরে এলেন। চন্দন ব্রহ্মচারী পাশের ঘরে গেল জল আনতে। বৃদ্ধ নতুন জায়গার প্রতিটি জিনিস বিস্ময়ে দেখেন। জানালা দিয়ে দেখলেন শিমূল গাছের পেঁজা তুলো হাওয়ায় কেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

চন্দন জল এনে দেয়। তারপর মেঝেতে পেতে দিল একটি আসন। পা হাত মুখ ধুয়ে তিনি আসনে এসে বসলেন। মৃদু হেসে বললেন—তুই নাকি এখানে পুরোহিত? কদ্দিন এসেছিস্?

চন্দন এগিয়ে এসে বলল—দেশ দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এখানে চলে এলাম। তা আবার কদ্দিন থাকব জানি না।

—কেন রে, ঠাকুরকে ডাকছিস্, তাই নিয়ে থাক।

—ভাল লাগে না।

বৃদ্ধ এবার চোখ বড় করে তাকালেন। বুঝলেন অস্থির মন এখনো সুস্থ হয়নি। ছন্নছাড়া মনকে চন্দন বাঁধতে পারেনি। এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—চন্দন, আজ আমি বৃদ্ধ। ভগবানের হাতেই তোকে দিয়ে যাবো। তবু মনটাকে উড়তে দিস্ না বাবা। তার যে চাওয়ার শেষ নেই।

—যে কিছুই পায়নি তার মনকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে?

বৃদ্ধ হাসলেন। —কামনা, শুধু কামনা।

—আত্মার কামনা না মিটলেই সে অতৃপ্ত থেকে যায় বাবা।

—তা ঠিক চন্দন। তবু সন্ন্যাসীর কামনা যে তার ঈশ্বর। তার নামে মন শান্ত হয়। অতৃপ্ত হয় না। ঠাকুরকে না পেলে আকুল হয়ে ওঠে কিন্তু আত্মা কি অতৃপ্ত হয়?

—সংসারী যারা ?

—তাদের ঝামেলা অনেক। তাইতো সবচেয়ে কঠিন তাদেরই, আত্মাকে তৃপ্ত করে ঈশ্বরের আরাধনা করা।

—কিন্তু যদি সে সন্ন্যাসী আবার সংসারী হতে চায় ?

—হতে পারে চন্দন, কিন্তু শান্তি পায় না।

—কেন ?

—মৃত্যুকে যারা ভালবাসে তারা কি জীবন্মৃতকে পছন্দ করে ? কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন চন্দন ?

চন্দন এবার মাথা হেঁট করল। কিছু বলতে গিয়ে একবার চমকে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এবার বৃদ্ধ পিতা চন্দনের ঘরটি ভাল করে দেখেন। ঘরের দুটো বড় বড় দরজাই ঠিক রংবালী মন্দিরের দরজার মত। ভিতরের দিকে একটি ঘর দেখা যায়। লোহার শিক দেওয়া দু'টো বড় জানালা। মসৃণ লাল মেঝের মধ্যিখানে এক পদ্মফুল আঁকা। পটুয়াদের আঁকা গোপীদের বস্ত্র হরণের একটা ছবি দেয়ালে টাঙানো। দুটো রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে। ঘরের কোণে ছোট্ট এক টুলের উপর গঞ্জিকা সেবনের উপকরণগুলো সাজানো। বাঁদিকের খাটের ওপর পরিষ্কার নিভাঁজ বিছানা গেরুয়ার চাদরে সযত্নে আবৃত। ঐখানেই তাঁর আদরের চন্দন শোয়।

হঠাৎ এক আশা জাগে। এই ঘরে তাঁরও কি একটু জায়গা হয় না ? আজ তিনি বৃদ্ধ, বড়ই দুর্বল। আর এই জীর্ণ দেহটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারেন না। চন্দন তাঁর পাশে এসে এই বৃদ্ধ পিতার আজ ভার নিক না। চন্দনকে কি সেই কথা বলবেন ? এখানে যদি ওর মন না টেকে তবে চলুক রংবালিতে, যেখানে ওর বাল্যকাল আর যৌবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। পিতাপুত্র মিলে ঘরটাকে আবার ঠিক করে নেবেন। আর এখানেই যদি থাকে, তাহ'লে তাঁর শেষ জীবন এখানে চন্দনের কাছেই কাটিয়ে দেবেন।

খালের ফুরফুরে হাওয়া এসে লাগে। এক তৃপ্তির আস্বাদন বহুদিন পর অনুভব করেন চন্দন ব্রহ্মচারীর বৃদ্ধ পিতা।

ব্রহ্মচারী ঘরে এসে ঢুকল, বলল—আহারের বন্দোবস্ত করে এলাম। একটু বিশ্রাম করে স্নান করে ফেল। এই অবেলায় ঘাটে আর যাওয়ার দরকার নেই। বাইরেই জল তুলে স্নানের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

—হ্যাঁরে চন্দন, বাবা ভোলানাথকে আমায় দেখাবি না, আরতি কখন আরম্ভ হবে রে? তোর পুজো কোনদিন দেখিনি। আজ আমায় দেখাস, কেমন? ছোট্ট শিশুর মতো তিনি কথাগুলো এক নাগাড়ে বলে গেলেন।

এসব কথার কোন উত্তর না দিয়ে চন্দন বলল—এখানে আর ভাল লাগছে না। ঠিক করেছি, অন্য কোথাও চলে যাব।

বড় বড় চোখ ক'রে তাকালেন বৃদ্ধ। কোথায় যেন আশাহতের এক করুণ ছায়া পড়ল বার্ধক্য দুর্বল ঐ ক্লান্ত দুই চোখে।

—কেন রে, কি খারাপ লাগছে? বেশ তো আছিস্ এখানে।

—কি করে বুঝলে?

—তোকে দেখে, এখানকার সব কিছু দেখে।

—একটুখানির দেখাতেই সব বুঝে নিলে?

—অশান্তিটা তোর কোথায়, আমায় বল দিকিনি চন্দন। মনে রাখিস্, শান্তি আর অশান্তি নিজের ওপরই সব সময়ে নির্ভর করে। বাইরের কেউ শান্তি এনে দিতে পারে না। নিজেকেই তা এনে নিতে হয়। ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখ, শান্তি আসবেই।

—ভগবানকে পেলে শান্তি আসে জানি, কিন্তু তাঁর কাছে না পৌছান পর্যন্ত যে পথ দিয়ে সাধককে যেতে হয় সে পথ যে মোটেই শান্তির নয় তা তুমি নিশ্চয় জান।

—সেই পথের যে দুঃখ-কষ্ট, সে তো পরশ পাথরের মত ভগবানের করুণার ছোঁয়ায় সোনা হয়ে যায়। তখন যে দুঃখ-কষ্ট সে তো সাধারণ দুঃখ কষ্টের মত নয়।

—তাহ'লে তুমি বলতে চাও সন্ন্যাসীর ভগবান ছাড়া তার আর সুখ-দুঃখ-আকাংক্ষা বলে কিছু থাকবে না।

—না চন্দন।

—এ আমি বিশ্বাস করি না। তোমার তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল।

—আমার তত্ত্ব তো ভুল হবেই চন্দন। মৃত্যু থেকে জীবন্মৃতকেই তুমি বেশী ভালবাস।

—বাবা!—

এক ক্রুদ্ধ চীৎকারে চমকে ওঠেন বৃদ্ধ। আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। চন্দনের দিকে তাকিয়ে, পুত্রকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বেলা অনেকখানি পড়ে

এসেছে। দূরে মন্দিরের চূড়া পড়ন্ত রোদে ঝিকমিক করছে। দালানের পায়রাগুলি ঝট পট করে এক খোপর থেকে আর এক খোপরে উড়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই এক বিষাদ, এক ক্লান্তিতে সমস্ত চত্বর কেমন যেন নিঝুম হয়ে পড়ে। চত্বর ছাড়িয়ে পথ ধরে মন্থর গতিতে হেঁটে চলেছেন বৃদ্ধ। সারাদিন অভুক্ত, ক্লান্ত হয়ে তিনি পুত্রের কাছে এসেছিলেন।

পিছু ডাকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একবার থামলেন।

—বাবা, তুমি না খেয়ে কোথায় চললে?

—তুই এখনো ফিরে আয়, চন্দন। সর্বনাশা সম্মোহনী পথ ছেড়ে দিয়ে রংবালিতে আমার কাছে ফিরে আয়। ঐ পথ ভয়ানক খারাপ—মহাপাপের পথে আর যাস্‌নি।

—এসো, তুমি খেয়ে নে'বে চল বাবা।

—আমি আর খাব না রে। ক্ষিধে আর নেই।

—তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ? না খেয়ে গেলে আমার যে অমঙ্গল হবে।

—তোর কোন অমঙ্গল হবে না। আমি আশীর্বাদ করছি। তুই যা।

চন্দন ব্রহ্মচারী বিস্মিত হয়ে দেখে তার বৃদ্ধ পিতার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছে। তাঁর শুভ্র কেশ হাওয়ায় কাঁপছে। কুঁজো হয়ে হেঁটে চলেছেন মন্থর গতিতে। কত ক্লান্ত, দুর্বল সেই পদক্ষেপ।

দূরে রাস্তার মোড়ে বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন আর একবার। পিছন ফিরে চন্দনের দিকে তাকালেন, শেষবারের মত ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন তাঁর প্রিয় পুত্রকে। তারপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেদিন পূর্ণিমা। মহলে মহলে উৎসবের ঘনঘটা। কাছারিবাড়ী শূন্য। ইন্দ্রজিৎ আজ কয়দিন হলো কৃষ্ণাকুমারীর কাছে যায়নি। তার জন্য কৃষ্ণাকুমারীর তরফ থেকে কোন অভিযোগও আসেনি। হ্যাঁ, সন্দেহ তার সত্যি। যা ভেবেছে তা হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। ফুলের মত পবিত্র কৃষ্ণাকুমারী—তাকে নিয়ে ইন্দ্রজিতের গর্ব কম ছিল না। কিন্তু আজ নিজে না দেখলেও অনেক কথাই নানা মুখে তার কানে এসে পৌছেছে। ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণা, কৃষ্ণা আর ব্রহ্মচারী। ছিঃ, ছিঃ! অস্ফুট স্বরে ইন্দ্রজিৎ নিজের মনেই বলে, চমৎকার প্রণয় চলেছে!

ইন্দ্রজিৎ তাকিয়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেঝেতে নেমে এল। কত টুক্রো টুক্রো কথাই না আজ তার মনে পড়ছে। ঘূর্ণির আবর্তে পড়েছে কৃষ্ণা। কে সেই ঘূর্ণি? ব্রহ্মচারী? তাই বলেছিল সকলের অজ্ঞাতে তাকে নিয়ে যদি দূরে চলে যায়। এতক্ষণে সেই গূঢ় রহস্যের অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

উত্তেজিত ইন্দ্রজিৎ পায়চারি করে সমস্যার পর সমস্যা নিজেই খণ্ডন করতে থাকে। সুন্দর মুখখানিতে ফুটে উঠল চিন্তার শত রেখা। সে যেন পাগল হয়ে যাবে। ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণা দূরে নেই। তারা এখন একে অপরের অনেক কাছে। দেহের সম্পর্ক! হলেই বা, আপত্তি কি? চীৎকার করে ডাকল—দুল্‌ভি!

দুল্‌ভি বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। তার ছোটবাবু আজকাল কী হয়ে গেছে। তারই জন্য কি নোংরা কাজই না তাকে করতে হচ্ছে। তা হলেও: শ্যাফলার মুখে যা শুনল তা অতি ভয়ংকর কথা। কিন্তু সেই কথা নিজের মুখেই বা ইন্দ্রজিৎকে কি করে বলে! তাছাড়া শ্যাফলা অতি ধূর্ত। মিথ্যা কথায় ওস্তাদ। ছোট বউরাণী মন্দিরে যায়, ব্রহ্মচারীর সংগে হয়তো কথাও বলে—তাতে দোষ কি?

দুল্‌ভি ভিতরে এসে দাঁড়াল।

ইন্দ্রজিৎ থমকে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে বলে—কী খবর?

দুল্‌ভি মাথা হেঁট করে থাকে।

ইন্দ্রজিৎ পাগলের মত চীৎকার করে উঠল—তোর ছোটরাণী কি তোকে কিছু বকশিস দিয়েছে? হারামজাদা!

—হুঁজুর—চীৎকার করে দুল্‌ভি পিছু হটে আসে। ছলছল করে উঠল তার চোখ। কাঁপতে থাকে তার শরীর। ছোটবাবু তাকে অবিশ্বাস করে। তবু সে বলল—হুঁজুর আপনি যা শুনতে চান, শ্যাফলা সব বলবে।

—শ্যাফলা! ইন্দ্রজিৎ বিস্ময়ে তাকায়।

—হ্যাঁ হুঁজুর। শ্যাফলা আপনার সংগে দেখা করতে চায়।

—ডাক তাকে।

কাছারিবাড়ীর বাইরে শ্যাফলা বসে আকাশ পাতাল ভাবছিল।

কৈলাস চৌধুরীই তাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছে। অর্থ পেয়ে সে খুশিই হয়েছিল কিন্তু এমন কাজ করতে তার মন সায় দিচ্ছিল না।

ইন্দ্রজিৎ কৈলাস চৌধুরীকে অপমান করেছিল। সেই অপমান সে ভুলতে পারেনি। কৃষ্ণাকুমারী মন্দিরে যায়। ব্রহ্মচারীর সংগে ঠাট্টা তামাসা করে। সে সংবাদ তার স্ত্রী কংকনার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। ধূর্ত-

কৈলাস চৌধুরী শয়তানি বুদ্ধিতে হেসে উঠল। অর্থ দিল শ্যাফলাকে। কাজ তার হবে, গোপনে লক্ষ্য রাখা আর কথার ওপর রঙ চড়িয়ে ইন্দ্রজিতের কাছে লাগানো। লক্ষ্য সে রাখছিল। কিন্তু কাছারিবাড়ীতে এসে ইন্দ্রজিতের সামনে গিয়ে কিছু বলতে পারেনি। দিন কয়েক আগে কৈলাস চৌধুরী ওকে সতর্ক করে গেছে। শুধু অর্থ হজম করলে তা পেটের নাড়ি ভুঁড়ির সঙ্গে টেনে বের করে নেবে। তাই সে মরিয়া হয়েই দুল্‌ভিকে বলেছিল। সে সত্যি মিথ্যার এক অদ্ভুত কাহিনী। দুল্‌ভি যে আশ্চর্য হয়নি তাও নয়। অবশেষে সংগে করে ইন্দ্রজিতের কাছে নিয়ে এল।

দুল্‌ভির ডাকে শ্যাফলা কাছারিবাড়ীর ঘরে এসে দাঁড়াল। ইন্দ্রজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে সিটকে উঠল।

ইন্দ্রজিৎ গম্ভীর হয়ে বলল—মোটা বকশিস দেবো, আমাকে সব খুলে বল।

শ্যাফলার গলা কেঁপে যায়। ইন্দ্রজিতের চোখের উপর চোখ রাখতে পারে না সে।

ইন্দ্রজিৎ আবার বলে—ভয় কি? সব বল। কিছু গোপন করিস্ না।

—হুঁজুর, ছোটরাণী মা এখন ব্রহ্মচারীর ঘরে।

—ব্রহ্মচারীর ঘরে! বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আত্মা যেন এক অসহ্য যন্ত্রণায় হাত বাড়িয়ে অবলম্বন খোঁজে।

—হ্যাঁ হুঁজুর। শুধু কি তাই,—কতবার কত দুপুর, কত রাত্রি—

—শ্যাফলা!—চীৎকার করে উঠল ইন্দ্রজিৎ।

কাছারিবাড়ীর শূন্যে ঝালরের বাতিগুলো চমকে উঠে দুলতে থাকে। দুল্‌ভি ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে।

—তুই যা শ্যাফলা। মোটা বকশিস তুই পাবি—যা। সরে যা আমার সামনে থেকে সবাই।

শ্যাফলা গুটি গুটি পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল। দুল্‌ভিও চলে যায়।

ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দ হয়ে। বুকের ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। শিরায় উপশিরায় শুরু হোল উষ্ণ স্রোতের প্রচণ্ড প্রবাহ। আজ পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নাস্নাত পূর্ণিমা। হ্যাঁ সে যাবে।

একরকম টলতে টলতে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। পায়ের কাছে কে যেন আছাড় খেয়ে পড়ল। না তাকিয়ে ভাঙাস্বরে বলল—কে?

—হুজুর আমি দুল্‌ভি। ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে দুল্‌ভি।

—কী চাস্‌?

—হুঁজুর এ সত্যি নয়।

—শুনলাম।

—হুঁজুর এ সত্যি নয়, সব মিথ্যে। বারবার বলে মাথা খুঁড়তে থাকে।

—দুলভি, পথ ছাড়। বেয়াদবী করলে তোকে আমি খুন করব। সরে যা। এতদিন এ সব কথা আমাকে বলিসনি কেন? মিথ্যাবাদী।

—হুঁজুর আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন না?

—দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

উঠে দাঁড়াল দুল্‌ভি। তারপর ক্ষুব্ধ স্বরে বলল—হুজুর, আমি মিথ্যাবাদী নই। এখুনি আমি চলে যাচ্ছি। হলুদপুরমল্লায় আর থাকব না।

—যা—যার যেখানে ইচ্ছে চলে যা। আমি কাউকে চাই নে। ইন্দ্রজিৎ আবার চলতে শুরু করে।

দুল্‌ভি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কেঁদে উঠল—মা কালী! তুই যেতে বলেছিলি। যাইনি। আজ সত্যি তোর কাছে যাচ্ছি মা। তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই—কেউ নেই।

ইন্দ্রজিৎ কাছারিবাড়ী পিছনে ফেলে নাটমন্দিরে এসে দাঁড়াল। সূর্যাস্ত হতে আর বাকী নেই। নাটমন্দির খালি। মন্দিরের কালো পাথরের গায়ে নানা বিচিত্র ধরনের নারীমূর্তি নানা ভঙ্গিতে নৃত্যরত। দিনান্তের আলোর ছটায় মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মন্দিরের দোর খোলা।

মন্দিরের পাশ কাটিয়ে শিমূলগাছের তলা দিয়ে অতি সন্তর্পণে ব্রহ্মচারীর বাড়ীর পাশে এসে দাঁড়াল। ঘোরান বারান্দা। সামনে না গিয়ে অপর পাশের বারান্দায় গিয়ে উঠল।

কী অদ্ভুত চলা। ঠিক যেন শিকারের খোঁজে হিংস্র জানোয়ারের পদক্ষেপ। জানালা বন্ধ। উৎসুক হয়ে জানালায় কান পাতল। কোন কথা কানে এল না। হঠাৎ লক্ষ্য গেল। জানালার গায়ে একটি ছিদ্র। সেই ছিদ্র দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে প্রথমটা কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকার। ক্রমে অন্ধকার চোখে সয়ে যায়। ভিতরটা ততটা অন্ধকার নয়। ইন্দ্রজিতের সমস্ত রিপু একসংগে সজাগ হয়ে উঠে। চমকে উঠল তার সারা দেহ। দেয়াল ধরে চীৎকার করতে গিয়ে গলা থেকে এক ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল।

মেঝেতে একটি আসনের উপর কৃষ্ণাকুমারী বসে। স্থির হয়ে। দেহে কোন চঞ্চলতা নেই। বসন অলক্ষ্যে অবিন্যস্ত। ব্রহ্মচারী তার কপালে একটি রুদ্রাক্ষের মালা ছুইয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি বললে। কৃষ্ণাকুমারী মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। ব্রহ্মচারী দু'বাহু দিয়ে কৃষ্ণাকুমারীকে তুলে কাছে টেনে আনল।

ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজল। সব দুলতে থাকে। মন্দিরের চূড়ো থেকে একটা কাল পেঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়। অশুভ ইঙ্গিত! মাথায় দপ করে জ্বলে ওঠে হাজার মশালের আগুন। নাঃ, আর নয়। এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সে উন্মাদ হয়ে যাবে। পা দুটো ভারি হয়ে উঠেছে। বুকের প্রতিটি স্পন্দন তার কানে ধ্বনিত হতে থাকে। গভীর নিঃশ্বাস টেনে অনুভব করে নিজের সত্বাকে। নেমে এল বারান্দা থেকে। তারপর অসলগ্ন পদক্ষেপে মহলের দিকে ছুটে চলল। বড় ফটকের প্রহরীরা ইন্দ্রজিতের অস্বাভাবিক চলা আর চাহনি দেখে সেদিন সভয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল।

ব্রহ্মচারী কৃষ্ণাকুমারীর কপালে রুদ্রাক্ষের মালা ছুঁইয়ে কাছে টেনে বলল—কৃষ্ণা! আজ থেকে তুমি আমার। বল?

কৃষ্ণাকুমারী আয়ত চোখ তুলে বলল—হ্যাঁ।

আজ রাতেই তুমি আর আমি এই অভিশপ্ত হলুদপুর ছেড়ে পালাব। পাল্কী ঠিক হয়েছে।

—কোথায়? ক্লান্তস্বরে কৃষ্ণাকুমারী বলে।

সে এক অদ্ভুত জায়গায়। তোমাকে আর মহলে ফিরে যেতে হবে না। পাশের ঘরে গিয়ে বসো। আমি সময়মত তোমাকে ডাকব।

কৃষ্ণাকুমারী উঠে দাঁড়াল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছোট্ট এক শিশুর মত পায়ে পা ফেলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ব্রহ্মচারী এক উল্লাসে রুদ্রাক্ষের মালা হাতের মুষ্টিতে শক্ত করে চেপে ধরে হেসে উঠল—আমার এই শক্তিতে তোমাকে পেলাম কৃষ্ণা। চারু, তুমি ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেও কৃষ্ণা আজ যেতে পারল না।...হ্যাঁ, সে নতুন ভাবে বাঁচবে। নতুন জীবন লাভ করবে। জীর্ণ ধর্মের পোশাক ছেড়ে সে হবে সংসারী।

হঠাৎ বাইরে দরজায় কে যেন মৃদু ধাক্কা দিল। ব্রহ্মচারী চমকে ওঠে। কিছুক্ষণ ভাবে। ইতস্ততঃ করে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর অর্গলমুক্ত করতে ঝড়ের মত ঢুকে পড়ে বিন্দা।

বিস্ময়ে ব্রহ্মচারী বলে—বিন্দে তুই!

—হ্যাগো ব্রহ্মনন্দন আমি। আমি মরে যাইনি। বউরাণী কোথায়?

—কে বউরাণী?

বিন্দার দু'চোখ জ্বলে ওঠে। —বউরাণীকে জান না? আমার নামও বিন্দা। ছিঃ, এত বিশ্বাস করেছি ঠাকুর তোমাকে। কাল সাপ। দুধ খেয়েও নিস্তার নেই, ছোবলও মারা চাই। আমিও জানি তার ওষুধ।

—কী বলছিস্ বিন্দে?

—উঃ মাগো! এতবড সর্বনাশ আমি নিজের হাতে করলাম। এখনো সময় আছে, পালাও—ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাও। এই বিন্দার চোখে সব ধরা পড়েছে, রক্ষে নেই।

ব্রহ্মচারীর রূপও বদলে যায়। চীৎকার করে উঠল—কী বলতে চাস তুই?

বিন্দা পাশের ঘরে যেতে চাইলে ব্রহ্মচারী পথরোধ করে দাঁড়াল। বিন্দা চীৎকার করে ডেকে উঠল—বউরাণী!

কৃষ্ণাকুমারী চুপ করে বসে দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিল। বিন্দার চীৎকার তার কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। শুনলেও ঐ ডাক তাকে আজ সচেতন করতে পারল না। মন্ত্রের জাল যেন তার স্মৃতি ও ভাবনার পথ আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

ব্রহ্মচারী বিন্দার পথ আগলে দাঁড়াল। গম্ভীর স্বরে বলল—বিন্দে, তুই ভুল করছিস্. তোদের বউরাণী তোদের কাছেই যাবে।

—না ব্রহ্মনন্দন, শুকনো কথায় আর চিঁড়ে ভিজবে না। তোমার আসল রূপ আমি জেনেছি। যে তার বৃদ্ধ অভুক্ত পিতাকে তাড়িয়ে দিতে পারে, সে কি মানুষ? আজও দেখলাম তোমার কুৎসিত মন্ত্রের খেলা। ছিঃ ছিঃ, এত নীচ প্রবৃত্তি তোমার।

ব্রহ্মচারী চমকে যায়। বুঝতে পারে তার গোপন খেলা বিন্দা জানতে পেরেছে। মরিয়া হয়ে বিন্দার কপালে রুদ্রাক্ষের মালা ছোঁয়াতে গেলে বিন্দা সরে যায়। আগে থেকেই যেন প্রস্তুত ছিল।

তবু ব্রহ্মচারী এগিয়ে গেল। সুন্দর চেহারা হঠাৎ কেমন যেন হিংস্র হয়ে ওঠে। মুষ্টিবদ্ধ রুদ্রাক্ষের মালা শেষবারের মত বিন্দাকে ছোঁয়াবার জন্য হাত এগিয়ে দেয়। বিন্দাও যেন ঐ সুযোগ খুঁজছিল। ব্রহ্মচারীর হাত থেকে নিমেষের মধ্যে মালাটা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।

ব্রহ্মচারী চীৎকার করে উঠল। রুদ্রাক্ষের মালার গুটিগুলো সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষ্ণাকুমারীও সভয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাইরে আকাশের কোলে সশব্দে আতশবাজি ফেটে পড়ে পূর্ণিমা উৎসবের হাসির কটাক্ষে। চমকে উঠে কৃষ্ণাকুমারী। মুহূর্তের জন্য তার চেতনা ফিরে এল। চোখে মুখে ফুটে উঠল এক ভয়াল ছায়া। চারিদিকে বদ্ধ দেয়াল। হঠাৎ চোখ পড়ল, দোর আগলে ব্রহ্মচারী। চোখে তার জ্বলন্ত আগুন।

কৃষ্ণাকুমারী এগিয়ে গেল। ব্রহ্মচারী বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠল—কোথায় চললে কৃষ্ণা? দীক্ষা নেওয়ার সংগে সংগে আজ থেকে তুমি সম্পূর্ণ মহাদেবের।

বাইরের ঘর থেকে চীৎকার ভেসে এল—বউরাণী, এ মিথ্যা কথা।

কৃষ্ণাকুমারী আর্তনাদ করে পিছু হটে আসে।

ব্রহ্মচারী আবার বলল—শোন কৃষ্ণা, ফিরে তুমি কোনদিনই যেতে পারবে না। যে আশ্রয়স্থলের আশায় যেতে চাইছো সেই আশ্রয়স্থলই হবে তোমার মৃত্যুর কারণ।

বিন্দা দৌড়ে এসে ব্রহ্মচারীর হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে চীৎকার করে উঠল—ছেড়ে দাও ব্রহ্মচারী। আগুনে হাত দিও না, দোর ছেড়ে দাও। বউরাণী, চলে এসো।

—ভয় নেই কৃষ্ণা। বিন্দা অযথা ভয়ের কথা শোনাচ্ছে। এই তো আমি আছি। এখনো ভেবে দেখ। মুক্তির আস্বাদ পাওনি বলেই তোমার এত ভয়।

কৃষ্ণাকুমারী ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। মন্ত্রে প্রাণ পেয়ে হাজার হাজার সাপ শূন্যে কিলবিল করছে। তাদের হিস্‌হিস্ শব্দে ঘর মূর্ছিত। হঠাৎ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল চোরা দরজায়। ঘরের দক্ষিণ দিকে। ছুটে গেল সেখানে। চোরা দরজা খুলে ফেলল।

—কৃষ্ণা, যেওনা—বজ্রগম্ভীর স্বরে চীৎকার করে ওঠে ব্রহ্মচারী। কিন্তু কৃষ্ণাকুমারী উন্মাদের মত ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়ল। মুক্ত এক রাশ বাতাস তার চোখে মুখে মহানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিন্দার চীৎকারে ব্রহ্মচারী ফিরে দাঁড়াল। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলে উঠল—ব্রহ্মনন্দন, পালাও। আমি তোমাকে রাতটুকু সময় দিয়ে গেলাম। নন্দীরাজদের হাসি দেখেছ, কিন্তু তাদের নিষ্ঠুর হাত দেখনি। পালাও ব্রহ্মনন্দন—পালাও।

বিন্দা ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ব্রহ্মচারী থমকে দাঁড়ায়। সভয়ে দেখে রুদ্রাক্ষের গুটিগুলো। সারাঘর ছড়িয়ে, যেন অগণিত রক্ত চক্ষু। তার দিকে তিরস্কারের ভঙ্গিমায় কী ভীষণভাবে তাকিয়ে। তার মন্ত্র ব্যর্থ হলো।

সত্যি সে পরাজিত হলো। পিতার সাবধান বাণী ভেসে এল। কে যেন হেসে ওঠে। চারুব্রহ্মচারিণী যেন বলছে—"শেষে তুমিও পথ-ভুল করলে?" ব্রহ্মচারী দুহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বসে পড়ে। চীৎকার করে বলে উঠল—চারু ফিরে এসো, এ আমার সত্যিকারের রূপ নয়—বিশ্বাস কর। তুমি ফিরে এসো। ঘরটি ব্রহ্মচারীর আর্তনাদে ভরে উঠল।

বিন্দা এক দৌড়ে মহলে এসে থামল। হাঁপাতে থাকে। ভাবতে চেষ্টা করে। দেয়াল ঠেস দিয়ে চোখ বুজল। আঁৎকে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল বিরাট এক গহ্বর। হাঁ করে আছে এক প্রচণ্ড ক্ষুধায়। সত্যি তো এ অন্যায় তার ইচ্ছাকৃত নয়। তবে হ্যাঁ, একটা ভুল—বিরাট ভুল। সে কী করবে? ইন্দ্রজিৎকে বলে দেবে? নাঃ, লাভ নেই। সন্দেহের আগুনে পুড়ে মরছে। বলতে গিয়ে আগুনে ঘি-ই ছিটানো হবে। হ্যাঁ, সে বড় বউরাণীকে বলবে। নিশ্চয় তবে একটা ব্যবস্থা হবে। তিনি বুদ্ধিমতী।

মন্থর পদে বিন্দা চৈত্রমহলে এসে দাঁড়াল। কী বলবে তা মনে মনে একবার আওড়ে নেয়। কিন্তু ঘরে ঢুকেই হতভম্ব হয়ে যায়। ভিতরে না ঢুকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে। বড় বউরাণী রোহিণী হাততালি দিয়ে হাসছেন, গান গাইছেন। অবসন্ন স্বর। পা টলছে তার। চোখদুটি লাল। ভাং খেয়ে উন্মত্ত। যাওয়া নিষ্ফল। বিন্দা সেখান থেকে ফিরল। কি করবে একবার ভেবে নেয়।

অন্দরমহলে উৎসবের ঢেউ প্রতিবারের মত আজও একইভাবে বয়ে চলেছে। নূপুরের ধ্বনি, ঘুঙুরের ঝমক আর টুকরো হাসির গুঞ্জনে মুখরিত চারিদিক। ঝালরের বাতিগুলো বাতাসে জোরে দুলতে শুরু করেছে। কৃষ্ণাকুমারীর ঘরের দিকে চলল বিন্দা।

ইন্দ্রজিৎ মহলে এসে দাঁড়াল। ভাবতে গিয়ে কিছুই ভাবতে পারে না। সকলের দৃষ্টির অগোচরে ইন্দ্রজিৎ মহলের ছাদে উঠে এল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। লছমিখাল যৌবনের উচ্ছলতায় পূর্ণচন্দ্রকে স্বাগত জানাচ্ছে।

ইন্দ্রজিৎ দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে পড়ে। এক অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণায় চিন্তার স্নায়ুগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে চায়। দূরে ঝাউগাছের জটায় আটকে পড়া বাতাসের গোঙানি ভেসে আসছে। প্রাচীরের গম্বুজগুলোও যেন আজ রহস্যভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ইন্দ্রজিৎ চীৎকার করে উঠল—আমার দেহে নন্দী রক্ত! না-না, এ আমি ক্ষমা করব না—কিছুতেই ক্ষমা করব না। চীৎকারের প্রতিধ্বনিতে ভেসে এল উৎসবের ধ্বনি। আজ যে পূর্ণিমার উৎসব। বাইজীমহলের বাইজীদের উচ্ছল নৃত্য আর তার সংগে সুরায় ভেজানো মধুর সংগীত মহলের দেয়ালে ঘা খেয়ে দূরে, বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ছে।

বাতাসে ভেসে এল সানাইএর বেহাগরাগিণী। সারারাত বাজবে। লছমিখালে আজ বজরা ভাসবে না। পূর্ণিমার জোয়ার। কুন্তী নদীর জল সশব্দে খালে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বজরা উলটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

ইন্দ্রজিৎ আকাশের দিকে তাকাল। এখন কৃষ্ণাকুমারী কী করছে! ব্রহ্মচারীর অভিসারের নায়িকা। উদ্দীপিতা হয়েছে জীবনের সবচেয়ে বড় কাম হিল্লোলে। ব্রহ্মচারীর বুকে মাথা রেখে এতক্ষণ হয়তো যৌবন শৃঙ্গারে কয়েক ধাপ এগিয়েও গেছে।

ইন্দ্রজিৎ এক নিষ্ফল আক্রোশে হাতের মুষ্টি নিষ্পেষিত করতে থাকে। আপনমনে গর্জে উঠল—হ্যাঁ, আমি তোমাকে শাস্তি দেবো। আমার বিচার নির্ভুল। অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে।

দূরে লছমিখালে জলের হাসি তীরে আছড়ে ভেঙ্গে পড়ল। যেন ব্যঙ্গ করছে ইন্দ্রজিৎকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে চলল—আঘাতের ওড়না দিয়ে তোমার পাপের মুখটা একেবারে বেঁধে ফেলবো। সেই আঘাত—তা জীবনেও কল্পনা করতে পার না কৃষ্ণা!

জ্যোৎস্নার এত আলো চোখ যেন সহ্য করতে পারছিল না। ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজল। হ্যাঁ, দেহে শুনতে পাচ্ছে রক্তের উত্তাল তরঙ্গধ্বনি। প্রতিহিংসার হাজার চিতা জলছে দাউ দাউ করে। আজ তার কাছে সব কালো—সব অন্ধকার।

ইন্দ্রজিৎ চোখ মেলে। অন্ধকার! চোখের কালো তারা নেচে উঠল। তবে তাই হোক। সব অন্ধ—সব অন্ধকার হয়ে যাক। বুকে হাত চেপে এক প্রতিহিংসার আনন্দে বলে উঠল—তুমি বেঁচে থাকবে কৃষ্ণা কিন্তু সব কালো হয়ে যাবে তোমার কাছে। সব লেপে মুছে কালো করে দেবো।

জোরে হেসে উঠল। চমকে উঠল সুবিস্তৃত ছাদ। এরকম অট্টহাসি ইন্দ্রজিৎ কখনো হাসেনি।

পর মুহূর্তে এক সন্দেহ মনে দোলা দিয়ে যায়। কৃষ্ণাকুমারী ফিরেছে তো? আজ পূর্ণিমা। সে জানে ইন্দ্রজিৎ তার মহলে আসতে পারে। ফিরতে তাকে হবেই। তার চেয়ে বরং কৃষ্ণাকুমারীর ঘরে গিয়ে সে বসবে। অপেক্ষা করবে। দেখবে তার অভিসারের নবরূপ।

ডাক পড়ল রঘুসিংএর। হুকুম হলো মহলের পুত্তিকা ঘাটে রূপা নৌকা আনার জন্য। জোয়ারের কথা তুলেছিল। ইন্দ্রজিৎ শোনেনি। বলেছিল জোয়ার আসার অনেক আগেই সে চলে আসবে। কারোর বজরা, নৌকা না ভাসুক তার নৌকা ভাসবেই। আজ যে তার শেষ পূর্ণিমা।

একরকম টলতে টলতে ইন্দ্রজিৎ ছাদ থেকে নেমে এল। বারান্দা পেরিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর ঘরে এসে দাঁড়াল। কে পাশ দিয়ে হেঁটে গেল চোখ তুলে তা দেখলও না। কে কি বললে সে-কথাও বোধগম্য করার মত মন বা শোনার শক্তি তার ছিল না।

ব্রহ্মচারীর আস্তানা ছেড়ে কৃষ্ণাকুমারী মহলে ফিরে আসে। এক দৌড়ে নিজের ঘরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দরজা বন্ধ করে প্রাণভরে নিশ্বাস নেয়। চরম ব্যর্থতার আঘাত শরীর যেন আর বইতে পারে না। তার সমস্ত ভাবনা, কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস!

চমকে উঠল কৃষ্ণাকুমারী। কে ডাকে। চোখ মেলল। পালঙ্কের একটি পাশে ইন্দ্রজিৎ স্থির হয়ে বসে। বহুদিনের সঞ্চিত এক ব্যথা উছলে উঠল। নিজেকে আর সামলাতে পারে না। আর সে পারে না এই দুঃসহ জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াতে। দৌড়ে গিয়ে ইন্দ্রজিতের কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল।

—কি হলো কৃষ্ণা? একরাশ ক্রোধ ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে ফেটে পড়ে। হৃদয় তার পাথর হয়ে গেছে। তবু সামলে নিতে হয়। কণ্ঠে টেনে আনে মোলায়েম সুর। একটুখানি অভিনয়ের জন্য যেন।

কৃষ্ণাকুমারী মুখ তোলে।

ইন্দ্রজিৎ বিস্মিত হলো। এ কী চেহারা হয়েছে কৃষ্ণাকুমারীর! চোখের কোণে কালি পড়েছে। গাল ভেঙ্গে চোয়াল উঁচু হয়ে উঠেছে। কথার মধ্যে সেই প্রাণস্ফূর্তি নেই।

কৃষ্ণাকুমারী আজ কি বলবে? বলার থাকলেও তা কেউ কি কোনদিন তার কথা শুনেছে? আর, আজ এই নিদারুণ মর্মবেদনা, তা কি কেউ হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে! সন্দেহের মাপকাঠিতে কি তার বিচার করবে না?

—বাইরে বেড়াতে যাবে কৃষ্ণা?

কৃষ্ণকুমারী বাঁহাত দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে আশার আনন্দে বলে উঠল—যাব, এখুনি যাব। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল—এর আগে এইভাবে লুকিয়ে কখনো যেতে চাওনি তো?

—সত্যি গো, প্রথমে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি শুনলে না। তারপর তুমি যখন যেতে চাইলে আমি যে তখন এক প্রলোভনে সেই পথে গেলাম না।

—কিসের প্রলোভন কৃষ্ণা?

—সে তুমি বুঝবে না। লজ্জার কথা তোমাকে বলতে পারব না। না, কিছুতেই পারব না। কৃষ্ণাকুমারী ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

—শুনতে চাই না। তবে এখন গিয়ে আমাকে কি দেবে? তোমার তো সঞ্চয়ের থলি শূণ্য হয়ে গেছে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণাকুমারী আক্রমণটার অর্থ ধরতে না পেরে বলে উঠল—সত্যি আমায় সব ফুরিয়ে গেছে। স-ব।

—তাই নাকি? ইন্দ্রজিতের চোখে এক হিংস্রতার হাসি উছলে উঠল। বলল—বাইরে যাব বলে, হলদপুরমল্লা ছেড়ে নয়। সেই ছোট্ট নৌকায় লছমিখাল ধরে কিছুদূর বেড়িয়ে আসব। এই সুন্দর জোছনায় মন্দ লাগবে না, কী বল?

কৃষ্ণাকুমারী ইন্দ্রজিতের দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীনভাবে তাকিয়ে থাকে। চোখে ফুটে উঠল হতাশার দৃষ্টি। ঠোঁট কামড়ে ধরে ব্যর্থ দুর্ভাগ্যের যাতনায়।

—ভয় পেলে কৃষ্ণা?

—ভয়! কিসের ভয় গো? তোমার সংগে যাব এতে আবার ভয়ের কি থাকতে পারে।

এক ক্রূর হাসি ইন্দ্রজিতের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। চাপা হাসির সংগে গলা থেকে বেরিয়ে এল ভাঙ্গা কথা—যাও, নতুন সাজে সেজে নাও। আমি রঘুসিংকে ডাকি।

কৃষ্ণাকুমারী ক্লান্ত শরীরটা কোন মতে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আজ সে সত্যই শ্রান্ত। ইন্দ্রজিৎ বুঝতে চাইলো না। কেউ তার দুঃখ বুঝল না।

নতুন সাজে সাজল। দেহে জড়াল শুভ্র বেনারসী। মুক্ত কেশরাশি মসলিন ফিতায় ধরা পড়ল। স্বপ্নমাখা চোখে টেনে দিল সুর্মা। মুখে ঢেকে দিল রংদার মসলিনের ওড়না আর পায়ে পরল সোনালি জরির চটি। হাতে নিল বীণা। ইন্দ্রজিৎ বীণা শুনতে ভালবাসে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল কৃষ্ণাকুমারী। মন্থর পদে এগিয়ে গেল। আড়াল থেকে বিন্দা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বুক থেকে এক বিরাট ভার নেমে যায়। চোখবুজে শিবকে ডাকল। বলে—ঠাকুর, এবার আমাকে উদ্ধার কর। তবে এখান থেকে এখন সে নড়বে না। যতক্ষণ না ওরা ফিরে আসছে। ইন্দ্রজিতের চলন তার কেন যেন ভাল লাগছে না।

অন্দরমহলের গোপন পথ দিয়ে পুত্তিকা ঘাটের সিঁড়িতে দু'জনে এসে দাঁড়াল। ঘাটে বাঁধা রয়েছে রূপানৌকা। আকারে ছিপের মত।

এই ঘাট একমাত্র অন্দরমহলের লোকেরা ব্যবহার করে। তবে বেশীরভাগ লোকেরই পদক্ষেপ ঘটে না। তাই মাঝে মাঝে উই ঢিপির আস্তানা দেখা যায়। ঘাট থেকে উঠে আরও এক গোপন পথ দিয়ে চলে যাওয়া যায় মন্দির, কাছারিবাড়ী পর্যন্ত। বড় নির্জন। প্রহরী নেই এখানে।

চাঁদের শুভ্র আলো কৃষ্ণাকুমারীর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। লছমিখালের ছোট ছোট ঢেউগুলি নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ে, কলকলিয়ে হাসছে। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু জল আর জল।

নৌকায় উঠতে গিয়ে কৃষ্ণাকুমারী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দূর থেকে ভেসে এল মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। যেন ব্রহ্মচারীর কণ্ঠস্বর। সে বলছে—"যে আশ্রয়স্থলের আশায় তুমি যেতে চাইছো, সেই আশ্রয়স্থলই হবে তোমার মৃত্যুর কারণ।"

—কী হলো কৃষ্ণা ?

চমকে উঠলো কৃষ্ণাকুমারী। এক ম্লান হাসি হেসে রূপানৌকায় গিয়ে উঠে বসল। সেই সুযোগে তার অলক্ষ্যে ইন্দ্রজিৎ হাতের আঙ্গুলে পরে নিল বাঘনখ। যেন বাজপাখীর তীক্ষ্ণ চঞ্চু। একবারও হাত কাঁপল না ইন্দ্রজিতের। আজ এই বিচারে মায়া দয়া বলে কিছু নেই।

জলে ভাসল নৌকা। দাঁড় ধরে বসে ইন্দ্রজিৎ। জল কেটে রূপা চলে। কৃষ্ণাকুমারীর বীণা ঝংকৃত হয়ে উঠল। তার মধুর ঝংকার বাতাসে হারিয়ে

যায় জলতরঙ্গের মত। শূন্যে জোছনা-ভরা আকাশে অগণিত তারকাও যেন সাদা ওড়নায় মুখ ঢেকেছে। টুকরো টুকরো সাদা মেঘের সারি অজানা টানে ভেসে চলেছে। নীচে ঘোলাটে জলের আস্ফালন। দু'পাশে তীরে বড় বড় গাছের শত শাখা বাতাসে আন্দোলিত হয়ে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ক্রমে কৃষ্ণাকুমারীর ক্লান্ত দেহ এক আবেশে ইন্দ্রজিতের বুকে এলিয়ে পড়ল। বীণার ঝংকারও স্তব্ধ হয়ে আসে। চোখ বুজল। কিন্তু মনের কোণে সেই ঝড় এখনো যেন ডানা গুটোয়নি। ভুলতে পারছে না ব্রহ্মচারীকে। তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই সম্মোহনী আকর্ষণকে এখনো খণ্ডন করতে পারছে না। ঝিম ঝিম করতে থাকে শরীর। স্নায়ুগুলো এখনো শিথিল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েনি।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ইন্দ্রজিৎ। প্রশ্ন করল—আচ্ছা কৃষ্ণা, আমি তোমাকে হারালাম কেন?

অদ্ভুত প্রশ্ন! অদ্ভুত শোনাল কৃষ্ণাকুমারীর কানে। জলের ছলছল শব্দে কথা যেন হারিয়ে যায়। কৃষ্ণাকুমারী অলস কণ্ঠে উত্তর দিল—আমি তোমাকে খুব ভালবাসি বলে।

ইন্দ্রজিৎ হাসল। ব্যঙ্গের হাসি। বলল—তোমার ভালবাসা মরুভূমির মরীচিকার মত।

—তা বলো না গো। বল মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া এক ফোঁটা জলকণার মত বহুমূল্য।

—আমি যদি বলি এ তোমার মিথ্যা কথা? তোমার কাছে ভালবাসা বহুমূল্য নয়, মানুষের রূপই তোমার কাম্য।

কৃষ্ণাকুমারী আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল—ঐ চাঁদের রূপকে কে না ভালবাসে? আমিও বাসি।

ইন্দ্রজিৎ এবার সোজা হয়ে বসল। কৃষ্ণাকুমারীর দেহের স্পর্শ সে যেন সহ্য করতে পারছিল না। কণ্ঠে ভেসে উঠে শ্লেষ।—চাঁদের কলঙ্ক দেখেছ কৃষ্ণা?

—যারা চুল চেরা বিশ্লেষণ করে তারাই এর সন্ধান রাখে। তোমার আমার তাতে কি দরকার?

—না, দরকার আমার আছে। আমি বিশ্লেষণ করতে চাই।

কৃষ্ণাকুমারীর সুখতন্দ্রা টুটে যায়। বিস্ময়ে বলে—কেন?

—নন্দীমহলের কৃষ্ণাকুমারী শুধু বউরাণী নয়, ইদানীং ব্রহ্মচারীর একান্ত অনুগামিনী হয়েছে। তাই একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। যদি করি, তবে কি একটুও কলঙ্ক পাব না?

বাতাসের ঘুম ভাঙে। কৃষ্ণাকুমারী উঠে বসে। মুখের ওড়না খুলে পড়ল। বীণা খসে পড়ে হাত থেকে। তবে কি ইন্দ্রজিৎ সব দেখেছে! আর এই মিথ্যা দেখাই কি ওকে পাগল করেছে!

কৃষ্ণাকুমারী সোজা হয়ে বসে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে কম্পিত কণ্ঠে বলল—কি বিশ্লেষণ করতে চাও, কীই বা আমার কলঙ্ক?

—বললে সইতে পারবে?

—সেটা ভেবে আমাকে ও-কথা বলনি। কলঙ্ক, বিশ্লেষণ অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর! তুমিও আমাকে শেষে ভুল বুঝলে?

ইন্দ্রজিৎ কেন যেন একবার চমকে উঠল। তবে ক্ষণিকের জন্য। কৃষ্ণাকুমারীর চোখে চোখ রাখল। দৃষ্টি সইতে পারে না। জলের তরঙ্গে চাঁদের আলো লক্ষ টুকরোয় যেমন ভেঙ্গে পড়েছে তেমনি ইন্দ্রজিতের চোখে শয়তানির হাসি উথলে উঠেছে। ইন্দ্রজিৎ বলল—সবই আমি অবিশ্বাস করি কৃষ্ণা। ঐ আকাশ, চাঁদ, এই জল, তুমি, আমি কিন্তু আমার চোখ যা দেখেছে তাও কি তুমি অবিশ্বাস করতে বলো?

—কৃষ্ণাকুমারী এবার ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল—হঁ্যা, আমি ব্রহ্মচারীর অনুগামিনী হয়েছিলাম। সে কার জন্য? থাক সে কথা, শুনে তোমার লাভ নেই। আমার দুর্বলতার সুযোগে সে আমাকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। হঁ্যা, সে একজন তান্ত্রিক। কিন্তু ওগো, তার কামনা এখনো সফল হয়নি।

ইন্দ্রজিৎ চীৎকার করে উঠল—এ মিথ্যা কথা।

—না-না, এ মিথ্যে কথা নয়। আমি তোমার স্ত্রী। কতদিন—কত-দিন ধরে এই দুর্বিষহ জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলেছি। তার কি কোনদিন খোঁজ নিয়েছ? আজ কিছু না জেনেই আমার বিচার করতে বসলে?

--সেই শক্তির প্রভাবে তোমার অজ্ঞাতে তোমারি দেহে যে কলঙ্ক নেমে আসেনি, একথা কি তুমি জোর করে বলতে পার কৃষ্ণা?

—কি. বললে? কলঙ্ক? আমার কলঙ্ক! ছিঃ ছিঃ! আমার দিকে তাকাও দিকিনি—দেখ তো কোন কলঙ্ক পাও কি না?

—সব স্বীকার করি, তবু আমি এ বিশ্বাস করি না। কলঙ্ককে চাপা দিতে যেও না।

কৃষ্ণাকুমারী এক আতংকে বিস্ফারিত দৃষ্টি তুলে ধরে। এতক্ষণে যেন সব

পরিষ্কার হয়ে যায়। মরিয়া হয়ে বলল—তুমি উন্মাদ হয়েছো। নির্জনে মানুষ তার নিজের ছায়া দেখেও চমকে ওঠে। শোন, এই সুন্দর পৃথিবী থেকে ভুল করে অন্ধকার পৃথিবীতে তোমাকে যেতে দেবো না। ঐ পৃথিবীতে শুধু সন্দেহ, ভুল আর মিথ্যা, শুধু কালো। আমাকে বাঁচতে দাও।

ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে এক গোপন স্বর আত্মপ্রকাশ করল, যেন ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ঘড ঘড আওয়াজ। বলল—তাই তো তুমি যাবে সেখানে। আমি এখানে থাকব প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য। বাঁচবে বৈকি। তুমি বেঁচে থাকবে, কিন্তু—।

দাঁড় টানা বন্ধ হয়ে যায়। নৌকার গতি ক্ষীণ হয়ে আসে। এক উত্তেজনায় ইন্দ্রজিৎ আর নিজেকে সামলাতে পারে না। কৃষ্ণাকুমারীর একখানা হাত জোরে চেপে ধরে বলে উঠল—কিন্তু এই পৃথিবীকে দু'চোখ ভরে দেখতে পাবে না। পারবে না তোমার রূপে ব্রহ্মচারীকে ভোলাতে। যাবে না কৃষ্ণা সেই পৃথিবীতে? ভয় কি? তোমার ব্রহ্মচারী তোমার হাত ধরে অন্ধকার থেকে পূণ্যালোকে নিয়ে যাবে। তার কলঙ্ক ক্লেদে তোমার যৌবনের ফুল ফুটবে একে একে। চমৎকার হবে। তাই না?

ইন্দ্রজিতের মোটা ভুরু ঘন ঘন কাঁপতে থাকে। উঠে দাঁড়ায় ইন্দ্রজিৎ। হাত শূন্যে তুলে হেসে ওঠে। প্রচণ্ড হাসিতে বাতাসের তরঙ্গ ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

কৃষ্ণাকুমারী চীৎকার করে উঠল—ওগো, আমি ভ্রষ্টা নই, পথভ্রষ্টাও নই। আমি ভাগ্যহন্তার ক্রীড়নক মাত্র। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

—সত্যি আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

ইন্দ্রজিতের পদভারে রূপানৌকা টলতে থাকে। তার পরই বসে পড়ে দু'হাত দিয়ে কৃষ্ণাকুমারীর মুখখানি চেপে ধরল। বলে চলে—তাই আজ তোমাকে সেই পথে নিয়ে যাব। যে-পথ ধরে যাবে সেই ঘনান্ধকার রাজ্যে। অদ্ভুত জায়গা—শুধু কালো আর কালো। সবই অনুভব করবে, কিন্তু তোমার ব্রহ্মচারীর সুন্দর মুখ দেখতে পাবে না। আবার হেসে উঠল হো হো করে।

প্রচণ্ড হাসিতে লছমিখাল চমকে উঠে। রূপানৌকা কাৎ হয়ে পড়ে। হাসির প্রতিধ্বনিতে দূর থেকে কে যেন চীৎকার করে উঠল—না-না-না। কৃষ্ণাকুমারী ডুকরে কেঁদে উঠল—ওগো আমি বাঁচব, আমাকে বাঁচতে দাও।

প্রতিহিংসায় ইন্দ্রজিৎ তখন উন্মাদ। তার তীক্ষ্ণ ফলকওয়ালা আঙুলগুলি নিজেদের মধ্যে প্যাঁচ খেলে যায়, এক ঝাঁকুনিতে থেমে গেল। তারপর বিদ্যুৎ-গতিতে বাঘনখ নেমে আসে কৃষ্ণাকুমারীর বিস্ময়াভিভূত সুন্দর চোখের উপর।

কৃষ্ণাকুমারীর আর্তনাদ খালের জলে আছাড় খেয়ে পড়ল। শুষ্ক বসনে ঝরে পড়ল তাজারক্ত। এক অসহ্য যন্ত্রণায় শূন্যে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইলো একটি অবলম্বন। দু'হাত দিয়ে রক্তাক্ত চোখ চেপে ধরে চীৎকার করে উঠল—ওগো, আমি যে তোমার জন্য গিয়েছিলাম।—এ তুমি কী করলে!

—জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোতে কৃষ্ণাকুমারীর দু'হাতে ফুটে উঠল রক্তজবা তারপর তার জ্ঞানশূন্য দেহ লুটিয়ে পড়ল এক পাশে। রক্তাক্ত হাত জলে পড়ে মুহূর্তের জন্য একরাশ জল রাঙ্গিয়ে দিল। বীণার উপর গড়িয়ে পড়ল রক্ত।

স্তব্ধ হলো চারিদিক। জলের কলকল ধ্বনি যায় থেমে। ইন্দ্রজিৎ হাতদু'টি শূন্যে তুলে আর্তনাদ করে উঠল। হাতে লেগে রক্ত—থলো থলো রক্ত।

নৌকার মুখ ঘুরে যায়। ইন্দ্রজিৎ চমকে বিস্ময়ে দেখল—দূরে ঐ সেই ঢিপি। মহলের ছাদ হতে প্রতি রাত্রে ওখান থেকে পেয়েছে অশরীরী নারীর রহস্যভরা ইঙ্গিত। ইন্দ্রজিৎ অনিমেষ নেত্রে ঢিপির দিকে তাকিয়ে থাকে। এক ভয়ে কেন যেন হিংস্র মন কেঁপে ওঠে। হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছে। ঐ তো, ঐযে ঢিপির পাশে দাঁড়িয়ে এক নারীমূর্তি। অস্পষ্ট! যেন ইসারা দিয়ে ডাকছে। বাতাসে ভেসে আসে ক্ষীণ নারী-কণ্ঠস্বর। মনে হলো এক হিস্‌হিস্‌ শব্দ। তবে কি তাকে ডাকছে? মূর্তি ক্রমশ বৃহৎ আকার ধারণ করছে। পিণ্ডলাকৃতি ধোঁয়া এগিয়ে আসছে, ধীরে অতি ধীরে। চীৎকার করে উঠল ইন্দ্রজিৎ। দাঁড় ধরে প্রাণপণে টেনে চলে।

মাঝরাতে পুত্তিকা ঘাটে এসে থামল রূপানৌকা। ভেসে এল মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ। ইন্দ্রজিৎ হাসল। বেচারা ব্রহ্মচারী আকুল হয়ে ডাকছে তার প্রিয়তমাকে। দৃঢ় হস্তে কৃষ্ণাকুমারীর জ্ঞানশূন্য দেহটা তুলে নিয়ে ঘাটে নেমে এল। সারা আকাশ জুড়ে জোছনার ঢেউ বয়ে চলেছে। বাইজীমহল থেকে কোন ঘুঙুরের আওয়াজ ভেসে এল না। শোনা গেল না বৌরাণীদের কলকণ্ঠ। কেবল সানাইয়ের বেহাগরাগিণীর সুর হাল্কা হয়ে দেয়ালে ঘা খাচ্ছে। দু'পাশে অবহেলার মসিলিপ্ত সুউচ্চ প্রাচীর। দু'চারটে আগাছা নিষ্ঠুরের মত শেকড় গেড়েছে সেখানে।

ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে চলে। সেদিন নন্দীমহলের কারোর চোখে পড়ল না এমন ভয়ংকর দৃশ্য। জানতেও পারল না কেউ এক মানুষের অভিনব বিকৃত রুচির পরিচয়।

পথ পেরিয়ে মন্দিরে এসে দাঁড়াল। চাতাল শূন্য। দূরে নাটমন্দিরে বিক্ষিপ্ত চাঁদের আলো ফ্যাকাসে—বিবর্ণ। মন্দিরের চত্বরে কৃষ্ণাকুমারীর অচেতন

দেহটাকে শুইয়ে মন্দিরের ঘণ্টার শিকল ধরে টান দিল। মধুর ধ্বনিতে না বেজে ঘণ্টাগুলি স্বধ্বনিতে চমকে উঠল। ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাকুমারীর দিকে একবার তাকিয়ে নীচে নেমে আসে। অদূরে গাছের পাতায় পাতায় শুধু এক শিহরণ। ধীরে ধীরে ইন্দ্রজিৎ ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে চলল মহলের দিকে। কৃষ্ণা-কুমারীর হাজারো স্মৃতি ছড়ানো মহলে ঢুকতে গিয়ে পিছন টানে একবার থেমে যায়। দুর্বল মনের আনাচে কানাচে উঁকি দিল কত হাসি কত অশ্রু-স্রোতে লিপ্ত মান-অভিমান। আবার এগিয়ে চলল। না-না, সে আজ বিচার করছে। ইন্দ্রজিৎ মনটাকে শক্ত করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মচারী বসেছিল। সেই আরতির পর থেকে মন্দির ছেড়ে যায়নি। সম্মুখে শিবলিঙ্গ। সন্ধ্যা থেকে শুধু ঠাকুরকে ডেকেছে। কোন উত্তর পায়নি। পিতার কথা, নটবর ঠাকুরের কথা বার বার মনে পড়ছে। যতবার ঠাকুরকে ডেকেছে ততবার নটবরঠাকুরের কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছে—"মহাকাল মহাদেব। ভক্তির অর্ঘ্যে সন্তুষ্ট। ব্যাভিচারে মৃত্যু—কালসর্পে মৃত্যু।" বুকে কি এক অসহ্য যন্ত্রণা। বেলপাতা নিয়ে বুকে বার বার ঘসেছে কিন্তু ব্যথা কমল না। উঠে দাঁড়িয়ে এক উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি করতে থাকে। বার বার ক্ষমা চায়। কেঁদেছেও কতবার। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

ওকি! বিস্ময়ে দেখে দেয়ালের নৃত্যরত এক নারীমূর্তি প্রাণ পেয়ে নেমে এসেছে। ভালভাবে দেখে। হাসছে সে। ব্রহ্মচারী চীৎকার করে উঠল—চারু!

চারু ব্রহ্মচারিণী যেন বলছে—"তার চেয়ে দেহটাকে ছেড়ে এই মনটাকে নাও না, যেভাবে ইচ্ছে।"

আমাকে ক্ষমা কর চারু,—আমাকে ক্ষমা কর—বলে দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কৈ কেউ তো নেই! দেয়ালের নৃত্যরত মূর্তি ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে লীলায়িত ভঙ্গিমায়।

হঠাৎ বাইরে ঘণ্টাগুলো মধুর ধ্বনিতে বেজে উঠল। ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে পড়ে। হাঁপাতে থাকে। দেয়াল ধরে ফেলে আস্তে বলল—কে এল এই মাঝ রাতে!

অতিকষ্টে মন্দিরের দরজা খুলে ফেলল।

কে ওখানে শুয়ে! চাঁদের আলো সেখানে অস্পষ্ট। কালো পাথরে আলো ধরা পড়ছে না। ঘিয়ের প্রদীপ নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে দেহের উপর। হাতের প্রদীপ চমক নিঃশ্বাসে নিভে গেল।

ব্রহ্মচারীর বিকট চীৎকারে মন্দিরের পাথরও চোখ মেলে তাকালো। নাটমন্দিরের পায়রাগুলি ভয় পেয়ে খোপের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। কৃষ্ণাকুমারীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে ব্রহ্মচারী। সারামুখ রক্তে প্রলিপ্ত। কী ভয়ংকর—কী নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা! ভুলে গেল নিজের অন্যায়। দূরে নন্দী প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় অভিসম্পাত দিল—এখনো ঐ পাপের দেয়াল দাঁড়িয়ে! তারপরই ব্রহ্মচারী আর্তনাদ করে উঠল—না-না, এ আমি চাইনি।

সরে এল দরজার পাশে। মন্দিরের ভিতরে তাকাল। অন্ধকার। তাকাতে পারে না সেদিকে। আর নয়। তার শরীর সত্যি সত্যি কত হাল্কা হয়ে গেছে যেন। সবকিছু অনুভব করতে চেষ্টা করে, কিন্তু এক অদৃশ্য পাপের হস্ত তার স্মৃতিকে বার বার লেপে মুছে দেয়। মন্দির ছেড়ে নীচে নেমে এল। থাক সব পড়ে। কোথায় যাবে? রংবালি মন্দিরে! সেই ভাল। ঠাকুরকে আর ডাকবে না, কিছু চাইবে না। মুখ বুজে পড়ে থাকবে। এর পরও অসহ্য হয়ে উঠলে ঠাকুর্দার মত সেও ঝিলে আত্মবিসর্জন করবে। পরজন্মে তার যাই হোক তা সে মাথা পেতে নেবে কিন্তু এই জন্মের চাওয়া তার শেষ হয়েছে। আজ তার কোন অভিযোগ নেই। চলার পথে অদৃষ্ট যদি আবার খামখেয়ালী হয়ে ওঠে তা সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে। তবে এই দেহটাকে শাস্তি দেবে—পচিয়ে গলিয়ে নষ্ট করে ফেলবে। সেই পূর্ণিমারাতে চন্দনব্রহ্মচারী হলুদপুরমল্লা ছেড়ে চলে গেল।

কৃষ্ণাকুমারীর জ্ঞান ফিরে এল। এক অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। সে কি মরে গেছে! কানে এল পায়রার ঝট্‌পট্‌ ডানার আওয়াজ। কোথায় শুয়ে! হাতড়ে পাথর স্পর্শ করে। উঠে বসল। সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একে একে সব মনে পড়ে—নৌবিহার থেকে শুরু করে চোখ অন্ধ করা পর্যন্ত। ইন্দ্রজিৎ এতবড় নিষ্ঠুর হতে পারল! ভুলতে পারে না তার ভয়ংকর মূর্তি। তবু হাত তুলে বলল—ওগো, আমাকে একটু ধরো না, আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কোন উত্তর এল না। কেউ এসে ধরল না। চীৎকার করে উঠল—আমি কোথায়? উত্তরে পাথরে ঘা খেয়ে কথা ফিরে এল। কৃষ্ণাকুমারী এবার এক অসহ্য যন্ত্রণায় উঠে দাঁড়াল। চলতে গিয়ে মন্দিরের থামে ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়াল। হাতড়াতে হাতড়াতে ঘণ্টার শিকল ধরে ফেলে। বেজে উঠল ঘণ্টা। সে তাহলে মন্দিরে।

দরজায় এসে দাঁড়াল। জোরে বলে উঠল—ঠাকুর আর কী চাও? কী দোষ করেছি যার জন্য এতবড় শাস্তি দিলে আমাকে। ফিরে এল। পায়ে পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলে। শূন্যে হাত তুলে ধরল—কে আছ, আমাকে মহলে নিয়ে চল গো! ওগো আমাকে নিয়ে যাও না—

দূর থেকে সানাইএর সুর ভেসে এল। রাত শেষ হতে তাহলে অনেক বাকী। অভিমানের সুরে বলল—চাই না, আমি যাব না, কিছুতেই মহলে ফিরে যাব না। দু'হাত তুলে হাতড়ে হাতড়ে কৃষ্ণাকুমারী এগিয়ে চলে। কতবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আবার ডুকরে কেঁদে উঠল—আমাকে কেউ একটু ধরনা গো। এই হাতটা ধরে খালে পৌঁছে দাও। আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

বাতাসের ঘুম ভাঙে। লছমিখালের জলের হাসির শব্দ ভেসে এল। যেন তাকে ডাকছে। কৃষ্ণাকুমারী চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এ সে কী বলছে!...মহলে ফিরে যাবে? কেন? কারজন্য সে যাবে? আবার করুণ ভাবে ডাকল—ওগো কে আছো, আমার হাতটা ধর না—একটু ধর!

কৃষ্ণাকুমারীর কানে ভেসে এল হারিয়ে-যাওয়া কথার মত একটুখানি সাড়া —"এই যে! আমার হাত ধর।"

—কে তুমি?

উত্তর এল না। কৃষ্ণাকুমারী অনুভব করে, কে যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। শুনতে পাচ্ছে জলের উচ্ছল শব্দ। হ্যাঁ, সে মরবে। উঃ! ইন্দ্রজিৎ এত নিষ্ঠুর! তার জন্যই সব বদনাম মাথা পেতে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছিল। এক চাপা ক্রন্দন গলায় আটকে যায়। জানলে না—বুঝলে না। মাথা নেড়ে বলে উঠল—না—না, আমি যাব না, আমি মরব—আমি মরব। আমি তোমার কেউ নই।

দাঁড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণাকুমারী। চমকে উঠল জলের ছলছল শব্দে। ঠাণ্ডাজলের স্পর্শ লাগে পায়ে।

কে যেন কৃষ্ণাকুমারীকে প্রাকারের এক পড়ো ঘাটে পৌঁছে দেয়।

বড় নির্জন ঘাট। কারোর পদক্ষেপ ঘটে না। পাশেই উঁচু পাথরের প্রাচীর ভেদ করে একটি অশ্বত্থ গাছ বেরিয়ে ঘাটটিকে ছেয়ে রেখেছে। লোকে বলে এই ঘাট দিয়ে লছমিবাই আর করণকুমার পালিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ ভগ্ন সোপানশ্রেণী ধাপে ধাপে জলে গিয়ে মিশেছে। ঘাটের কিছুদূরেই লছমিমহল।

সিঁড়ি দিয়ে জলে নামে। লছমিখালের ঢেউ আনন্দে কৃষ্ণাকুমারীর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে। কৃষ্ণাকুমারী এবার বলল—তুমি কে? আমাকে এখানে নিয়ে এলে?

কোন উত্তর এল না। কে যেন নিঃশব্দে হেঁটে চলে যায়। তার পায়ের নূপুর নিক্কণ ঝংকৃত হয়ে উঠল। প্রাকারে ঘা খাওয়া প্রতিধ্বনির সঙ্গে একটা হাসি ভেসে এল। হাসি দূরে ক্রমে আরও দূরে মিলিয়ে গেল।

মহলের সিংহদ্বারে এসে ইন্দ্রজিৎ দাঁড়াল। সুউচ্চ দরজা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে। দরজার নীচের দিকে একটি পাশে "কাটা দরজা" খোলা। প্রহরীরা ঘুমে অচৈতন্য। আজ পূর্ণিমা উৎসব। কর্তারা সব বাইজীমহলে। কত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে এরা।

ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে অন্দরমহলে গিয়ে উপস্থিত হলো। আবছা অন্ধকারে ঢাকা অন্দরমহলের প্রতিটি পথ। বউরাণীদের মহলে এক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। সকলে আজ উদ্যানে। ইন্দ্রজিতের চোখ বুজে আসে, আজ সে নিঃসঙ্গ। অনুভব করে তার দেহের সমস্ত রক্ত রাত্রির দানব শুষে নিয়েছে। স্খলিত পদে কৃষ্ণাকুমারীর তনুমহলের দিকে চলে।

দীর্ঘ বারান্দা। শূন্যে ঝুলছে সারিবদ্ধ সুদৃশ্য ঝালরের বাতি। লম্বা মোমগুলি ক্ষয়ে ক্ষয়ে ম্লান হয়ে এসেছে। কালো মেঝেতে কম্পিত আলো খেলছিল লুকোচুরি।

অবশেষে কৃষ্ণাকুমারীর ঘরে এসে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেন যেন এক উত্তাল কান্না তার বুকে আটকে দম বন্ধ করে দিতে চায়। ঘর থেকে কৃষ্ণাকুমারী যেন ডাকল—অমন করে লুকিয়ে এলে কেন? ইন্দ্রজিৎ দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরে। চীৎকার করতে গিয়ে গলা থেকে কোন স্বর বেরুল না। ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায়। শূন্য ঘর, অদূরে শয্যা তেমনি খালি। ঘরের প্রদীপ জ্বলছে স্তিমিত ভাবে। কে যেন জ্বালিয়ে রেখে গেছে। ইন্দ্রজিৎ পালঙ্কের কাছে এসে দাঁড়াল। ফিস্ ফিসিয়ে নিশ্চল দেয়াল কি যেন বলে উঠল। ছুটে গেল জানালার ধারে। নাঃ, ও কিছু নয়, দূরে ঝাউগাছের মাঝে বাতাস গোঙাচ্ছে। হঠাৎ ভেসে এল সুমিষ্ট সংগীত। উদ্যান থেকে ভেসে আসছে, হয়তো কোন বউরাণী পূর্ণিমার উৎসবকে মাতিয়ে তুলেছে তার সুকণ্ঠে। কিন্তু থেমে যায় এক ঝলক হাসির শব্দে।

চমকে উঠল ইন্দ্রজিৎ। দোরে পদধ্বনির শব্দ। ঘুরে দাঁড়ায় সে। চকিতে সরে গেল এক ছায়া। ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে জেগে উঠল এক ভয়াল আর্তনাদ। ছুটে গেল বাইরে। ঐ তো এক নারীমূর্তি। দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রজিৎ ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে। বলিষ্ঠ হাতদু'টি সাড়াশীর মত তার কণ্ঠনালী চেপে ধরল। নারীমূর্তির মুখের কাপড় খসে পড়ে। ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠে পিছু হটে আসে, বিস্ময়ে বলে—বিন্দা!

—একি করলে ছোটবাবু?

বিস্ময়ে চোখ তুলে ধরল ইন্দ্রজিৎ। বিন্দা কাঁপছে, তার দু'চোখে জল।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল বিন্দা—যা ভেবেছিলাম তাই তুমি করলে ছোটবাবু। হাতে রক্ত দেখে সন্দেহ হলো। সারা মহল বউরাণীকে খুঁজে বেড়িয়েছি। পাইনি। ছুটে এলাম এখানে কিন্তু সাহস পেলাম না তোমার কাছে আসতে। এত বড় পাপ নিজের হাতে করলে!

ইন্দ্রজিৎ ভয়ার্ত দুই চোখ মেলে বারবার দেখে বিন্দাকে।

বিন্দা কণ্ঠে একটু দৃঢ়তা টেনে এনে বলে চলে—বউরাণী মন্দিরে যেতো—হ্যাঁ—যেতো, সে তো আমি জানি। কেবল তোমাকে পাওয়ার জন্য তার ছিল কৃচ্ছ্রসাধন। আসল যে দোষী তার শাস্তি দিলে না? ঐ তান্ত্রিক বউরাণীকে বশ করতে চেয়েছিল। বউরাণীকে কোথায় রেখে এলে বল—বল, শীগ্‌গির।

ইন্দ্রজিৎ 'তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। বিন্দা আশ্চর্য হয়ে যায়। এত বড মানুষটার এ কী হলো! অসহায়ের মত উদভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে একটুখানি যেন আশ্রয় খুঁজছে।

হঠাৎ ইন্দ্রজিৎ হো হো করে হেসে উঠল। দুইহাতে বুক চেপে হেসে চলে। হাসি যেন থামতে চায় না।

বিন্দা আঁৎকে উঠে দৌড়ে সরে এল। তারপর চীৎকার করে উঠল—তুমি পাগল হয়েছ ছোটবাবু—তুমি পাগল হয়েছ।

বিন্দাও উন্মাদের মত অন্দরমহলে ছুটে গেল।

ইন্দ্রজিতের হাসি থেমে যায়। পরমুহূর্তে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে পড়ে কেঁদে উঠল। নিশ্চয় দেয়ালও সেদিন বিস্ময়ে দেখছিল আত্মগ্লানিতে এক পুরুষসিংহ কেমন ভেঙ্গে পড়েছে।

নিস্তব্ধতা নেমে আসে। উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। তার উগ্র দৃষ্টি শান্ত হয়ে এসেছে। ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে শান্ত স্বরে বলল—আর নয়,

নিজের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করব।…হতভাগিনী কৃষ্ণাকে এই বুকে করে সে চলে যাবে। সারাটা জীবন তার হাত ধরে ক্ষমা চাইবে। কৃষ্ণা যে তার! ক্ষমা সে করবেই। যে হাতে এতবড় অন্যায় কাজ করল তা সে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এই হলুদপুরমল্লায় আর তার কোন আকর্ষণ নেই।

কিন্তু যে তাদের জীবনে এত বড সর্বনাশ টেনে আনল তার বিচার হবে না? মনে জেগে উঠল এক প্রতিহিংসার বাসনা। পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরুতে কৃষ্ণাকুমারীর ক্রন্দনধ্বনি ভেসে এল—"ওগো, এ তুমি কি করলে?"

ইন্দ্রজিৎ পাগলের মত চীৎকার করে উঠল—আমি তোমার কাছে যাব কৃষ্ণা—আমি যাচ্ছি।

দৌড়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। দেয়ালে টাঙানো ছোট্ট হাত কুঠারটা তুলে নিলে হাতে। অস্বচ্ছ আলোয় তা ঝকমক করে উঠল। গর্জে উঠল—এবার তুমি কোথায় যাবে ব্রহ্মচারী?

ইন্দ্রজিৎ দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

মন্দিরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মন্দিরের দরজা খোলা। উঠে পড়ে মন্দিরের বারান্দায়। খালি। কৃষ্ণাকুমারী নাই।

হাত থেকে কুঠার খসে পড়ল। ঝুঁকে পড়ে দেখে একসার রক্তবিন্দু। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ইন্দ্রজিৎ চীৎকার করে উঠল। কৃষ্ণাকুমারীর কোন সাড়া এল না। পাগলের মত রক্তবিন্দু ধরে কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মিলিয়ে গেছে রক্তবিন্দু। হারিয়ে গেছে কৃষ্ণাকুমারী। দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার, জোরে ডেকে উঠল—কৃষ্ণা! আর্তনাদ নিঃস্বতা নিয়ে ফিরে এল। নেই কৃষ্ণা। বাইরে বেরিয়ে ব্রহ্মচারীর আস্তানায় এসে দাঁড়াল। শূন্য। নেই কৃষ্ণা। ফিরে এল। নাটমন্দির, চারিদিকের সম্ভাব্য আনাচে কানাচে তন্ন তন্ন করে খোঁজে, কিন্তু সর্বত্রই সেই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি।

তবু ব্যর্থতা—একটা হতাশা বা সন্দেহ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারল না। ছুটে চলল, কোথায় তা সে জানে না। চীৎকার করে ডেকে চলল—কৃষ্ণা ফিরে এসো—কৃষ্ণা—আ।

তার করুণ একটানা চীৎকার সেদিন কারোর ঘুম ভাঙাতে পারল না। বাইজীদের নৃত্যচপল পদঝংকারও ক্ষণিকের জন্য থামল না। প্রহরীদের নেশার তন্দ্রাও টুটে গেল না।

নেই কৃষ্ণা। কোথাও নেই। এবার এক সন্দেহ বারবার তাকে উত্তেজিত করে তোলে। দৌড়ে চলে। থমকে দাঁড়াল। চমকে উঠল ক্ষণিকের জন্য। একি! লছমিমহলে এসে দাঁড়িয়েছে। কি ভাবে এল! কে নিয়ে এল তাকে এখানে। আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

পুরানো ভগ্ন লছমিমহল যেন নতুন সাজে সেজেছে। জোৎস্নাস্নাত মহলের দেয়ালে রোশনাই জ্বলেছে। চারদিকে ছুটোছুটি করছে দাসীরা। নর্তকীদের ঘুঙুরের আওয়াজ নানা ধ্বনিতে বেজে উঠে হাজার ওড়না উড়িয়েছে। সারেঙ্গী বাজছে। লছমিবাই এখুনি আসবে তসলিম জানাতে। উৎসব ছাপিয়ে হঠাৎ ভেসে এল মধুর সংগীত—বেলাবলী। বহুদিন পরে অতৃপ্ত আত্মা যেন তার প্রিয়তমকে খুঁজে পেয়েছে। ইন্দ্রজিৎ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চিন্তার সূত্রগুলি বেঁধে নিজের সত্বাকে অনুভব করতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজল। সম্বিৎ ফিরে আসে। চোখ মেলে দেখে অপূর্ব রূপসী এক নারী তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ইন্দ্রজিৎ চীৎকার করে উঠল—কৃষ্ণা!

মিলিয়ে গেল ছায়ামূর্তি। পরিবর্তে ভেসে এল এক ব্যঙ্গের হাসি।

আবার ছুটে চলে ইন্দ্রজিৎ। তার আকুল ডাকের বিরাম ঘটে না। নিজের দিগ্‌ভ্রান্তিতে নিজেই আঁৎকে ওঠে আবার—এ কোথায় সে চলে এসেছে!

সামনে ফুকার। এক অশুভ আশংকায় চঞ্চল হয়ে উঠল ইন্দ্রজিৎ। দরজা বন্ধ, বড় তালা ঝুলছে। ইন্দ্রজিতের বিকারগ্রস্ত মনে সব বিস্মৃতি ছাপিয়ে ক্ষণিকের জন্য ভেসে ওঠে তৈলা। তার চঞ্চলতা ও বিস্ময়কে স্তব্ধ করে ফুকারের ভিতর থেকে এক নারীর চীৎকার ভেসে এল। হ্যাঁ, এ-তো তৈলার চীৎকার। বন্ধ ঘরে আকুল ক্রন্দনে সে অভিসম্পাত দিচ্ছে—"বিশ্বনাথ এর বিচার করো।"

ইন্দ্রজিৎ তখন উন্মাদ। কোন বাধাই তাকে বাঁধতে পারল না। লছমিগালের দিকে ছুটে গেল। তার কান্নায় ভরা চীৎকার প্রাকারে আছাড় খেয়ে পড়ল।

কৃষ্ণাকুমারী তার হাল্কা বুক থেকে অতিকষ্টে নিঃশ্বাস টানে। হঠাৎ চমকে উঠল, কে ডাকে! নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাকারের কালো পাথরের দেয়াল চোখ মেলে তাকিয়ে তার দিকে। ঘোলাটে জল উঠছে ফুলে ফুলে। দূর থেকে মাঝিমাল্লার হুঁশিয়ারি চীৎকার ভেসে এল।

কৃষ্ণাকুমারী সিঁড়ির আরও এক ধাপ নীচে নামল। আবার সেই ডাক ভেসে এল। ইন্দ্রজিৎ তাকে ডাকছে।

দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরে কেঁদে উঠল—যতই ডাক, আমি যাব না। কিছুতেই যাব না।

কুন্তী নদীর জোয়ার সহস্র লক্ষ ফণা তুলে দু'কূল ছাপিয়ে লছমিখালে এসে ঢুকল। জলে জাগে প্রাণচঞ্চলতা। তাড়া খেয়ে ছুটে আসছে দুর্বার স্রোত। ছোট ছোট ঢেউএর সে কী উদ্দাম উল্লাস।

কৃষ্ণাকুমারী আরও এক ধাপ নামল। জলে টান ধরেছে। আবার চীৎকার ভেসে এল। ইন্দ্রজিৎ ডাকছে! কৃষ্ণাকুমারী দু'হাত দিয়ে জল স্পর্শ করে। দূর থেকে ভেসে আসছে জলের গম্ভীর আওয়াজ। জোয়ার আসছে।

প্রাকারে আছাড় খেয়ে পড়ছে ইন্দ্রজিতের চীৎকার—কৃষ্ণা ফিরে এসো! কোথায় তুমি—! কৃষ্ণা—।

কৃষ্ণাকুমারী নিশ্চল পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। রক্তে ভেজা পাত্‌লা ঠোঁট বারকয়েক নড়ে উঠল। সত্যি তার ইন্দ্রজিৎকে সে ছাড়া আর কেউ জানে না—চেনে না। সেও যে একজন হতভাগ্য! কে দেখবে ঐ আপনভোলা মানুষটিকে।

ভয়ংকর শব্দ এগিয়ে আসছে। মাঝিমাল্লারা শেষবারের মত চীৎকার করে উঠল—সামাল—সামাল!

হঠাৎ কৃষ্ণাকুমারীর কণ্ঠ থেকে তার অজ্ঞান্তে চীৎকার বেরিয়ে এল—আমি বাঁচব! আমি মহলে যাব।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। তবু উঠে দাঁড়াল, তারপর প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল—ওগো আমি এখানে, আমাকে নিয়ে যাও, আমি যে দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু তার সে ডাক চাপা পড়ে যায় এক উত্তাল ঢেউএর গর্জনে। ঘাটে অছড়ে পড়ে আরও একটি ঢেউ। ঊর্ধ্বমুখী ফেনীল জলরাশি হেসে ওঠে খল খল করে।

ইন্দ্রজিৎ প্রাকার ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোথাও কেউ নেই। ভাঙা-ঘাটের উপরে জল যেন লুকোচুরি খেলছে। আকাশের দিকে তাকাল। চাঁদের উপর সাদা একখণ্ড মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার মুখ থেকে শুধু একটি কথা বেরিয়ে এল—কৃষ্ণা নেই।

ইন্দ্রজিৎ পাগলের মত মাথা নেড়ে বলে চলে—আমার কেউ নেই—আমার কৃষ্ণা নেই।...থেমে গেল। চমকে উঠল। দেখল, দূরের প্রাকার হঠাৎ যেন পাহাড়ের মত মাথা উচু করে তার দিকে এগিয়ে আসছে হাজার দামামা বাজিয়ে। জলের ভয়ংকর আওয়াজের সংগে লক্ষ মানুষ হাত ধরাধরি করে একসংগে চীৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে আসছে। শূন্য থেকে আকাশ ছেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন জোছনাকে ঢেকে বিশ্রী ডানা মেলে তাকে লক্ষ্য করে নেমে আসছে।

ইন্দ্রজিৎ ভয়ে চীৎকার করে উঠল—কৃষ্ণা! পরক্ষণেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

জ্ঞানশূন্য ইন্দ্রজিৎকে মহলে নিয়ে যাওয়া হলো। সেদিন নন্দীপ্রাসাদে নেমে এল এক অমঙ্গলের ছায়া। অন্দরমহলে বউরাণীদের চলায় এল অবসাদ। বিন্দাও কেমন নির্বাক নিশ্চল হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। আর ইন্দ্রজিতের উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি সকলের মনে জাগিয়ে তুলল এক সন্দেহ। কাছারিবাড়ীতে আর গেল না। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, রাত্রিদিন ছাদে ঘুরে বেড়ায়। চরিত মাঝে মাঝে জোর করে ঘরে নিয়ে আসে। বড় বউরাণী এসে শুধু জলভরা চোখে ইন্দ্রজিৎকে দেখে যান।

নন্দীবংশের ছোটকুমার ইন্দ্রজিৎ সত্যি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেল।

দিনের সংগে ঘুরে এল আবার পূর্ণিমা। চিরাচরিত পূর্ণিমা উৎসব মহলে মহলে রঙীন ডানায় ভর করে জেগে উঠল। কেঁকা ও কল্পী জলসাঘরের ঝাড়ের আলো ঝলমলিয়ে উঠল। বাইজীদের নৃত্যচপল পদঝংকারে সুরার পাত্র শূন্য হলো।

পূর্ণিমায় জোছনামাখা আকাশের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ শুধু কাঁদে—আর আকুল হয়ে ডাকে কৃষ্ণাকুমারীকে।

সেদিন। জোয়ার এসেছে সবে। মাঝরাতে ইন্দ্রজিতের বিকট চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যায় মহলের। বাইজীদের নৃত্য যায় থেমে। নন্দীপুরুষরা তাকিয়া পাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সকলে শুনলো ইন্দ্রজিতের উন্মাদ কণ্ঠস্বর। সে চীৎকার করে বলছে—ও লছমিখাল নয়—বউকানা খাল। তারপরই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল নীচে।

কাহিনী এরপর অতি সংক্ষিপ্ত। পুনারাবৃত্তি করিতে হয় প্রারম্ভের শেষটুকু।

এমনি ভাবে নন্দীবংশের ইতিহাস ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল। সেই ইতিহাসে দেখা যায় শুধু তিল তিল করে জমে ওঠা দীর্ঘশ্বাস আর উচ্ছৃংখলতার চরম হুল্লোড়।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে কালের প্রবাহে, কেবল প্রতি পূর্ণিমায় এই ধ্বংসাবশেষ আর ভয়ংকর প্রান্তরের নিঃস্ব রূপ বদলে যায়। শতশত প্রেতাত্মা জেগে ওঠে নতুন উল্লাসে। নিঝুম রাত্রির বুক কাঁপান তীব্র চীৎকারে গ্রাম সচকিত হয়ে ওঠে। লোকে শোনে নারীর ক্রন্দন আর সর্বনেশে নূপুরের ঝংকার। সেই ধ্বনি ধ্বংসাবশেষ, মন্দির ছাড়িয়ে তেপান্তর দিয়ে গিয়ে মিলিয়ে যায় মরাখালের পাড়ে।